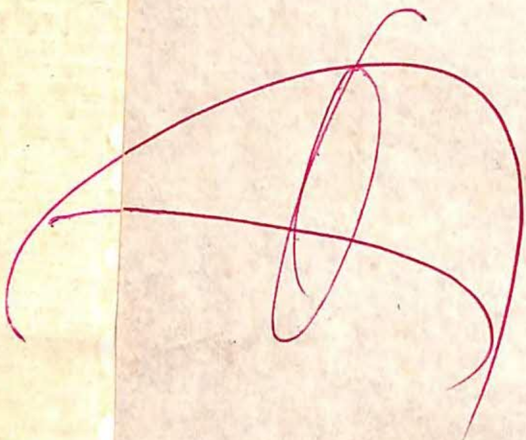
মুঘল মসনদ



সাত্যকি সেন





'It is hardly an exaggeration to say that any one who intends to take up the solution of the problem of religious peace in India, must begin the work where Dara had left it...'

From :
Dara Suko *by* K. R. Qanungo.

পিতৃদেব স্বর্গত প্রফুল্ল কুমার দত্তের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

মুঘল মসনদ

সাত্যকি সেন

নতুন প্রকাশক

১৩/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৭৭ সাল

প্রকাশিকা
এ. দত্ত
২৪সি, রাম কমল সেন লেন
কলকাতা-৭

মুদ্রক
ধনঞ্জয় রায়
কমলা প্রিন্টিং
১৯।১ এইচ, গোয়াবাগান লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
প্রণব শূর

বারো টাকা

শাজাহান এবং মমতাজের পুত্র-কন্যারা :

1. হুরউন্নিসা :

৮ সফর, ১০২২ হিজরত। শনিবার ২০শে মার্চ, ১৬১৩ খৃঃ আগ্রায় জন্ম। মৃত্যু হয় আজমীরে, ২৪ রবি-উস-সানি ১০২৫ হিজরত, বুধবার ১লা মে ১৬১৬ খৃঃ। মৃত্যুকালে মাত্র তিন বছর এক মাস তার বয়স হয়েছিল।

2. জাহানারা বেগম :

২১ সফর, ১০২৩ হিজরত। বুধবার ২৩শে মার্চ, ১৬১৪ খৃঃ জন্ম।

3. দারাশিকো :

২৯ সফর, ১০২৪ হিজরত। সোমবার ২০শে মার্চ, ১৬১৫ খৃঃ আজমীরে জন্ম।

4. শাহ্ সুজা :

১৮ জামাদি-উল-আখির, ১০২৫ হিজরত। রবিবার ২৩শে জুন, ১৬১৬ খৃঃ আজমীরে জন্ম।

5. রোশনরাই বেগম (রোশেনারা) :

২ রমজান, ১০২৬ হিজরত। রবিবার ২৪শে আগষ্ট, ১৬১৭ খৃঃ বুরহানপুরে জন্ম।

6. ঔরঙ্গজেব :

১৫ জিলকাদা, ১০২৭ হিজরত। রবিবার ২৪শে অক্টোবর, ১৬১৮ খৃঃ পাঁচমহল জিলার দোহাডে জন্ম।

7. উমেদ বক্স :

১১ মহরম, ১০২৯ হিজরত। বুধবার ৮ই ডিসেম্বর, ১৬১৯ খৃঃ জন্ম এবং বুরহানপুরে রবি-উস-সানি, ১০৩১ হিজরতে, ফেব্রুয়ারী ১৬২২ খৃঃ মৃত্যু।

২০ রজব, ১০৩০ হিজরত। ৩:শে মে, ১৬২১ খৃঃ জন্ম। মৃত্যু মাত্র সাত বছর বয়সে, ২৩ শাবণ ১০৩৭ হিজরত। ১৮ই এপ্রিল, ১৬২৮ খৃঃ।

8. সুরিয়ায়রান্নু বেগম :

১০৩২ হিজরতে জন্ম হয় এবং নামকরণের আগেই মৃত্যু হয়।

9. একটি পুত্র :

২৫ জিলহিজ্জা, ১০৩৩ হিজরত। ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৬২৪ খৃঃ বিহারের রোটাস দুর্গে জন্ম।

10. মুরাদ বক্স :

১৪ সফর, ১০৩৬ হিজরত। ২৫শে অক্টোবর, ১৬২৬ খৃঃ জন্ম। মৃত্যু ১৯ মাস বাদে ৯ রমজান, ১০৩৭ হিজরত।

11. লুৎফুল্লা :

৪ রমজান, ১০৩৭ হিজরত। ২৮শে এপ্রিল, ১৬২৮ খৃঃ জন্ম। মৃত্যু ২০ রমজান, ১০৩৮ হিজরত। ৩রা মে, ১২৬৯ খৃঃ।

12. দৌলত আফজা :

১০ রমজান, ১০৩৯ হিজরত। ১৩ই এপ্রিল, ১৬৩০ খৃঃ জন্মের পরই মৃত্যু হয়।

13. একটি কন্যা :

১৭ জিলকাদা, ১০৪০ হিজরত। বুধবার ৭ই জুন, ১৬৩১ খৃঃ জন্ম হয় এবং সেই রাত্রেই মমতাজ ইহলোক ত্যাগ করেন।

14. গোহরারা বেগম :

1. একটি কন্যা :

দারা এবং নাদিরার পুত্র-কন্যারা :

2. সুলেমানশিকো :
২৯ রজব, ১০৪৩ হিজরত। ১৯শে জানুয়ারী, ১৬৩৪ খৃঃ আগ্রায় জন্ম। মৃত্যু, ইদ্-উল-ফিতর। ২১শে মার্চ, ১৬৩৪ খৃঃ।

3. মিহিরশিকো :
২৭ রমজান, ১০৪৪ হিজরত। ৬ই মার্চ, ১৬৩৫ খৃঃ দিল্লী থেকে আগ্রায় আসার পথে সুলতানপুর গ্রামে জন্ম।

4. পাক নিহাদবানু বেগম :

২ রবি-উল-আওয়াল, ১০৪৮ হিজরত। ৪ঠা জুলাই, ১৬৩৮ খৃঃ জন্ম।

5. মমতাজশিকো :
২৯ জামাদি-উল-আওয়াল, ১০৫১ হিজরত। ২৬শে আগষ্ট, ১৬৪১ খৃঃ জন্ম।

6. সিপিরশিকো :
শেষ তারিখ জামাদি-উল-আওয়াল, ১০৫৩ হিজরত। ৬ই আগষ্ট, ১৬৪৩ খৃঃ জন্ম এবং খুব সম্ভবতঃ ১০৫৮ হিজরতে জিলকাদা মাসে মৃত্যু হয়।

7. জাহানজেব বেগম :

8. আমলউন্নিসা :
১ শাবণ, ১০৫৪ হিজরত। ৩রা অক্টোবর, ১৬৪৪ খৃঃ জন্ম।

শাজাহান তাঁর প্রত্যেকটি নাতি-নাতনির জন্মের পরই দারার প্রাসাদে গিয়েছিলেন এবং প্রতিবারই তিনি দু'লাখ টাকা এদের জন্মোৎসব পালনের জন্য দিয়েছিলেন।

১৬৪৫ খৃঃ থেকে দারার মৃত্যু পর্যন্ত কোন সন্তানের উল্লেখ শাজাহানের সরকারী ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সময়ে দারার মেয়ে আমলউন্নিসার নাম সরকারীভাবে দু'বার উল্লিখিত হয়েছে। মানুচ্চি সাহেব তাঁর ঐতিহাসিক স্মৃতি কথায় দারার ছোট মেয়ে জানি বেগমের (জাহানজেব বেগম) উল্লেখ করেছেন। জানি বেগম জাহানারা বেগমের স্নেহে লালিত পালিত হয়েছেন। পরে ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ মোয়াজ্জমের সঙ্গে ১৬৬৮ খৃঃ এর শাদি হয়।

ঔরঙ্গজেবের পুত্র-কন্যারা :

॥ ঔরঙ্গজেব ও বেগম দিলরসবানু ॥

1. **জেবউন্নিসা :**

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৮ খৃঃ দৌলতাবাদে জন্ম।

2. **জিন্নৎউন্নিসা (পরে পাদিসা বেগম) :**

৫ই অক্টোবর, ১৬৪৩ খৃঃ সম্ভবতঃ ঔরঙ্গাবাদে জন্ম।

3. **জুব্দৎউন্নিসা :**

২রা সেপ্টেম্বর, ১৬৫১ খৃঃ মুলতানে জন্ম। ৩০শে জানুয়ারী, ১৬৭৩ খৃঃ সিপিরশিকোর সঙ্গে শাদি হয়।

4. **মহম্মদ আজম :**

২৮শে জুন, ১৬৫৩ খৃঃ বুরহানপুরে জন্ম।

5. **মহম্মদ আকবর :**

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৬৫৭ খৃঃ ঔরঙ্গাবাদে জন্ম।

॥ ঔরঙ্গজেব ও বেগম নবাববাঈ ॥

6. **মহম্মদ সুলতান :**

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৬৩৯ খৃঃ মথুরার কাছে জন্ম।

7. **মহম্মদ মোয়াজ্জম বা শাহ্ আলম :**

৪ঠা অক্টোবর, ১৬৪৩ খৃঃ বুরহানপুরে জন্ম। ইনি বাহাদুর শাহ্ আলম (১ম) নামে মসনদে বসেন।

8. **বদরুন্নিসা :**

১৭ই নভেম্বর, ১৬৪৭ খৃঃ জন্ম।

॥ ঔরঙ্গজেব ও বেগম ঔরঙ্গাবাদী মহল ॥

9. **মীরউন্নিসা :**

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৬৬১ খৃঃ জন্ম। মুরাদ বক্সের পুত্র ইজিদ বক্সের সঙ্গে শাদী হয় ২৭শে নভেম্বর, ১৬৭২ খৃঃ।

॥ ঔরঙ্গজেব ও উদিপুরী বেগম ॥

10. **মহম্মদ কামবক্স :**

২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৬৬৭ খৃঃ দিল্লীতে জন্ম।

এক

সেদিন ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৬৫৭ সাল।

খুররম—সুলতান শাহ বেদী মহম্মদ—আবুল মজফ্ফর শিহাব-উদ্দীন মহম্মদ সাহিব-ই-কিরাণ (ছুশ্রা) শাহজাহান বাদশা গাজী দিল্লীতে অসুস্থ হয়ে শয্যা নিলেন। শয্যায় শুয়ে ভাবলেন—ক'দিনের মধ্যেই তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

কিন্তু ক'দিনের মধ্যেও তাঁর শরীর ঠিক ত হ'লই না, বরং আরো খারাপ হ'ল। অসুস্থাবস্থায় শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

১৮ই অক্টোবর শাহজাহানকে আগ্রায় নিয়ে আসা হ'ল, এবং হাকিম বদ্দীর নির্দ্দেশে তাঁকে অন্তঃপুরে অন্তরীণ থাকতে হ'ল বেগম সাহেবা জাহানারা বেগমের পরিচর্য্যায়।

তৃতীয় সন্তান, জেষ্ঠপুত্র দারাশিকো অসুস্থ হিন্দুস্থানের মালিককে দেখাশোনার সঙ্গে শাহী কর্মপরিচালনার ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন এবং তিনিই হ'লেন শাহজাহান এবং বাইরের জগৎ বা দরবারের মাঝে যোগাযোগের একমাত্র সেতু।

শাহজাহানও দারার হাতে রাজ্যের দায়িত্বভার তুলে দিতে কোন দ্বিধাবোধ করলেন না। কারণ তিনি দারাকেই তাঁর ময়ূর সিংহাসনে বসার অধিকার দিতে চেয়েছিলেন প্রথম থেকেই।

দরবারে শাহজাহানের দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতির জন্য জন্ম নিল গুজব—শাহজাহান, হিন্দুস্থানের বাদশা আর জীবিত নেই। শুধু তাই নয়, গুজব তার চিরাচরিত প্যাঁচালো পথে বিস্তৃতি লাভ করল। শোনা গেল, শাহজাহানের মৃত্যু বিষ প্রয়োগে ঘটেছে এবং দারা

শিকো এখন হিন্দুস্থানের তখ্‌তে। গুজবের অর্থটা পরিস্কার, বুঝতে কষ্ট হয় না।

কিছুদিন গত হল। খবর এসে পৌঁছল—শাহজাহানের চতুর্থ সন্তান সুজা, বাঙলা সুবার রাজমহলে, আর দশম সন্তান মুরাদবক্স গুজরাট সুবার আহমেদাবাদে, নিজেদের হিন্দুস্থানের বাদশাহ বলে অভিষিক্ত করেছেন এবং সেটা ঘোষণা করতে তাঁরা একটুও দেরী করলেন না।

কৃষ্ণমেঘ উঁকি দিল হিন্দুস্থানের মসনদের আকাশের কোণে। পূর্বাভাষে মনে হ'ল ঝড় আসতে পারে। 'কি হবে?' এই অনিশ্চয়তা মনের মাঝে উঁকি দিতে শুরু করল সকলের।

আরো কয়েকদিন পর আরেক বার্তা এসে থমথমে করে তুলল রাজধানীর পরিবেশ—গুমোট হয়ে উঠল আবহাওয়া। আগ্রাবাসীরা সন্ত্রস্থ হয়ে উঠল সংবাদটা শুনে।

কি সে সংবাদ? সুজা যুদ্ধযাত্রা করেছেন দারার বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট—মসনদ অধিকার। দিনে দিনে তাঁর সৈন্যদল এবং আগ্রার দূরত্ব কমে আসছে।

আগ্রায় শুরু হয়ে গেল সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, সেনানায়কদের ব্যস্ততা, সৈন্য সংগ্রহ ইত্যাদি। প্রস্তুতিপর্বে বোঝা গেল, এ যুদ্ধ হবে। আর শাহী সমস্ত দপ্তর যেন সেইদিকেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শাসনের শিথিলতার মাঝে আগ্রাবাসীরা বোবাদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। সেই কৃষ্ণমেঘটা ঘন হ'য়ে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে জমাট বাঁধতে লাগল হিন্দুস্থানের মসনদ ঘিরে।

এবার বেশ ভালোভাবেই বোঝা গেল, ঝড় আসছে।

আগ্রাবাসীদের মনে এতদিন ভাসছিল অনিশ্চয়তা। এবার এর সাথী হ'ল শঙ্কা। দু'য়ে মিলে রূপ নিল বিশৃঙ্খলা।

দোকানী দোকান খোলে না। যদিওবা কেউ খোলে, পশ্‌রা

সাজায়—কেনার লোকের অভাবে বিকোয় না কিছু। দাম দিলেও সওদা হয় না। বিশেষ রকম প্রয়োজন না হ'লে কেউ আর রাস্তায় বেরুতে চায় না। কোন কাজকর্ম সুসম্পন্ন হওয়া যেন এক দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠল। বিপন্ন হয়ে উঠল উলুখাগড়া আগ্রাবাসীর ধন মন প্রাণ।

অনিশ্চয়তা অস্থিরতা আর উদ্বেগ মিশে আগ্রাবাসীদের জীবনধারা চলল দোদুল্যমান অবস্থায়। অসুস্থ একটা সময় যেন অশান্তির ঘূর্ণিপাকে তাদের পাক খাওয়াতে লাগল।

দারাশিকোর মনেও বুঝি সেই হাওয়ার আলোড়ন। যমুনার ধারে তাঁর মহলের এক জানলার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। ভাবনার তরঙ্গে ডুবেথাকা দৃষ্টি দূরে আকাশের কোণে অদৃশ্য কোন একবিন্দুকে লক্ষ্য করছিল একভাবে। সেইভাবেই তিনি নিজেকে যেন মৃদুস্বরে বলতে লাগলেন, 'লড়াই আমার ভালো লাগে না—কোনদিনই লাগে নি। ছোটবেলায় তখন কত আর বয়স হবে—মনে পড়ছে চৌদ্দ বছর বয়স হবে—বাদশা, খান লোদীকে দমন করতে বেরিয়েছিলেন, কিন্তু আমি সে অভিযানে কোন অংশই গ্রহণ করি নি। ভালো লাগে নি। আজও লাগে না। তবু—' দারা কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই চুপ করে গেলেন।

ওয়াজের আলি, দারার বহুদিনের সাথী। ওয়াজেরের কাছে দারার মনের কিছু অজানা নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'তা হ'লে কি শাহজাদা এ লড়াই করতে চান না?'

দারা দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে এনে ওয়াজেরের উপর ফেলে বললেন, 'না, এ লড়াই হবে। এ লড়াই মসনদের জন্য শুধু নয়—মর্যাদা রক্ষার জন্যও বটে।'

'তা ঠিক।'

'বিদ্রোহীদের সাজা দিতেই হবে।' দারার গলায় দৃঢ়তার সুর।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওয়াজের বললেন, 'বাদশাহ যদি নিজে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন যে তিনি জীবিত আছেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ একটা মিথ্যা রটনা মাত্র…'

'তা হ'লেও কথা উঠতে পারে, সে চিঠিটা আমিই লিখেছি। কারণ আমার আর বাদশার হাতের লেখায় বেশ মিল আছে। সে যাই হোক, বাদশাহের চিঠিতে কাজ হ'লেও, আমি সেরকম সমাধান চাই না।'

'কিন্তু তাতে যদি লড়াইটা এড়ানো যায়, তাই…'

দারা ওয়াজেরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'না, তা হয় না। আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পার ওয়াজের? কেন আজ এ লড়াই হতে চলেছে?'

মৃদুস্বরে ওয়াজের এক মুহূর্ত বাদে জবাব দিলেন, 'মস নদের জন্য।'

'কিন্তু কেন?' একটু উত্তেজিত স্বরে দারা বললেন, 'বাদশাহের ইচ্ছামতই আমি তাঁর উত্তরাধিকারী। বাদশাহ নিজেও কয়েকজন ওমরাহকে জানিয়েছেন সে কথা। মসনদের উপর অধিকার ত আমারই। তবে—?'

ওয়াজের সে কথা জানতেন। তাই দারার সপ্রশ্ন দৃষ্টির সাথে দৃষ্টিটা একবার মিলিয়ে নিয়ে চুপ করে রইলেন।

দারা আবার বললেন, 'সুতরাং এ লড়াই হবে। বাদশাহ যদি সত্যিই জীবিত না থাকতেন, তা হ'লেও সুজাকে বিদ্রোহী বলে ধরাটা অন্যায় হত না। উপরন্তু ছিনিয়ে নিতে চাওয়া অধিকার— আর বাদশাহের ইচ্ছাপ্রসূত অধিকার, কোন্‌টা ন্যায় বা অন্যায় সেটা নিশ্চয়ই তোমায় বুঝিয়ে দিতে হবে না ওয়াজের। তাই বিদ্রোহীর সাজা সুজাকে পেতেই হবে।'

একথা যে উড়িয়ে দেওয়া যায় না সেটা ওয়াজের বোঝেন। বললেন, 'সে ত সত্যি শাহজাদা। কিন্তু সেটার আগে গুজবটা যে ছড়াল, তাকে খুঁজে বার করতে পারলে কি ভাল হ'ত না? তাতে এই অযাচিত অশান্তিটা এড়ান যেত।'

'জানতে পারলে গুজব ছড়ানটা বন্ধ না করতে পারলেও, সূত্রটা ছিঁড়ে দিতে পারতাম ওয়াজের।' ভারাক্রান্ত গলায় দারা বললেন, 'আচ্ছা, একথা সবাই কি ক'রে বিশ্বাস করে বল ত ওয়াজের, আমি বাদশাহকে বিষ খাইয়ে মারতে পারি?'

'গুজব কেন জানি না বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় অনেকের কাছে।' একটু থেমে ওয়াজের আবার বললেন, 'সে কথা থাক। মিথ্যা যা তা একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বেই। আপনি যে ওরকম কাজ করতে পারেন না এটা ত সত্যি।'

ওয়াজেরের সান্ত্বনায় দারা একটু চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, 'কিন্তু বর্তমানে মিথ্যাটাই যে সবাই সত্যি বলে মনে করছে।'

'দরবারের কেউ হয় ত এ কাজ করেছে।'

'হয় ত তাই। কিন্তু একথা ভাবতেও পারছি না।' একটু যেন অবসন্নতার ছাপ দারার গলার স্বরে ফুটে উঠল।

'আপনার জয় হোক আগামী লড়াইএ। খোদার কাছে এ কামনাটুকুই করি।'

'হ্যাঁ। খোদার সে দোয়া থেকে আমি বঞ্চিত হব না। এও আমি জানি, ওয়াজের।'

কুর্নিশ জানিয়ে দারার দেওয়ান মহম্মদ সালি এসে দাঁড়ালেন দারার সম্মুখে।

দারা প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলেন। দেওয়ান মহম্মদ

সালি সেই দৃষ্টির জবাবে বললেন, 'শাহজাদার আদেশ অনুযায়ী লাল দাস যোগীকে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'বেশ।'

'লালদাস যোগী জানতে চেয়েছেন, আপনি কি আজ তাঁর আশ্রমে যাবেন?'

'না। মনটা বড় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ক'দিন বাদে আমি দেখা করব। একথাটা তুমি জানিয়ে দাও তাঁকে।'

'যো হুকুম। আর কিছু সাহায্যপ্রার্থী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।' মহম্মদ সালি বললেন।

'না, তাদের সঙ্গেও আজ দেখা করব না। তুমিই দেখ, ওরা কি চায়। প্রয়োজন মত সাহায্য দিও।' মুক্তোর মালাটা হাতে নিয়ে নাড়তে নাড়তে সেইদিকে দৃষ্টি রেখে বললেন দারা।

'যো হুকুম।' মহম্মদ সালি সেলাম জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

'লালদাস যোগীর আশ্রমে আপনি ত প্রায়ই যান শাহজাদা?'

'হ্যাঁ।' একটু হেসে ওয়াজেরের দিকে তাকিয়ে দারা বললেন, 'রোশেনারার মত তুমিও আবার আমায় কাফের বলে ডাকবে না ত?'

'না শাহজাদা। আমি এমনি প্রশ্ন করছিলাম।' ওয়াজের নম্রভাবে বললেন।

'ভাল। দেখ ওয়াজের, মনে তোমার যাই থাক, একটু বোঝবার চেষ্টা কোর। ভাল কিছু জানার চেষ্টা প্রত্যেকের কাছেই করা উচিত। আর ধর্মের কথা যদি বল, আমি বিধর্মী কাজ কিছু ত করি না। মসজিদ বল আর মন্দিরই বল, দু'জায়গাতেই আল্লার দোয়া আছে। ধর্ম কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কর্মই সব। আমি তাই ভাবি নতুন কোন এক পথের কথা, যেখানে

দাঁড়িয়ে সব মানুষ খোদার দোয়া চাইতে পারবে নতুন এক দৃষ্টি নিয়ে।'

ভাবের রাজ্যে যেন চলে গেছিলেন দারা। সেখান থেকে যেন জোর করে নিজেকে টেনে নিয়ে এসে বললেন, 'এসব কথা থাক এখন ওয়াজের। মনটা বড় চঞ্চল হয়ে রয়েছে।'

'আপনাকে আমি জানি শাহজাদা।' শ্রদ্ধা সহকারে বললেন ওয়াজের।

'ভালো। এখন একটু সুলেমানের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

'তাহ'লে সুলেমানই শাহজাদা সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবে?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে থাকবে জয় সিং আর দাউদ খাঁ। বিদ্রোহীকে দমন না করতে পারা পর্যন্ত আমার শান্তি হচ্ছে না ওয়াজের। কোন কাজই করতে পারছি না।'

'মালিক।'

বাঁদীর ডাকে দারা ঘুরে দাঁড়ালেন। পিয়ারা জানাল, 'বেগম রাণাদিল শাহজাদাকে একবার ডাকছেন।'

হ্যাঁ, রাণাদিলের সঙ্গে গত দুদিন দেখা হয় নি। হয় ত অভিমানের পাঁচিল ভেঙে ডেকে পাঠিয়েছে। মনে মনে একটু হাসলেন দারা। পিয়ারাকে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি গিয়ে বল, আমি এখনই আসছি।'

'যো হুকুম শাহজাদা।'

সেলাম জানিয়ে পিয়ারা বাঁদী চলে যেতে ওয়াজের আর অন্ত দ্বন্দ্বে ভরা দারার অন্তঃপুরের ডাককে বিলম্বিত করতে চাইলেন না। তিনি বললেন, 'আমি তাহ'লে আসি শাহজাদা?'

'যাবে?'

'হ্যাঁ। এরপর আপনাকে আটকে রাখলে বেগম সাহেবা

আমার গর্দান নিয়ে নেবেন।', হাল্কা গলায় হাসিমুখে ওয়াজের বললেন।

দারা হেসে বললেন, 'বেশ, আসতে পার।'

'পরে আবার আসব শাহজাদা। খোদা আপনার মঙ্গল করুন।' কথা কয়টি বলে ওয়াজের বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

দারা একা কিছুক্ষণ সেইখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আস্তে আস্তে অন্দর মহলের দিকে এগিয়ে চললেন।

দুই

নিজের মনে গুণগুণ করে গানের একটা কলির সুরে নিজেই মত্ত ছিল রাণাদিল। চুলের বেণীটাকে নিয়ে খেলা করছিল সে আপন মনে। শাহজাদা দুদিন আসেন নি। প্রথমে হয়েছিল অভিমান। কিন্তু অদর্শনের জন্য মনের সে মান ভাঙ্গতে দেরী হয় নি। বেণীটাকে সামগ্রী করে উপুর হয়ে আধশোয়া অবস্থায় পা দুটি দোলাতে দোলাতে সুরের গুঞ্জন তুলে খেলায় ব্যস্ত ছিল রাণাদিল। ঘরে ধূপের পাকান শিখা আর মন মাতানো গন্ধ ঘুরে ফিরে মিশে যাচ্ছিল বাতাসে।

'আমাকে ডেকেছিলে রাণাদিল ?'

রাণাদিল দারার কণ্ঠস্বর শুনে ত্রস্তে উঠে দাঁড়ায়। চকিতে একবার দেখে নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ, শাহজাদা।'

'কেন, কিছু দরকার আছে ?' দারা নরম সুরে প্রশ্ন করলেন।

রাণাদিল মুখে মৃদু হাসির আভাস নিয়ে লজ্জা মেশান গলায় বললে, 'দু'দিন শাহজাদার দেখা পাই নি। দেখতে মন চায় না বুঝি।'

'তাই না কি ?' দারা রাণাদিলের দিকে ঝকঝকে দৃষ্টিতে একবার চাইলেন।

মূল্যবান সোনার ফুলতোলা আসমানী রঙের কাপড় সুগৌর দেহটাকে পাক দিয়ে ঘিরে রয়েছে। যৌবনের উচ্ছ্বাস অন্তার্বরণে অন্তরীণ। সুডৌল মুখখানায় চকচকে কিসের একটা ছাপ। সুরমা

টানা কালো ডাগর চোখে হরিণের চোখের মত টলটলে অতলান্ত গভীরতা। টিকোল নাকে সোনায় মোড়া মুক্তার অশান্ত নোলক। পাতলা লাল ঠোঁটে বুঝি দয়িতের সান্ত্বনার আহ্বান। বাঁকা ভ্রূ দুটির মধ্যে মাথার টিক্‌লিটা মাঝে মাঝে দুলছে। আর একটা সূক্ষ্ম চিকচিকে আলো হীরের টিক্‌লিটার চারিদিকে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। হীরাপান্নার স্বর্ণাভরণগুলি আরো যেন উজ্জ্বল করে তুলেছে তাকে।

দারা চেয়ে থাকেন নিঃশব্দে। দেখে আশা যেন তাঁর মিটতে চায় না। চোখের দৃষ্টিতেও বিমুগ্ধ দ্যুতি।

দারার দৃষ্টির সাথে রাণাদিলের ঘন কালো চোখ দুটি একসময় মিলে যায়। লজ্জায় আবীরের রঙ ছড়িয়ে পড়ে রাণাদিলের মুখে। দৃষ্টি হয় নত। অলঙ্কারের রিণিঝিণি আওয়াজ তুলে অকারণে কাপড়টাকে নিটোল হাতে সংযত করে সে। নতমুখে লাজুক পায়ে কাছে এসে মৃদু স্বরে বলে, 'অমন করে কি দেখছেন শাহজাদা?'

'তোমাকে।' দারা জবাব দিলেন।

'আমাকে? সে ত রোজই দেখেন।' সবকিছু জেনে আরও কিছু শোনার জন্য ব্যগ্র হয় রাণাদিল।

'তবু দেখি। খুব ভালো লাগে। মন তাই আঁকড়ে ধরতে চায় তোমাকে।' গাঢ় গলায় বললেন দারা।

তারপর দৃষ্টিটা সরিয়ে নিয়ে মন্থর পায়ে হেঁটে পালঙ্কের উপর বসে তাকিয়াটা টেনে নিলেন দারা।

রাণাদিল আস্তে আস্তে দারার সামনে এসে বসে পড়ে। নির্ভরতা আর নিশ্চিন্ততায় দারার হাঁটুর উপর মাথা রাখে।

রাণাদিলের ঘন কালো মেঘের মত চুলের বন্যায় দারা হাতটা

ডুবিয়ে দিয়ে বিনুনি কাটতে থাকেন আদর ভরে। তারপর পরম পরিতৃপ্তিতে চোখ বুজে থাকা রাণাদিলের ন্যস্ত মুখটা দু'হাতে আস্তে আস্তে তুলে ধরেন।

থরথর দৃষ্টি নিয়ে তাকায় রাণাদিল। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে গভীরতা দেখতে চাইলেন দারা। প্রায় অস্ফুটস্বরে বললেন, 'তুমি বড় সুন্দর রাণাদিল।'

এটা দারার আবেগের কথা। এ কথা বারে বারে শুনেছে রাণাদিল। সময়ে সময়ে সে যেন অপেক্ষাও করে শোনার জন্য। ভালো লাগে শুনতে। আজও কথাটা শুনলে একটা সুখানুভূতির ঢেউ ওঠে। গলার স্বর বুজে আসে যেন। আবেশভরা চোখ আর আবেগভরা গলায় রাণাদিল বললে, 'শাহজাদাও কি কম সুন্দর। আমিও চেয়ে চেয়ে দেখি যে।'

দারা কোন কথা বলেন না। নিঃশব্দে হাসলেন শুধু।

রাণাদিল আবার মাথাটা হাঁটুর উপর রেখে চোখ বোজে।

ধূপদান থেকে সুগন্ধি ধূপের মিঠে গন্ধ ঘরের বাতাসে মিশে ঘুরে বেড়ায়। আলোর ঝালরে হাওয়া লেগে টুং-টাং মিষ্টিসুর বেজে যায়।

চুপটি করে বসে থাকে দু'জনায়। অব্যক্ত তৃপ্তির আস্বাদনে ভরে ওঠে মন প্রাণ।

রাণাদিল চোখ বোজে। মাথার উপর দারার হাতের পরশ যেন উপভোগ করে।

দারার অন্যমনস্কতায় আস্তে আস্তে সেই পরশ যেন থেমে যায়। রাণাদিল সেটা অনুভব করে।

স্তব্ধতা ভেঙে রাণাদিল ডাকে, 'শাহজাদা।'

চমক ভাঙ্গে যেন দারার, 'উঁ, কি বল?'

'কি এত ভাবছেন শাহজাদা ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দারা বললেন, 'ভাবছি আমার অশান্তির কথা। কেন এরা এই মিথ্যা কলঙ্ক আমার ওপর চাপিয়ে দিল ? আমি ত অশান্তি চাই না রাণা। আমি তোমাদের আর আমার পুঁথির মাঝে শান্তিতে থাকতে চাই। সবার শান্তির জন্য কল্পনাও করি কত কি—স্বপ্নও দেখি অনেক। কিন্তু এই অন্যায় অভিযান সে শান্তিতে আঘাত হেনেছে। আজ সুজা যুদ্ধযাত্রা করেছে—কাল মুরাদ করবে—তার পরদিন ঔরঙ্গজেব। এই সবই ভাবছি।' উথাল পাথাল মনের আবর্তনে কথা বলতে বলতে দারা দাঁড়িয়ে ওঠেন।

'ও সব কথা এখন থাক শাহজাদা।' রাণাদিল বলে।

একান্ত অবসরের মুহূর্তে এ আবিলতা আসতে দিতে চায় না রাণাদিল। উড়িয়ে দিতে চায় সব চিন্তা, বিষণ্ণতা। শুধু দুটি রাঙা হৃদয় ভালোবাসায় দুজনের মাঝে ডুব দিক। কাটুক না সময় কথা না কয়েই।

দারা বিষণ্ণ হাসির রেখা ঠেনে বললেন, 'আমিও এসব কথা মনে আনতে চাই না রাণাদিল। কিন্তু চেষ্টা করেও চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারছি না।' একটু থেমে বললেন, 'মসনদ নিয়ে বিবাদ ভবিষ্যতে হতে পারে এই ভেবেই সুজা, ঔরঙ্গজেব আর মুরাদ এদের সকলকে······আমি দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম বাদশাহকে বলে। কিন্তু সেই বিবাদ কি এড়াতে পারলাম ? বাদশাহের জীবিত থাকা কালেই তারা তলোয়ার খাপ থেকে খুলে দাঁড়িয়েছে আমার বিরুদ্ধে। লড়াই আমি করতে চাই না। তবে লড়াইয়ে নামতে ভয়ও পাই না।'

'জয় আপনার নিশ্চয়ই হবে শাহজাদা।' রাণাদিল জোরের সঙ্গেই বলল।

দারা নিঃশব্দে হাসেন শুধু।

বেশ কিছুক্ষণ কাটে আবার নীরবে। স্তব্ধতা ভাঙ্গে ঝালরের টুং-টাং শব্দে, ঝিরিঝিরি বয়ে যাওয়া হাওয়ার পালকে।

দারা দাঁড়িয়েছিলেন। রাণাদিল বসে থেকেই শুধোলে, 'আপনি বসবেন না শাহজাদা ?'

'না রাণাদিল, আজ বসব না। মনটা বড় চঞ্চল হয়ে আছে।'

'আর একটু বসুন। আমি একটা গান গাই, শুনুন। মনটা ভালো থাকবে।' রাণাদিল আকুতিভরা স্বরে বলে।

দারা মাথা নেড়ে বললেন, 'না রাণাদিল। পরে আসব, এখন যাই ?'

রাণাদিলের চোখে আশাভঙ্গের ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে।

'আচ্ছা, এখন যাই রাণাদিল।' দারা আবার বললেন।

রাণাদিল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। নতমুখে নীরবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায় সে।

দারা রাণাদিলের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের কথাটা অনুমান করার চেষ্টা করলেন। আস্তে আস্তে তাই রাণাদিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। নতমুখ দু'হাতে তুলে ধরে হাসিমাখা মুখে মৃদুস্বরে বললেন, 'কি, অভিমান হ'ল বুঝি ?'

রাণাদিল কানের দুলের আন্দোলন তুলে নীরবে মাথাটা ঝাঁকিয়ে জানালে, 'না।'

দারা একটু শব্দ করে হেসে উঠে ওর নরম ঠোঁট দুটিতে নিজের ওষ্ঠ রেখে বললেন, 'পরে আসব, কেমন ? কি, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? ঠিক আসব। এসে তোমার গান শুনব। শোনাবে ত ?'

রাণাদিল নীরবে সম্মতি জানায়। কি-ই বা বলার আছে তার।

'কি এত ভাবছেন শাহজাদা ?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে দারা বললেন, 'ভাবছি আমার অশান্তির কথা। কেন এরা এই মিথ্যা কলঙ্ক আমার ওপর চাপিয়ে দিল ? আমি ত অশান্তি চাই না রাণা। আমি তোমাদের আর আমার পুঁথির মাঝে শান্তিতে থাকতে চাই। সবার শান্তির জন্য কল্পনাও করি কত কি—স্বপ্নও দেখি অনেক। কিন্তু এই অন্যায় অভিযান সে শান্তিতে আঘাত হেনেছে। আজ সুজা যুদ্ধযাত্রা করেছে—কাল মুরাদ করবে—তার পরদিন ঔরঙ্গজেব। এই সবই ভাবছি।' উথাল পাথাল মনের আবর্তনে কথা বলতে বলতে দারা দাঁড়িয়ে ওঠেন।

'ও সব কথা এখন থাক শাহজাদা।' রাণাদিল বলে।

একান্ত অবসরের মুহূর্তে এ আবিলতা আসতে দিতে চায় না রাণাদিল। উড়িয়ে দিতে চায় সব চিন্তা, বিষণ্ণতা। শুধু দুটি রাঙা হৃদয় ভালোবাসায় দুজনের মাঝে ডুব দিক। কাটুক না সময় কথা না কয়েই।

দারা বিষণ্ণ হাসির রেখা ঠেনে বললেন, 'আমিও এসব কথা মনে আনতে চাই না রাণাদিল। কিন্তু চেষ্টা করেও চিন্তাকে দুরে সরিয়ে রাখতে পারছি না।' একটু থেমে বললেন, 'মসনদ নিয়ে বিবাদ ভবিষ্যতে হতে পারে এই ভেবেই সুজা, ঔরঙ্গজেব আর মুরাদ এদের সকলকে……আমি দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম বাদশাহকে বলে। কিন্তু সেই বিবাদ কি এড়াতে পারলাম ? বাদশাহের জীবিত থাকা কালেই তারা তলোয়ার খাপ থেকে খুলে দাঁড়িয়েছে আমার বিরুদ্ধে। লড়াই আমি করতে চাই না। তবে লড়াইয়ে নামতে ভয়ও পাই না।'

'জয় আপনার নিশ্চয়ই হবে শাহজাদা।' রাণাদিল জোরের সঙ্গেই বলল।

দারা নিঃশব্দে হাসেন শুধু।

বেশ কিছুক্ষণ কাটে আবার নীরবে। স্তব্ধতা ভাঙ্গে ঝালরের টুং-টাং শব্দে, ঝিরিঝিরি বয়ে যাওয়া হাওয়ার পালকে।

দারা দাঁড়িয়েছিলেন। রাণাদিল বসে থেকেই শুধোলে, 'আপনি বসবেন না শাহজাদা ?'

'না রাণাদিল, আজ বসব না। মনটা বড় চঞ্চল হয়ে আছে।'

'আর একটু বসুন। আমি একটা গান গাই, শুনুন। মনটা ভালো থাকবে।' রাণাদিল আকুতিভরা স্বরে বলে।

দারা মাথা নেড়ে বললেন, 'না রাণাদিল। পরে আসব, এখন যাই ?'

রাণাদিলের চোখে আশাভঙ্গের ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে।

'আচ্ছা, এখন যাই রাণাদিল।' দারা আবার বললেন।

রাণাদিল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। নতমুখে নীরবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানায় সে।

দারা রাণাদিলের মুখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের কথাটা অনুমান করার চেষ্টা করলেন। আস্তে আস্তে তাই রাণাদিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। নতমুখ দু'হাতে তুলে ধরে হাসিমাখা মুখে মৃদুস্বরে বললেন, 'কি, অভিমান হ'ল বুঝি ?'

রাণাদিল কানের দুলের আন্দোলন তুলে নীরবে মাথাটা ঝাঁকিয়ে জানালে, 'না।'

দারা একটু শব্দ করে হেসে উঠে ওর নরম ঠোঁট দুটিতে নিজের ওষ্ঠ রেখে বললেন, 'পরে আসব, কেমন ? কি, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? ঠিক আসব। এসে তোমার গান শুনব। শোনাবে ত ?'

রাণাদিল নীরবে সম্মতি জানায়। কি-ই বা বলার আছে তার।

দারা মন্থর পদক্ষেপ ফেলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

রাণাদিল ক্ষণেক দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের একপাশে জাজিমের উপর রাখা রবাবটা নিয়ে বসে পড়ে। এ রবাব দারার উপহার। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে অলঙ্কৃত চিকন আঙুল দিয়ে সুরের ঝঙ্কার তোলে।

কিন্তু মন বসতে চায় না। তাই জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলে দেয়ঃ সে। বাইরে হাওয়ায় দোলখাওয়া ঝিরঝিরে পাতার শব্দ।

তারপর রবাবটা রেখে আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে পালঙ্কের উপর বসে আরশিটা টেনে নেয় রাণাদিল। যতটুকু প্রতিফলন দেখা যায় ততটুকু খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করে সে।

কিন্তু সেই অতীতের নাচনে গাওনে ওয়ালী রাণাদিলকে সে খুঁজে পায় না। এ যেন অন্য মুখ। এ মুখে অন্য আলো। এ মুখ শাহজাদা মহম্মদ দারাশিকোর বেগমের। তৃপ্তির সূক্ষ্ম প্রলেপে কমনীয় সে-মুখ।

জীবনে আশাতীত, এতটা অকল্পিত চাওয়া জীবনটাকে পাওয়ার গর্বে ভরিয়ে তুলেছে। তার আনন্দ জীবনের আকাশটাকে আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছে। সেটা কি হাউই বাজীর মত আলো ছড়িয়ে আবার নিভে যাবে? মরীচিকার ভ্রান্তি নিয়ে সে যদি মিলিয়ে যায়? স্বপ্নের মত হয়ে উঠেছে তার জীবন। স্বপ্ন ত ভেঙেই যায়। নিয়মই তাই। আগামী যুদ্ধে যদি দারাকে পরাজিত হতে হয়? এ লড়াইয়ের লক্ষ্য দারা। না, না, মিথ্যা আশঙ্কা নিয়ে সে আর নিজেকে উতলা করবে না। ভাগ্য যখন তার সহায়, সে ভাগ্য আজ সরে দাঁড়াবে না।

জোর করে চিন্তাটাকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে রাণাদিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধূপদান থেকে পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়াটার দিকে তাকায় সে। অতীতের কথা ভাববার চেষ্টা করে। স্মৃতির সেই রঙীন দিনগুলো—যা দারার ছবি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেই ছবিগুলো অস্পষ্টভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে যেন—কথা পাক খায় মনে।

কিন্তু যেদিন চলে গেছে অতীতের মহলে—যে কথা হাওয়ায় ভেসে শূন্যে মিলিয়ে গেছে, মন শুধু রাখে তার ঠিকানা।

তিন

খোলা আকাশের পরিবর্তে কারুকার্য করা ঘরের চাঁদোয়া। সে ঘর আগ্রায় বাদশাহের হারেমে, রাণাদিলের জন্য।

দিল্লীর বাজারে নাচ দেখিয়ে আর গান গেয়ে রুজি-রোজগার করতে হয় না আর রাণাদিলকে। বাদশাহের নজরের টানে সোজা ঢুকে পড়েছিল সে দিল্লীর লাল কেল্লার রঙমহলে। বাদশাহ আর তাঁর অতিথি ওমরাহদের মনোরঞ্জন করা শুরু করেছে সে সেই থেকে। বাজারের ধূলিধূসরিত মুখে রূপের ছটা—নাচে বিলাসী বঙ্কিম ভঙ্গীমা—গানে সুরেলা আওয়াজ আকৃষ্ট করেছিল সকলকে। বাদশাহ তাই তুলে নিয়েছিলেন তাকে দিল্লীর রাস্তা থেকে।

তারপর সেখান থেকে এই আগ্রার প্রাসাদে, হারেমের কুঠুরীতে তার স্থান পাকাপোক্ত হয়েছে। এখানে কখনও নাচ, কখনও বা গানের ফরমাস হয়। বাজারের সেই পাঁচমিশেলী ভীড় নেই। এখানে শুধু বাদশাহ শাজাহান আর গুটি কয়েক মাননীয় অতিথি আর ওমরাহের দল।

পাথরে বাঁধান চকচকে মেঝেতে পা ফেলে নাচতে, গত দিনের মত পা ধূলিময় হয়ে ওঠে না। ঘর্মাক্ত মুখ অপরিস্কার কাপড়ের আঁচলে মুছতে হয় না—সুগন্ধী জলে শরীরের সব ক্লেদ যেন ধুয়ে যায়।

ভাবতে হয় না দৈনন্দিন রোজগারের পরিমান নিয়ে। সেই অর্থ চিন্তা নেই ক্ষুধার খাবারের জন্য। তবু মাঝে মাঝে বকশিস মেলে প্রচুর। গ্রাসাচ্ছাদনের ভাবনা নির্বাসিত। নাচগান দিয়ে রুজি-রোজগার করতে হ'ত বাজারে—এখানেও রোজগার সেই একই ধাঁচের। শুধু পরিবেশ আর জন বদল হয়েছে মাত্র।

তখন মাঝে মাঝে কষ্ট হ'ত বুড়ো উমেদ সিংয়ের জন্য। অনাথ রাণাদিলকে সযত্নে গড়ে তুলেছিল সে। সত্যিকারের গুণী ছিল সে। পাঁকে পদ্মফুল ফোটে। গরীব অজানা সেই লোকটা শিখিয়েছিল রাণাদিলকে নাচ আর গান। নিজের সমস্ত শিক্ষা উজার করে শিখিয়েছিল সে তাকে। শিখেওছে রাণাদিল মন দিয়ে। কুশলতা বাড়িয়েছে নিজের পরিশ্রম দিয়ে। সে যাই হোক, তখন কষ্ট হ'ত উমেদ সিংয়ের জন্যে। বৃদ্ধের অবলম্বন বলতে ছিল রাণাদিলই। কে জানে আজ সে বেঁচে আছে কিনা। থাকলেও সে জানে না কোথায় আছে উমেদ সিং? আজ ওর আর তার মধ্যে অনেক ব্যবধান।

সে পার্থক্য অবশ্য বোঝা যায়। এখানে নেই সেই অসভ্য চীৎকার, অশ্লীল ইঙ্গিত, অশালীন মন্তব্য।

নগ্ন আকাশের নীচে পাইকারী উলঙ্গ দৃষ্টির মাঝে চলত বাঁচার চেষ্টা, আর নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম। এখানেও লুব্ধতা আছে, কিন্তু বাদশাহের হারেমের মেয়েদের উপর সেটার মাত্রার মাপকাটি আছে। কিন্তু তবু নিজেকে কিছুটা বাঁচিয়ে রাখতে হয় এখানেও।

শান্তি যেন মেলে না—স্বস্তিকেও ধরা যায় না। এখানে আরাম আছে, বিশ্রামও আছে। তবু—

হারেমের মাঝে এমনিভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল রাণাদিলের। নতুন মানুষ রহস্যভরা হারেমের মাঝে জড়িয়ে পড়ে নি।

খোজার প্রহরা, বাঁদীর পরিচর্য্যা, আর মাঝে মাঝে ডাক আসে হারেমের অন্দরে। সেজে গুজে দাঁড়াতে হয় ঝালরের দ্যুতিময় আলোর তলায়। হয় নাচ, না হয় গান—ফরমাস মত করতে হয় বাদশাহের মনোরঞ্জন। কখনও শুধুই নাচতে হয়, কখনও চলে শুধু গান। না হলে অখণ্ড অবসর।

সেই অবসরে নাচ আর গানের চর্চায় নিজেকে ডুবিয়ে দেয় রাণাদিল। অভ্যাস রক্ষা হয়—রেওয়াজে বজায় থাকে গুণ।

এরই মাঝে শোনা, বাদশাহ শাজাহানের প্রিয়পুত্র শাহজাদা দারার নাম। বাদশাহের সাথে সব সময় থাকলেও মজলিসে তিনি থাকেন অনুপস্থিত। সামনের বাগিচাটা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় হারেমের ঘরগুলোর দিকে চোখ তুলেও তাকান না তিনি। হারেমের ঘরগুলির ঠিক উল্টো দিকে যমুনার দিকে বাদশাহের নিজের কক্ষ। তার দুপাশে দুই শাহজাদী জাহানারা আর রোশেনারার ঘর। সেইখানে বাদশাহের সাথে প্রয়োজন সেরে দারা আবার ফিরে যান বাগিচার উপর দিয়ে শান্ত পদক্ষেপ ফেলে।

শাহজাদা দারার কর্মব্যস্ততা জুড়ে আছে, পুঁথি, শিল্পচর্চা, ফকির সারমাদ, লালদাস যোগী, হিন্দু পণ্ডিত আর দরবার নিয়ে। অবসরযাপন করেন তিনি নিজের মহলে। এ ছাড়া অন্য কোনদিকে তার নজর নেই।

তারপর মুখে মুখে কতই না গল্প। সেখানে নায়ক দারা, শিল্পী দারা, দাতা দারা, কবি দারাশিকো। ইত্যাদি কত কি। অবাক হয়ে রাণাদিল ভাবত লোকটার কত গুণ।

পিয়ারী বাঁদী একবার বলেছিল, শাহজাদা দারাশিকো। সাগরপারের অনেক ভাষাও জানেন। পিয়ারী বাঁদী আড়াল থেকে বিদেশী লোকেদের সাথে তাদের ভাষায় শাহজাদাকে কথা বলতে শুনেছে। পরে অবশ্য রাণাদিল শুনেছে, ইউরোপ বলে নাকি একটা মহাদেশ আছে, সেই মহাদেশের অনেকগুলি ভাষা দারা জানেন। হিন্দী, ফার্সী, উর্দু ত দারার কাছে কিছুই না। অবাক লাগত রাণাদিলের, মুগ্ধ হয়ে যেত মাঝে মাঝে।

সিতিউন্নিসা—হারেমের তত্ত্বাবধায়িকা। বহুদিন থেকেই সে

অন্তঃপুরের সংস্পর্শে আছে। শাহজাদা দারার উপর তারও সুদৃষ্টি আছে।

সিতিউন্নিসা গল্প করত দারাকে নিয়ে। রাণাদিল শুনত আগ্রহভরে। কেন, তা সে নিজেও বোঝে নি। শুনতে ইচ্ছে করত, তাই জল্পনা থেকে কল্পনায় বুঝি বা পাখা মেলত মন।

সব থেকে বেশী করে বারে বারে বলত দারার শাদীর সময়কার কথা। সরল প্রকৃতির সিতিউন্নিসা যেন গর্বিত হত বলতে বলতে।

বাদশাহ শাজাহান আর প্রিয়া মমতাজ খান্দেশ বেড়াবার সময় নিজেই পছন্দ করেছিলেন স্বর্গত সুলতান পরভেজের সুন্দরী কন্যা করিমউন্নিসা বেগম বা নাদিরা বেগমকে পুত্র দারাশিকোর জন্য।

বাদশাহকে মনের ইচ্ছা জানাতে, তিনি বিনা আপত্তিতে হুকুম দিলেন শাদার বন্দোবস্ত করতে। কিন্তু বেগম মমতাজের নিজে উপস্থিত থেকে জাঁকজমক করে শাদী দেওয়ার ইচ্ছা আর পুরণ হ'ল না।

সিতিউন্নিসার সে তারিখটা মনে আছে ভালোভাবে, ১৭ জিলকাদা, ১০৪০ হিজরত (৭ই জুন, ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দ)। বুরহানপুরে গোহরারা বেগমের জন্ম দিয়ে সেই রাতেই অজানা জগতের দিকে চলে গেলেন বেগম সাহেবা। শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন শাজাহান। স্তব্ধ হয়ে গেল শাহীমহল সে শোকের হাওয়ায়। সুদর্শনা মমতাজ হারিয়ে গেলেন চিরদিনের মত। আজও তার স্মৃতির পূজা করেন শাজাহান শুভ্র তাজমহলের দিকে তাকিয়ে।

মমতাজের শব নিয়ে আগ্রায় ফিরে এলেন শাজাহান। নিস্তব্ধতা ঘিরে রইল আগ্রার কেল্লা জুড়ে। রোশনাই, মজলিস

সব নিল বিদায়। বর্তমানে তাজমহল যেখানে, তারই পাশে কবর দেওয়া হ'ল মমতাজকে। যতদিন না শেষ হয় মমতাজের চির বিশ্রামের মহল গড়া, ততদিনের জন্য।

এমনি করে দিন কাটল। কয়েক মাস চলেও গেল। কিন্তু বাদশাহ শাজাহান ভোলেন নি মমতাজের শেষ ইচ্ছা। শাদীর ব্যবস্থা করার হুকুম দিলেন। বললেন, মমতাজ বেগম বেঁচে থাকলে যে ভাবে উৎসব হত সেইভাবে যেন আয়োজন করা হয়। এতটুকু যেন কম না হয় উৎসবের জাঁকজমক। তা না হ'লে বেহেস্তে তাঁর মমতাজ দুঃখ পাবে। দারা ভাববে, তার আম্মাজান নেই বলেই এ রকম হ'ল। সেটাও শাজাহানের সহ্য হবে না।

জাহানারা বেগমও সায় দিলেন সম্রাটের কথায়। দারা তারও প্রিয়পাত্র। সে আম্মাজানের অনুপস্থিতির চিহ্ন যেন না পায়। আম্মাজান কি দারাকে কম ভালোবাসতেন ?

কোমর বেঁধে লেগে গেলেন উৎসবের আয়োজন করতে জাহানারা বেগম। সঙ্গে নিলেন সিতিউন্নিসাকে। অতিথি প্রচুর, তাই ব্যবস্থাও অনেক করার আছে। উপরন্তু, বাদশাহের পুত্রের শাদী। জাহানারা বেগমের ভাই। দ্বিগুণ আয়োজন হবে উৎসবের।

সেই বিরাট উৎসবের সমস্ত আয়োজন, ছুটোছুটি সিতিউন্নিসা আর জাহানারা বেগমই করেছিলেন।

বত্রিশ লাখ টাকা খরচ হয়েছিল শাহজাদা দারার শাদীতে। বেগম সাহেবা জাহানারা একাই দিয়েছিলেন ষোল লাখ টাকা।

'সাচক' গেছিল দুলাখ টাকার। বিরাট সমারোহ করে 'সাচক' গেছিল নাদিরা বেগমের জন্য। মমতাজের আম্মা, বড় বহিন, ফুপারা সবাই সঙ্গে গিয়েছিলেন এ শাদীতে।

'সাচক' যাওয়ার তিন মাস বাদে ১০৪২ হিজরতের ১ শাবন (১লা ফেব্রুয়ারী, ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) 'হেন্না' বন্দী উৎসব উপলক্ষে দিওয়ান-ই-খাসে বসল মজলিস—নাচ, গান, বাজনার আসর।

মমতাজের মৃত্যুর পর সেই প্রথম রোশনাইয়ের সুর বেজে উঠল আগ্রার প্রাসাদে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিচ্ছেদের পর সেই প্রথম বাদশাহ শাজাহান যোগ দিলেন উৎসবে। এসে দাঁড়ালেন প্রিয়পুত্রের শাদীর উৎসবে।

বেগম সাহেবা নিজের হাতে 'হেন্নার' রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন দারার হাত। বাঁদীরা অতিথিদের হাত রাঙিয়ে দিচ্ছিল, আর সোনার কাজ করা রুমাল বেঁধে দিচ্ছিল তাঁদের হাতে। চিকের আড়ালে থেকে মহিলারা লক্ষ্য করছিলেন, আর উপভোগ করছিলেন উৎসবের আনন্দ।

সে এক বিরাট হৈচৈ। উৎসব শেষে অতিথিরা একে একে প্রথানুযায়ী 'কোমর বন্ধ' উপহার নিয়ে বিদায় নিলেন।

পরের দিন তিন শাহজাদা—সুজা, মুরাদ এবং ঔরঙ্গজেব, শাহজাদা দারাকে শোভাযাত্রা করে নিয়ে গেলেন বাদশাহের ময়ূর সিংহাসনের সামনে। বাদশাহ শাহজাদা দারার গলায় পড়িয়ে দিলেন মুক্তার মালা। আর মাথায় বেঁধে দিলেন সেই 'সেহরা'—মমতাজ বেগমের সঙ্গে শাদীর সময় বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁকে যা পড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সেইদিন রাত দু'প্রহরে ছ ঘড়ি পেরিয়ে গেলে কাজী মহম্মদ ইসলাম বাদশাহ শাজাহানের সম্মুখে দু'জনের শাদী দিলেন।

নাদিরার জন্য 'কবিন্' ঠিক হয়েছিল পাঁচলাখ টাকা। বাদশাহ শাজাহানের হয় ত চোখ চিকচিক করে উঠেছিল। এই টাকার

অঙ্গর প্রতিশ্রুতি তিনি মমতাজের সঙ্গে শাদীর সময় দিয়েছিলেন যে।

সে যাই হোক, এই বিরাট হৈ হৈ ব্যাপার চুকল ৮ শাবন (৮ই ফেব্রুয়ারী)।

গল্পের মত লাগত সব রাণাদিলের কাছে। সিতিউন্নিসা বলত গল্পের ছলে বেশ রসিয়ে রসিয়ে।

ক্রমশঃ শাহজাদা দারাকে কাছাকাছি দেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল তার মনে।

কিন্তু উপায় নেই। শুধু চিকের আড়াল থেকে মানুষটার মন্থর পদক্ষেপে হেঁটে যাওয়া আর আসা। সেইটুকুই ভাল লেগেছিল রাণাদিলের।

আজ তারই চরম পুরস্কার অভাবিতভাবে পেয়েছে সে। পেয়েছে বাঁচার আনন্দ। মনে এসেছে সুখ, তৃপ্তির জোয়ার। না, অমঙ্গল আশঙ্কা মনে সে আর আনবে না।

তার স্মৃতির পরদা তুলে উঁকি দেওয়া অনেক ভাল।

চার

সেদিনটা ছিল গানের মজলিস। দারা এসেছিলেন বুঝি কোন বিশেষ প্রয়োজনে। বাদশাহের ইঙ্গিতে দারা বসলেন তাঁর পাশে।

রাণাদিল গান ধরেছিল।

প্রেমিকার আকুতি ছিল সেই গানে। দারাকে সামনে পেয়ে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে গাইছিল সেই রাগাশ্রয়ী গানটা। কি যেন কথাটা? আজ ভালো করে মনেও নেই।

শুধু মনে আছে উজ্জ্বল আলোর নীচে সুরমোহিত দারার মুগ্ধ দৃষ্টি, আরও যেন কি ছিল সেই চোখে। রাণাদিলের চোখও বুঝি ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল মাঝে মাঝে।

ভাবুক মানুষটার বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে নিজেকে পুরস্কৃত মনে করেছিল সে। দারা বোধহয় ভুলে গেছিলেন নিজের প্রয়োজনের কথা। গান শেষেও তাই চুপ করে বসেছিলেন তিনি।

কোন কথা হয় নি সেদিন। গান শেষে সেলাম জানিয়ে চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়েছিল রাণাদিল দারার দিকে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন দারা। সরাসরি দৃষ্টি মিলতে সজাগ হয়ে স্মিত হাসি হেসে মাথাটা একটু নুইয়ে বলেছিলেন, 'সাবাস।'

তারপর—

তার পরদিন দারা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন হারেমের মাঝে। স্বভাবতঃই সেটা একটু বিস্ময়ের ঢেউ তুলেছিল বই কি!

বাঁদী এস্তে এসে শাহজাদা দারার আগমন বার্তা জানিয়েছিল। সেও যেন একটু অবাক হয়েছিল।

শান্ত দুটি পা ফেলে, পরদা তুলে ঘরের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছিলেন দারা। একটু লাজুক হাসি ছিল তাঁর মুখে।

একটু থরথর করে যেন কেঁপে উঠেছিল রাণাদিল। সেলাম জানিয়েছিল হঠাৎ খেয়াল পড়তে।

'কাল তোমার গান শুনেছি। বেশ ভাল লেগেছে। তুমি ত শুনলাম, ভাল নাচও জান। সে প্রশংসা আমার কানে এসেছে। আজ তাই দেখতে এলাম একা, চুপিচুপি। দেখাবে?' হাসির ছটায় উজ্জ্বল মুখে বলেছিলেন দারা।

রাণাদিল সসম্ভ্রমে তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'আপনার হুকুম পেলেই নাচতে পারি। এ ত আমার সৌভাগ্য শাহজাদা।'

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে রাণাদিলের দিকে চেয়ে থেকে অস্ফট শব্দে হেসে দারা বলেছিলেন, 'বেশ, হুকুম করলাম।'

'আপনি বসুন শাহজাদা।'

দারা বসলেন।

নীরবে ঝুমুর বেঁধে প্রস্তুত হ'য়ে নেয় রাণাদিল। ডাক পাঠাতে যন্ত্রী আসে—সুর রাখতে তালে বাঁধতে।

অঙ্গে অঙ্গে লহর তুলে সেদিন নেচেছিল রাণাদিল—সুরের আওয়াজ এসেছিল অঙ্গের ভঙ্গীমায়। মন প্রাণ ঢেলে খুশী করতে চেয়েছিল শাহজাদাকে।

নৃত্যের মুদ্রার আড়াল থেকে চোখে বুঝি লেগেছিল ঝিলিক। অনুভব করেছে রাণাদিল আরেক শিল্পীর বিমুগ্ধ দৃষ্টি। দৃষ্টির প্রশংসিত চাউনিতে নিজেকে সে পরম পুরস্কৃত মনে করেছে। এ রকমটি আর কখনও মনে হয় নি—যেমন ভাবের দোলা সেদিন রাণাদিল পেয়েছিল।

নাচ শেষ হ'ল। যন্ত্রীরা বিদায় নিল।

স্বেদবিন্দু ঝড়ে পড়ছিল রাণাদিলের মুখমণ্ডলে। কিন্তু পরিশ্রান্ত যেন মনে হয় না নিজেকে। দারা তাকিয়েছিলেন তার দিকে। চোখে চোখ মিলতে চোখ নামিয়ে নেয় রাণাদিল। নতমুখে প্রায় অস্ফুটস্বরে সে বলেছিল, 'কেমন লাগল, শাহজাদা ?'

দারা যেন চমক ভেঙে নিজেকে সামলে নিলেন। দাড়ির উপর হাতটা অকারণে আলতো করে বুলিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, 'সুন্দর।'

তারপরই দৃষ্টিতে যেন অবশকরা কোন এক অজানা আকর্ষণের ছাপ ফুটে ওঠে দারার চোখে। নিজেকে যেন জোর করে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। উঠেও পড়েছিলেন আসন ছেড়ে।

দরজার কাছাকাছি গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন দারা। দৃষ্টিতে কেন যেন ছিল অস্থিরতার ঝিকিমিকি। বলেছিলেন হঠাৎ, 'তুমি বড় সুন্দর রাণাদিল।'

ঝিরঝিরে বিবশতা যেন সারা দেহে বয়ে যায় রাণাদিলের। 'তুমি বড় সুন্দর রাণাদিল।' কথাটা সেদিনের পর বহুবার বলেছেন দারা। প্রতিবারই শিহরণ জেগেছে মনে। আজও অনুভব করে যেন ভালো লাগে। আজও সেই রোমাঞ্চ অনুভবে রণিত।

কথাটা বলে দারা আর দাঁড়ান নি। আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছিলেন। হারেমের দেওয়ালে তাঁর পদশব্দ ধাক্কা খেয়ে খেয়ে নিজেকে করে ফেলেছিল ক্ষয়।

সেইদিকে রাণাদিল তাকিয়েছিল অপলকে। মনটা অকারণ খুশীর পুলকের পালক বুঝি বুলিয়েছিল। এত বড় আশা সে কি করে করেছিল ? পাওয়ার আনন্দে মনেও নেই আজ। খুশী ! খুশী ! শুধু সেই সুরটাই বেজেছিল রণরণিয়ে।

গেল সময়। গেল দিন। রাতের তারার সাজ পড়ে এল রাত্রি। কখনও গানে, কখনও নাচের আকর্ষণ দিয়ে শাহজাদা দারা শিকোকে সামনে পেল রাণাদিল। কাছেও পেল। শুধু কি তাই? অন্য কিছু কি টেনে আনে নি শাহজাদাকে?

রাণাদিল নীরবে নিজেকে পড়ায় সাজ, পড়ে সজ্জা, কল্পনার ভূষণ পড়ায় মনকে। রঙীন ফাগের মত নেশা। নিজের মনেই হাসে, কথা বলে।

কিন্তু নিজের করে পাওয়ার স্বীকৃতি কোথায়? সেই বাঁধন? শুধু মান আর ভঞ্জনের পালাতেই থাকবে না সীমাবদ্ধ।

দারাশিকো আসেন, বসেন। কথাও বলেন। নাচ দেখেন, গান শোনেন। দৃষ্টিতে থাকে তন্ময়তা। আর মুগ্ধ চোখের তারা ঘুরে ফেরে রাণাদিলকে ঘিরে।

হয় ত বা নাচ গান শেষে কোনদিন প্রশংসার কথাটুকুও না বলে রাণাদিলের হারেমের ঘরটা ছেড়ে উঠে চলে যান তিনি।

এমনি করেই কাটে দিন।

সেদিনও এমনি দারার সামনে নৃত্যে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল রাণাদিল। পায়ের ঝুমুরের ঝুনঝুনি। শব্দভরা ঘরে সেদিনও ছিল মিষ্টি ধূপের ঠাণ্ডা সুবাস। ঝিরঝিরে পাতা কাঁপান, মৃদুল বাতাস। অশান্ত কোয়েলের মুখরতায় ভরা ছিল সেইদিনটি।

নেচে চলেছিল রাণাদিল—তালে তালে, ছন্দে ছন্দে।

মুগ্ধ চোখ মেলে দেখছিলেন দারা, সেই লীলায়িত ছন্দিত ভঙ্গীমা।

ধা-ধিন-ধিন বোল বাজে—রিণিরিনি সুর ওঠে—ঝুমঝুম

ঝুমুর বাজে—বয়ে আনে যেন এক নেশার বিবশতা। দারার চোখে তাঁরই ছোঁয়াচ।

একসময় নাচ শেষ হ'ল। সঙ্গতীরা হাতের ইঙ্গিতে নিল বিদায়।

নির্ণিমেষ চোখে দারা তাকিয়ে রইলেন রাণাদিলের দিকে। নীচু আবেগ মেশান গলায় বললেন, 'তুমি, তুমি বড় সুন্দর, রাণাদিল।'

সেই কথা। কোন জবাব নেই। কিইবা বলার থাকতে পারে। শুধু শিহরণটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল রাণাদিল। শুনতে ভাল লাগে, অন্তর্নিহিত কোন পরশ বুঝি পায় সে। নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে রাণাদিল।

দারা বলে চললেন একইভাবে, 'তোমাকে যত দেখি তত ভাল লাগে। তোমার কাছে আমি বসি, কথা বলি। তবু, তবু যেন একটা অস্থিরতা কেন অনুভব করি বল ত?' কথা বলতে বলতে উঠে পায়চারী করতে শুরু করেছিলেন তিনি।

রাণাদিল একটা পরিশ্রান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'সে কথা কি ক'রে বলব শাহজাদা। হয় ত আমার নাচ, গান ভাল লাগে আপনার। তাই—'

জবাবটা ঠিক মত হ'ল না। রাণাদিল নিজেও বোঝে।

দারা ঝকঝকে দৃষ্টি মেলে একপলক দেখে নিয়ে বলেছিলেন, 'না রাণাদিল, তা নয়। শিল্পী ভালবাসি, কিন্তু তাতে মন ভরে, অস্থিরতা আসে না। সেটা নয়। হয় ত—হয় ত তুমি আমার কথা বুঝতে চাইছ না। কিম্বা বুঝতে পারছ না।' একটা আকুলতা যেন শেষ কথা গুলোতে ঝরে পড়ে। একটু থেমে সেই আকুতিভরা গলায় আগ্রহভরা চোখে আবার বললেন, 'আচ্ছা রাণাদিল, তুমি কোন দিন কল্পনা কিছু কর নি?

'কি নিয়ে শাহজাদা ?'

'কি নিয়ে ? অনেক কিছু নিয়ে। ধর—তুমি, আমি এই দু'জন ত কল্পনার বিষয় হতে পারি।' আবেগভরে বললেন দারা। আরো যেন স্পষ্ট হতে চাইলেন।

রোমে রোমে শিউরে একটা থিরথিরে কাঁপন ওঠে দেহে মনে। চোখ যেন বুজে আসতে চায়। সামলে নিয়ে মৃদু হাসি হেসে রাণাদিল বলেছিল, 'আমার কল্পনার সীমানাটা আকাশ অবধি যেতে পারে না শাহজাদা। আমার নাচ গানের তালের মাত্রা যেমন বাঁধা—সেই রকম মাত্রায় বাঁধা আমার কল্পনা।'

'কেন ?'

'আপনি শাহজাদা—হিন্দুস্থানের ভাবী মসনদের মালিক—আর আমি—।' এক মুহূর্ত্ত থেমে আবার বলেছিল, 'আর আমি সাধারণ হারেমের নর্ত্তকী। বাজারের খোলা আকাশের নীচ থেকে এসেছি বাদশাহী মহলে। সেখানে অসম্ভব যা তা নিয়ে ভাবি কি করে ?'

কি করে যে এতগুলো কথা ভালোভাবে গুছিয়ে বলেছিল রাণাদিল, আজ তা ভেবে পায় না।

দারার আরো ভালো লেগেছিল। প্রশ্ন করেছিলেন তবু, 'কিন্তু তাতে দোষ কি ?'

'দোষ অবস্থার পার্থক্যে শাহজাদা। আর ভয়ে—'

'ভয়ে ?'

'হ্যাঁ। যদি কল্পনার স্রোতে ভেসে চলে যাই—যদি হারিয়ে যাই। একটু থেমে রাণাদিল বলেছিল, 'আমার হয় ত এভাবে কথা বলা উচিত হচ্ছে না। গোস্তাকী মাপ করবেন শাহজাদা।'

হাত নেড়ে যেন গোস্তাকী মাপের প্রশ্ন উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন দারা। ধীরে ধীরে জানলাটার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু মন্দ গলায়

বলেছিলেন, 'তুমি খারাপ কিছু বল নি। খুব ভালোভাবেই যা বলবার বলেছ। শুনে আমার খারাপও লাগে নি। সুতরাং, ও কথা থাক। একটু থেমে বলেছিলেন, 'তুমি নর্ত্তকী বলে স্ফুর্ত্তি করতে আমি আসি না। সে প্রয়োজনও নেই আমার। আমি আসি মন থেকে আসার তাগিদ পাই বলে। তোমার অবস্থা, তোমার কৌলিন্য, সে নিয়েও বিচার করি নি কোনদিন। তুমি সেই সব দিনের দুঃখ ভুলে যাও। অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চয় করে রাখ। তোমার আমার মাঝে ফারাক রেখ না। আমার কাছে তুমি নর্ত্তকী নও—অন্য কিছু। তাই আজকের কথা ভাব, আগামী দিনের কথা ভাব।'

একটানা এতগুলো কথা বলে দারা চুপ করলেন।

রাণাদিল চুপ করে থাকে। ভাবতে চেষ্টা করেছিল বুঝি কিছু।

সেই এক জায়গা দাঁড়িয়ে থেকে দারা কোমল স্বরে ডেকেছিলেন, 'রাণাদিল।'

চমক ভেঙে সসব্যস্তে সাড়া দিয়েছিল রাণাদিল, 'বলুন শাহজাদা।'

'রাণাদিল, যদি কোনদিন কিছু কল্পনা আমায় নিয়ে গড়ে ওঠে, আমাকে বল।' আরো বলেছিলেন, 'সেই কল্পনার খবরের বিলাসিতাটুকু পেতে দিও। ধরে নিও, শাহজাদার এটা একটা বিলাসী খেয়াল।'

'তাতে লাভ কি শাহজাদা?' রাণাদিলের মনে খুশীর অশান্ত দাপাদাপি।

'লাভ?'

'হ্যাঁ, লাভ।' ঐ যে বললাম, আমার বিলাসিতা চরিতার্থ হবে। কারণ আমার কিছু ভাবনার মাঝে তোমার তসবির মাঝে মাঝে ফুটে

উঠেছে।' আর কত স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে। দারার কথায় মনের গোপন কন্দর উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল যেন।

রাণাদিল সমস্ত কথা হারিয়ে ফেলেছিল। এতটা সে আশা করে নি। ভেবেছিল, স্বপ্নের কথা স্বপ্নেই হবে শুরু—স্বপ্নেই হবে শেষ। প্রচণ্ড সুখানুভুতির এক ব্যথাও যেন আছে। সেই ব্যথার কারণে চোখে যেন জল এসে পড়ে, রুদ্ধ হয় বাকশক্তি।

'রাণাদিল।' নতমুখী নির্বাক রাণাদিলকে কোমল সুরে ডাক দিলেন দারা।

'উঁ, শাহজাদা।' আস্তে আস্তে মুখ তুলে অস্ফুটস্বরে জবাব দিয়েছিল রাণাদিল।

'কি, কথা বলবে না?'

'ভাবছি।'

'কি?'

'ভাবছি, যে সম্মান আপনি আমাকে দিলেন, সে সম্মান রাখার মত যোগ্যতা কি আমি পাব?' রাণাদিল স্খলিত মৃদুস্বরে থেমে থেমে আবার বললে, 'আপনাকে খুশী করব কি দিয়ে।'

'তুমিই ত আমার খুশী।'

'হয় ত তাই। কিন্তু ভয় হয় যে।'

'আমাকে তোমার ভরসা হয় না, এই বলবে ত।' একটু আহত স্বরে কৌতুকের সুর মিশিয়ে দারা বললেন।

দারার কথায় রাণাদিল তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'সে কথা নয় শাহজাদা। আমার সৌভাগ্যকে সন্দেহ হয়। ভাবছি, এটা কি সত্যি—স্বপ্ন নয় ত!'

'স্বপ্ন কি না ভাবছ?' বলে দারা রাণাদিলের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। তারপর নিজের ওষ্ঠ দুটি দিয়ে গণ্ডে একটা উত্তপ্ত স্বাক্ষর

রেখেছিলেন। তারপর কানে কানে বলেছিলেন, 'কি, তুমি জেগে আছ ত?'

রোমে রোমে কোন এক অজানা রোমাঞ্চ পরশ বুলিয়ে দেয়। সেই আঁচে রক্ত করে ছোটাছুটি। শিউরে উঠেছিল রাণাদিল।

দারা বলেছিলেন, 'রাণাদিল, আরেকবার নাচবে?'

তখনও সব কিছু যেন সামলে উঠতে পারে নি রাণাদিল। মাথাটা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে যন্ত্রের মত ডেকে উঠেছিল, 'পিয়ারা।'

'পিয়ারাকে আবার ডাকছ কেন?'

'সঙ্গতীয়াদের ডেকে পাঠাতে হবে না।'

'না, ওদের দরকার নেই। এমনিতে নাচতে পারবে না?'

রাণাদিল ঘাড় নাড়ে। মনে মনে ভাবে সঙ্গতীয়াদের কি দরকার। আজ মনের মধ্যে আছে সুর, রক্তে আছে ছন্দ। তারাই থাকবে সাথে।

রাণাদিল আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। আশাতীত এক রঙীন রামধনু তার জীবনের আকাশে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রাণাদিল মসলিনের ওড়নাটাকে ঠিক করে নিয়ে, মুখে নাচের বোল বলে সেই মত তালে তালে পা ফেলে তুলেছিল ঝুমুরের ঝঙ্কার। ঝুম—ঝুম ঝুম—ঝ ম, মাতাল হয়ে উঠেছিল যেন সেই ঘরটার আবহাওয়া।

দারা চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন।

রাণাদিলের দেহে পূর্ণ জোয়ারের উচ্ছ্বাসে যৌবনের ঢেউ যেখানে যতটুকু ওঠার উঠেছে—যেখানে নামার কথা নেমেছে। তরঙ্গিত সে দেহ বল্লরী—রূপের ছটায় গরবিনী। সেখানে উদ্দামতা নেই, কিন্তু উচ্ছ্বাস আছে। আছে ভঙ্গীমার বিকাশ।

দারা মুগ্ধ চোখে চেয়ে ছিলেন।

নাচের ছন্দের দোলায় শুভ্র শঙ্খের মত দেহটা সূক্ষ্ম মসলিনের মাঝে পিছলে পিছলে যাচ্ছিল। দেহবল্লরীর কম্পিত কোন এক কুহক, রহস্যে খেলা করে। যৌবনের আকাঙ্খিত ফুলে কোন এক আহ্বান। স্বেদবিন্দু জমে ওঠে মুখমণ্ডলে। কৃষ্ণ চুল উড়ে এসে তার উপর আঁকে আল্পনা। পদদাপের ছন্দ উর্দ্ধমুখে যাত্রা করে কাঁপন নিয়ে ছন্দে ছন্দে উদ্ধত স্পর্দ্ধায় গর্বিত কোন এক ঘোষণা। নেচে চলেছিল রাণাদিল।

মন্ত্রমুগ্ধ দারা আকাঙ্খিত কোন এক নেশায় বিভোর।

খাঁচায় বাঁধা কোয়েলটা মাঝে মাঝে ডেকে উঠছিল। কোন এক অজানা পাখী বাগিচার মাঝে বসে ডাকছিল তার প্রিয়াকে।

দেহের মাঝে বিভোর দুটি মন প্রাণ চোখ মেলে যখন চেয়েছিল, ভোরের আলোর আনন্দে ছোট্ট একটা পাখী জানলাটার উপর বসে আপন মনে কত কি যেন বলে চলেছিল মিঠে আওয়াজ তুলে।

রাতের পর্দা তুলে সূর্যের আলোর নিশান দেখে নিয়ে ক্লান্ত রাণাদিল তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে, দারার অন্তরঙ্গতার মাঝে আবার চোখ বোজে।

রাণাদিলের মাথায় হাতের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে দারা মৃদু গাঢ় স্বরে ডাকলেন, 'রাণাদিল।'

'উঁ।'

'তুমি আমার সঙ্গে চল, আমার মহলে থাকবে।'

'বেশ, যাব। কিন্তু আমার কি পরিচয় দেবেন?'

'পরিচয়? তুমি—'হঠাৎ কথা থামিয়ে দেন দারা। যেন ধরতে পেরেছিলেন কথার অন্তর্নিহিত অর্থ। বলেছিলেন, 'তুমি কি বলতে চাও বুঝেছি রাণাদিল।'

রাণাদিল জীবন সংগ্রামের পথে এইটুকু বুঝেছে, ক্ষণস্থায়ী ভঙ্গুর যৌবন সমস্ত জীবনের দায়িত্ব নেয় না। মন থাকে উপোসী। নিজের অধিকার আকাশের খসে যাওয়া তারার মত অসীমে নিরুদ্দেশ—যদি না স্বীকৃতির বাঁধনে না থাকে বাঁধা। তাতে মন ভরে—শান্তি না থাকুক, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। নইলে হারেমের ছিনিমিনির মাঝে অনেকেই বলতে পারে 'চিনি', অথবা সেই ভীড়ে মিলিয়ে যাওয়া।

'আমি জানি শাহজাদা। যে স্বপ্ন আমি দেখেছি, সেটা দিনের আলোতে মিলিয়ে যাবে।' একটু দুঃখের সুর ছিল রাণাদিলের গলায়।

'ও কথা বল না রাণাদিল।' দারা বলেছিলেন।

'কিন্তু সেই ত স্বাভাবিক।'

রাতের কুহকভরা নেশা আছে কি? নইলে এত ইতঃস্ততা দারার মনে আসে কি ক'রে? দারা বোধহয় সেই কথা ভাবছিলেন। বলতেও চেয়েছিলেন কিছু, 'কিন্তু—'

'না, শাহজাদা। মসনদে আমার লোভ নেই। শুধু আমার পাওয়ার কথাটাই সকলকে জানাতে চেয়েছি। এর বেশী কিছু নয়।' রাণাদিলের মনে হয়েছিল, তবে কি সে পাত্রের সুরার মত বিলাসী ঠোঁটের চুমুকেই ফুরিয়ে যাবে। না কি কুজনে দু'জনে মনের কথা বলবে—আরো কাছে আসবে একান্ত করে পাবে।

দারা বলেছিলেন, 'আমার মহলে থাকবে। কোন অযত্নই হবে না। সম্মানের কোন হের-ফেরও হবে না।'

রাণাদিল বলেছিল, 'গোস্তাকী মাপ করবেন শাহজাদা। কিন্তু লোভ করতে ত আপনিই শিখিয়েছেন।'

'লোভ এটা তোমার নয় রাণাদিল। আমি তোমাকে আরো

একটু কাছে পেতে চাই। তুমি চল আমার সঙ্গে। বাদশাহকে বলে তোমায় নিয়ে যাব।'

একটু হাসির শব্দের সঙ্গে বলেছিল রাণাদিল, 'এক হারেম থেকে আরেক হারেমে। শুধু এইটুকু পার্থক্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে কাজ কি শাহজাদা। এখানে কোন অসুবিধা নেই। এমন দিন গেছে মাথার ওপর চাল ছিল না। সূর্যের তাপের জ্বালার চেয়েও অনেক বেশী জ্বালাও ছিল সেদিন।' একটু থেমে রাণাদিল বলেছিল, 'এখানে বেশ আছি। আর আপনার যখন খুশী হয় আসবেন, হুকুম করবেন, বাঁদী আপনাকে আনন্দ দেবার জন্য প্রস্তুত থাকবে। হুকুমের বাঁদী হুকুম মানবে—যা বলবেন, যা চাইবেন, তাও দেবে।'

রাণাদিলের কথার ধার যেন দারা আর সহ্য করতে পারেন না। রাণাদিলের কথায় দুঃসাহসী বলে মনে না করে, আহত হয়েছিলেন বাক্যের শ্লেষে। একটু আর্তস্বরে ডেকে উঠেছিলেন, 'রাণাদিল।' তারপর বলেছিলেন, 'তুমি এ রকম ভাবে বল না রাণাদিল।'

'মাপ করবেন। ভুলে গেছিলাম যে আপনার হুকুমে আমার শির ধর থেকে আলাদা হয়ে যাবে।' কিসের এক পরীক্ষার নেশায় যেন রাণাদিল ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

'রাণাদিল, তুমি আমার সঙ্গে চল।' উঠে বসতে বসতে দারা বলেছিলেন।

'আপনি অনুরোধ করছেন কেন? হুকুম করে বাঁদীদের বলবেন, তারাই নিয়ে যাবে।' শেষমুহূর্ত পর্যন্ত শ্লেষের খোঁচা দুঃসাহস ভরে রাণাদিল দিয়েছিল। দাড়িপাল্লার দুদিক দেখতে চেয়েছিল সে।

দারা চুপ করে বসেছিলেন কিছুক্ষণ। নিষ্ফল একটা হতাশায়

রাণাদিলের হাতে চাপ দিয়েছিলেন। তারপর নিজের মনে উঠে চলে গেছিলেন অস্থির পদক্ষেপে।

রাণাদিল একইভাবে শুয়েছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়েছিল শুধু।

দারা তারপর কিছুদিন আসেন নি।

রাণাদিল ভেবেছিল, হিসাবের গণ্ডগোলে যাচনার আকুতি বোধহয় নিরুদ্দিষ্ট। আশঙ্কাভরা বুকে অনেক কষ্ট নিয়ে হাসবার চেষ্টা করেছিল সে মনে মনে। মনে করতে চেয়েছিল, শাহজাদার খাম-খেয়ালী নেশার মোহভরা একপাত্র সিরাজী সে। সবকিছুকে মেনে নেবার চেষ্টাই করেছিল সে।

হঠাৎ একদিন হারেম আবার মৌচাকের মত গুনগুন করে উঠেছিল। নিস্পৃহ রাণাদিল প্রথমে কিছু বুঝতে পারে নি! বুঝতে পারে নি সকলের চাউনির। তাকে আঙ্গুল তুলে দেখানোর কি অর্থ থাকতে পারে? কি এমন কথার স্রোতের ঢেউ এসে ধাক্কা মেরেছে হারেমের দরজায়?

কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল রাণাদিল। উত্তর খুঁজবার চেষ্টা করছিল। জবাবও অবশ্য মিলেছে।

সিতিউন্নিসা হাসিতে মুখ ভাসিয়ে একদিন রাণাদিলের কক্ষে এসে হানা দিল। কারণ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন। মুখাভাসে বোঝা গেল, সেটি নিতান্তই গৌণ। মুখ্য তার অন্য কিছু বলার ইচ্ছা—জানার আকাঙ্খা।

একটু নিয়মমাফিক তদারকটা যেন সেরে নিল সিতিউন্নিসা। কিন্তু তা না পেরে আসল প্রসঙ্গেই নেমে পড়েছিল। বলেছিল, 'কেমন আছ?'

'ভাল।' ছোট্ট জবাব দিয়েছিল রাণাদিল।

'খবর শুনেছ?' একটু রহস্যভরা গলায় প্রশ্ন করেছিল সিতিউন্নিসা।

'কিসের খবর?'

'তোমাকে নিয়ে খবর, আর তুমিই জান না!' সিতিউন্নিসার মুখে চোখে বিস্ময় ফেটে পড়ে যেন। ভ্রূ দুটি উর্ধ্বে উঠে বাঁক নেয়।

'আমাকে নিয়ে?' প্রথমে একটু অবাক লাগছিল রাণাদিলের।

'হ্যাঁ।'

সিতিউন্নিসার মুখের দিকে চেয়েছিল রাণাদিল। কেন জানে না, বুকটা একটু কেঁপে উঠেছিল রাণাদিলের। তবে কি বিপদের সঙ্কেত? সিঁদুরে মেঘের আভাস তার কাছে আগুনের মত। বিচারে পুনর্মুষিক হওয়ার ফলাফল হয় ত ঘোষণা হয়ে গেছে। মেনে নিতে হবে তাই যদি হয়। কিম্বা অন্য কিছুও যদি হয়, তাও। সাবাস, শাহী মন। নিজের মনে মনে বলে ওঠে রাণাদিল।

সিতিউন্নিসা রাণাদিলকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রশ্ন করেছিল, 'কি হ'ল, চুপ করে আছ যে?'

'কি খবর না বুঝতে পারলে কি উত্তর দেব বল।'

'সত্যি, শোন নি কিছু?'

নীরবে মাথা নেড়ে জানিয়েছিল রাণাদিল যে; সে কিছু জানে না।

সিতিউন্নিসা তার সরল মনটা নিয়ে রহস্যের পালা আর রাখতে পারে নি। বলেছিল, 'না, তুমি ঠাট্টা করছ বোধহয়।'

রাণাদিলের মন এবার অন্য স্থর গায় যেন। শঙ্কা কিছুটা কমে। কিন্তু কি? কোন কিছুই বুঝতে পারে না। উপরন্তু সব চিন্তা যেন তালগোল পাকাবার উপক্রম করে। কৌতূহলটা মাথা চাড়া

দেয় আবার। সে বলেছিল, 'সত্যি বলছি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'হুঁ।' কৌতুকের স্বরে বলেছিল সিতিউন্নেসা, 'তুমি যাদু শেখাবে?'

'যাদু!'

'হ্যাঁ। যে যাদুতে শাহজাদা তোমার জন্যে পাগল গো। সেই যাদু।'

থরথর কাঁপে বুকটা। রাণাদিল বলেছিল, 'যাদু আমি জানব কি ক'রে?'

'জান না। শাহজাদা পাগল হতে বাকী আছেন।' সিতিউন্নিসা বলেছিল।

রাণাদিল চুপ করে বসেছিল। কি বা বলবে।

সিতিউন্নিসা বেশী খেলাতে পারে না। বলে ফেলেছিল, 'তাহ'লে রাণাদিল বেগম এবার শাহজাদার মহলে গিয়ে ঢুকবে শাদী করে। এতদিন শাহজাদার মনে ত বেগম ছিলেই, এবার সকলেই সেটা জানল।' নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে অস্থির হয়েছিল সিতিউন্নিসা।

উচ্ছাসের ধাক্কায় হৃদয় উচ্ছল হয়ে সবকিছু একাকার করে দিয়েছিল রাণাদিলের। আবেগের আচ্ছন্নতায় নির্বাক হয়ে যায় সে। চোখে যেন জল ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। বিশ্বাস যেন হয়েও হয় না। কোন ক্রমে বলেছিল, 'সত্যি?'

'সত্যি না ত কি। বাদশার মত নিয়ে তবে ছেড়েছেন শাহজাদা। তোমাকে শাহজাদা শাদী করবেন। নাচতে নাচতে এরকম নাচিয়ে দিলে কি ক'রে তুমি বল ত?' আবার হেসে উঠেছিল সিতিউন্নিসা।

একটা প্রচণ্ড সুখের আলোড়নে চোখ বেয়ে এবার অঝোরে জল নেমে আসে। ঝিমঝিম করে শরীরটা—অবশ লাগে।

সিতিউন্নিসা নিজের মনে বকেই চলেছিল, 'তোমাকে তুমি বলছি বলে যেন কিছু মনে কর না। পরে পাল্টে নেব।' জবাবের কোন অপেক্ষা না রেখেই বলে চলেছিল সে, 'তুমি ভাগ্যবতী, তাই শাহজাদার মত মানুষকে পেয়েছ। সে যাই হোক, আমি কিন্তু আর খাটতে পারব না বাপু, বয়স হয়েছে ত।' বলেই আবার আগামী শাদীর ব্যবস্থাপনা কি হতে পারে সে কথায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সিতিউন্নিসা।

রাণাদিল নিথরভাবে চোখের জল ফেলে চলেছিল। সিতি উন্নিসার কথা তার কানেও যায় নি। নিজেকে সে অপরাধী ভাবছিল তখন। এমন একটা মানুষের মহত্ত্বের উপর সে সন্দেহের কলঙ্কিত ছায়া এনে ফেলেছিল। সেই অপরাধের ভার যেন রাণাদিলের বুকে চেপে বসেছিল।

পিয়ারী বাঁদী হঠাৎ সেই সময় ছুটে ঘরে ঢুকেছিল।

সিতিউন্নিসা তার কথায় হঠাৎ বাধা পড়ায় ভ্রূকুঞ্চিত করে প্রশ্ন করেছিল, 'কি চাই, পিয়ারা?

পিয়ারা রুদ্ধশ্বাসে জানিয়েছিল, 'বেগম সাহেবা।'

'বেগম সাহেবা এখানে আসছেন?'

সিতিউন্নিসার প্রশ্নে পিয়ারা জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

সিতিউন্নিসা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছিল।

বেগম জাহানারা, তাঁর বাঁদী কোয়েলকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন রাণাদিলের সম্মুখে।

রাণাদিল মুখটা মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বেগম সাহেবার হাতের ইঙ্গিতে বসে পড়েছিল আবার।

বেগম জাহানারা প্রশ্ন করেছিলেন, 'তোমারই নাম ত রাণাদিল ?'

স্খলিত কণ্ঠে রাণাদিল জানিয়েছিল, 'হ্যাঁ শাহজাদী।'

'হু।' রাণাদিলকে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন জাহানারা সেদিন।

রাণাদিলও জাহানারাকে দেখছিল। এত কাছ থেকে এমন আর কোনদিন দেখে নি সে।

প্রকৃত সুন্দরী জাহানারা বেগম। মুখ ঢলঢলে। লাবণ্যের তুলি বোলান যেন। টানা টানা দুটি ভ্রমর কালো চোখ। গঠনের সুষমায়ভরা দেহ সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিনের আবরণে মোড়া। বহুমূল্য দ্যুতিময় অলঙ্কার পরণে। বহুদিন আগের সেই আগুণে পোড়ার কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন।

রাণাদিল ভেবেছিল, মহাশয়া হয় ত তাকে কিছু বলতে এসেছেন।

কিন্তু তিনি দৃষ্টির মাপ কাঠিতে শুধু যেন মেপে নিয়েছিলেন। মুখে পড়েছিল হাসির একটা সূক্ষ্ম আস্তরণ। কিছু পরে বলেছিলেন, 'বেশ, এখন তাহলে যাই রাণাদিল। পরে কথা হবে।'

বলে আর দাঁড়ান নি। গম্ভীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছিলেন।

দারার ইচ্ছাকে সবাই যেন স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছিলেন। বাদশাহ শাদীতে রাজী ছিলেন। বেগম সাহেবা ভাইয়ের ইচ্ছায় বাধা হয়ে দাঁড়ান নি।

কিন্তু একজন, শুধু অকারণে—সেদিন অকারণই মনে হয়েছিল, নইলে আজ সে জানে, শাহজাদা দারাশিকোর বিরুদ্ধাচরণ-ই তার কাজ—সে হচ্ছে রোশেনারা বেগম। কেনইবা এই আচরণ, কি কারণে, সেটা রাণাদিল প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি।

পরে বুঝেছে, রোশেনারার মনের বিকৃত রোশনাই দারা সহ্য করতে পারেন নি। শৃঙ্খলাহীন জীবনযাপন, বিকৃত রুচির জন্য দারার প্রতিবাদ, আর অসংকোচ সমালোচনা, এই নিয়ে ওদের দ্বন্দ্ব। স্বভাব রোশেনারা পাল্টায় নি। দারার অপ্রসন্নতা ঝরে পড়ে সব সময়। সেই কারণেই বোধহয় এই পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ।

বেগম সাহেবার আগমনের পর রোশেনারা বেগমের উপস্থিতি ঘটেছিল রাণাদিলের ঘরে।

আসার কারণ হয় ত দুজনের এক ছিল—রাণাদিলকে চাক্ষুষ দেখা। কিন্তু মনে ছিল অন্য কথা।

তখন রাণাদিল মীরার ভজনের একটা কলি গুনগুন করে মৃদু সুরের রেশ তুলে গাইছিল। পিয়ারা তার পিছনে বসে রাণাদিলের রেশমের মত ঘন কালো লম্বিত চুলে আঙুল ডুবিয়ে দিয়ে পরিচর্য্যায় ব্যস্ত ছিল।

রাণাদিলের মন ভ্রমরের পাখনার মত সরব। হাঁটু দুটি দু'হাতে জড়িয়ে তার উপর চিবুকটা রেখে রাণাদিলের অলস সময় বয়ে চলেছিল। আর জীবনের অকল্পিত ভবিষ্যতে রামধনু রঙের আভাস যেন সে ভাল করে দেখতে চাইছিল।

পিয়ারার হঠাৎ কেশচর্চা বন্ধ করে সসব্যস্ত উত্থান শব্দ শুনে কৌতূহলী রাণাদিল মুখটা ঘুরিয়েছিল, কারণ অনুসন্ধান করতে।

পিয়ারার দৃষ্টি অনুসরণ করে রাণাদিল। হতবাক হয়ে গেছিল সে। পর পর দুজন শাহজাদীর দর্শন পেলে ত হবারই কথা। তবে কারণটা তার কাছে খুব দুর্বোধ্য ঠেকছিল না।

রোশেনারার পিঙ্গল চোখে কর্কশতার রোশনাই। উদ্ধত যৌবনের সমারোহ মূল্যবান বেশ-বাসে আবরিত। রূপের ঝিলিক আছে, কিন্তু কমনীয়তা নেই। এ যেন উগ্রতায় আকর্ষনীয়। মনে দাগ

কাটে না। সুন্দরতার বিচারে জাহানারা বেগমকেই যেন আগে মনে ধরে। ব্যক্তিত্বের ব্যঞ্জনাতেও ফারাক, অনুভবের মাপকাঠিতে মাপা যায়। বেগম সাহেবার শান্ত গাম্ভীর্য্যের কাছে মাথা নুয়ে আসে। রোশেনারাকে শুধু বাদশার কন্যা বলেই সম্মান জানতে হয়।

বিস্মিত রাণাদিলের দিকে তাকিয়ে রোশেনারা কর্কশতার সঙ্গে বলেছিল, 'শাহজাদীকে দেখলে সম্মান জানাতে হয়, সেটা জান বোধহয়?'

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছিল রাণাদিল। সত্যিই ত, এখনও সে শাহী পরিবারভুক্ত হয় নি। তবু যেন কুণ্ঠিত হয়ে সেলাম জানিয়ে বলেছিল. 'মাপ করবেন শাহজাদী। আমার ভুল হয়েছে।'

রাণাদিলকে নত হতে দেখে রোশেনারা যেন আনন্দে আত্মহারা। দারার কোন প্রিয়জনকে নত করতে পারলেই আত্মপ্রসাদ অনুভব করে শাহজাদী রোশেনারা।

রোশেনারা মুখে একটা ব্যঙ্গের হাসি নিয়ে রাণাদিলকে অপাঙ্গে দেখছিল। রাণাদিলের সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে রোশেনারা শ্লেষভরা হাসি মিশিয়ে বলেছিল, 'বাঃ, শাহজাদা দারার পছন্দ আছে। এক নাচনেওয়ালীকে পাঁকের মধ্যে পদ্ম খোঁজার মত বার করেছে ত। রুচি আছে। পাঁক ঘাঁটা বেশ ভালই পারে দেখছি তোমাদের দারাশিকো। করিমউন্নিসা ছাড়া অন্য দিকে নজরই তার নেই। কিন্তু সেও ত পুরোণ হয়ে গেল এবার—' হাসির দমকে কথা আর যেন শেষ করতে পারে না রোশেনারা।

কদর্য লাগল রোশেনারাকে রাণাদিলের। অযাচিত আগমন, এই শ্লেষ, দুটোই অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল তার। কিন্তু এই কদর্য্যতার কিই বা জবাব আছে। বড় নির্বোধ শয়তানী মনে হয়েছিল,

রোশেনারাকে। নির্বোধেরা বিষাক্ত শয়তানী-ছোবল মারে কারণে, অকারণে। পাত্রে, অপাত্রে।

অশান্ত হয়ে রাণাদিল বলেছিল, 'শাহজাদী কি আমাকে এই কথা শোনাবার জন্যে এসেছিলেন? না অন্য কিছু বলবেন?

হাসি যেন অনেক কষ্টে সামলাতে সামলাতে জবাব দিয়েছিল রোশেনারা, 'হ্যাঁ, অনেক কিছু বলার আছে আমার। কিন্তু এমন হাসি পাচ্ছিল যে আসল কথাই ভুলে যাচ্ছি। নাচনেওয়ালী আর—

আবার হাসির দমক যেন রোশেনারাকে স্থির থাকতে দেয় না।

নাচানে ওয়ালী। নাচনে ওয়ালী। তীক্ষ্ণ হয়ে যেন বুকে বাজে রাণাদিলের। সত্যিই সে তাই। কিন্তু সেও ত মানুষ। কোনমতে নিজেকে সামলে নেয় রাণাদিল।

রোশেনারার হাসি আবার একটু কমতে রাণাদিল স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য গম্ভীর ভাবে বলে, 'শাহজাদী, এবার বলবেন কি?'

'বলব, বলব। যা হাসির কাণ্ড।' তারপর একটু থেমে রোশেনারা বাঁকা হাসি হেসে বলেছিল, 'আজ তোমাকে নাচতে হবে, গাইতে হবে। আমাকে খুশী করতে পারলে তোমায় একজন— না থাক, এমনি প্রচুর অর্থ দেব।'

রাণাদিল কিছুক্ষণ নীরবে বসে থাকে। রোশেনারার উক্তির অন্তর্নিহিত অর্থ পরিষ্কার বলে মনে হ'ল। রাণাদিল সোজা ভাবেই জবাব দিল, 'আমি নাচতে পারব না শাহজাদী।'

'কেন? হারেমে তোমাকে রাখা হয়েছে ত প্রয়োজন মত নাচার জন্যে, আর ফরমায়েশ মত গান শোনাবার জন্য।' ভ্রূকুঞ্চিত করে রোশেনারা বলেছিল।

'আপনি ত সবই জানেন। তবু—' রাণাদিল সবিনয়ে বলেছিল।

রোশেনারা ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল, 'আমার কিছু জানা আছে কি না সেটা তোমাকে দিয়ে যাচাই করাব না। তুমি হারেমের মেয়ে, তোমার কাজ তুমি করবে না কেন?'

'শাহজাদার হুকুম নেই।'

'শাহজাদা? ওঃ! তোমার শাহজাদা দারা। কিন্তু ভুলে যেও না রাণাদিল, সেও যেমন শাহজাদা, আমিও তেমনি শাহজাদী। হিন্দুস্থানের বাদশাহের বেটী। আমি তোমাকে হুকুম করছি।' শেষের দিকে একটু জোর দিয়ে বলেছিল রোশেনারা। নিজের মর্যাদার প্রশ্ন তুলে জোর দিয়েছিল।

রাণাদিলের একটু রাগ হয়েছিল। কিন্তু সেটা সে দমন করে বলেছিল, 'আমি তা জানি শাহজাদী।'

'তবে?'

'তবু আমি পারব না।' রাণাদিল দৃঢ়তা নিয়ে জবাব দিয়েছিল। রোশেনারাকে জিততে দেবে না। মাথা সে আর নোয়াবে না। তাই সে সোজা জবাবটাই দিয়েছে।

'বেয়াদফী ক'র না রাণাদিল।' ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে বলেছিল রোশেনারা।

'আপনি মিছিমিছি আমাকে অপমান করার চেষ্টা করবেন না শাহজাদী।' রাণাদিলের কণ্ঠস্বর একটু শক্ত হয়ে ওঠে।

'অপমান? হারেমের লেড়কীর আবার মান অপমান আছে না কি?'

'যদি বলি আছে। আপনি সম্মান দিচ্ছেন না বলে ভাবছেন কেন, সেটা নেই।' রাণাদিল বলেছিল। রোশেনারার কথা তাকে ক্রমশঃ উত্তেজিত করে তুলছিল। নিজের ব্যক্তিত্বের উপর কথার ধরণে যেন ঘা লাগছিল।

'সম্মান দিয়ে কথা বল। তুমি শাহজাদীর সঙ্গে কথা বলছ, এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন ?'

পিয়ারা ঘরের মধ্যে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কি করা কর্তব্য সেটুকু চিন্তা করার ক্ষমতাও যেন অবলুপ্ত হয়েছিল।

রাণাদিল রোশেনারার কথার জবাবে বলেছিল, 'জানি, আপনি আগেও একবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—আমি ভুলি নি। এবার আশা করি আমাকে একটু একা থাকতে অনুমতি দেবেন শাহজাদী।

'আশ্চর্য! এত স্পর্ধা তোমার হ'ল কোথা থেকে ?' ভ্রূকুটি নেত্রে রোশেনারা রাণাদিলের দিকে তাকিয়েছিল।

রাণাদিল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে কসুর করে নি, 'স্পর্ধা ত কিছুই দেখাই নি শাহজাদী। আপনি দেখুন, আপনার নিশ্চয়ই আর এ নিয়ে কথা বলার ইচ্ছে নেই—তাই আমারও আর ইচ্ছে করছে না।'

রাণাদিলের ঘুরিয়ে বলা শেষের কথাটা রোশেনারা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল। মুখটা তার রক্তিম হ'য়ে উঠেছিল রাণাদিলের বেপরোয়া কথাবার্তা শুনে। হয় ত যে আশা তার মনে ছিল, ব্যর্থ হয়েছে তা বুঝতে পেরে। রাণাদিলকে আবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে বলেছিল, 'শাহজাদা দারা তোমায় মাথায় তুলেছে দেখছি। তারই জন্য তুমি আমাকে অপমান করতে সাহস পাচ্ছ। তাই না ? কিন্তু এর ফল তোমাকে দিতে পারি।'

রোশেনারার কথায় উষ্ণতার আভাস ছিল যথেষ্ট পরিমানে।

রাণাদিল সে উষ্ণতাকে গ্রাহ্য করে নি। যেন ব্যঙ্গভরেই জানিয়েছিল, 'আমাকে শাহজাদা কাউকে অপমান করার শিক্ষা দেন নি। যদি আপনাকে কোন রকম অপমানকর কথা বলে থাকি, মাফ করবেন।'

'হুঃ।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রোশেনারা বলেছিল, 'তোমার ভরসার লোকটি কোথায়? আমি ত ভেবেছিলাম এখানেই দেখতে পাব।'

'তিনি আসেন নি।'

'তার দেখা পেলে ভাল হ'ত।'

'শাহজাদী রোশেনারা।'

গম্ভীর এক সম্বোধনে রোশেনারা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। শাহজাদা দারার নিঃশব্দ আগমন বুঝতে পারে নি সে।

দারা গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, 'তোমার কি এখানে কোন প্রয়োজন আছে?'

'আছে।'

'কি সেটা জানতে পারি কি?'

'রাণাদিলকে প্রয়োজন ছিল।'

'কেন?'

'ওকে নাচ দেখাতে হুকুম করতে এসেছিলাম। কিন্তু রাণাদিল বললে যে শাহজাদার হুকুম নেই।' রোশেনারা গোবেচারার মত মুখ করে জানিয়েছিল।

'ঠিকই বলেছে রাণাদিল।'

'কিন্তু নাচনেওয়ালী নাচবে, তাতে অনুমতির প্রয়োজন কি?'

'যা বলার আমি বলেছি। রাণাদিল তোমার অনুরোধে নাচতে পারবে না। অন্য কাউকে দিয়ে তোমার মনোরঞ্জন কর।'

'কিন্তু রাণাদিলের মত কেউ নয়। আর আমি যখন হুকুম করছি, তখন—'

নাছোড়বান্দা রোশেনারাকে থামিয়ে দিয়ে দারা একটু গলার স্বর তুলে বলেছিলেন, 'তুমি ত জান, রাণাদিল আর আমার শাদীর

ঠিক হয়ে গেছে। সেজন্যে সে হুকুমটা খাটছে না, এটুকু তোমার বোঝা উচিত ছিল।'

'সত্যিই তুমি শাদী করছ? বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।' কৃত্রিমতার সুর রোশেনারার গলায় অবাকের সুর নিয়ে খেলা করে। একটু থেমে বলে, 'সত্যি তুমি তাহলে হারেমের লেড়কীটাকে শাদী করবে?'

'হ্যাঁ।'

'আফশোষ কি বাত।'

'আর কিছু বলার আছে?' দারা একটু ঝাঁঝ মিশিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

'হ্যাঁ। রাণাদিল আমাকে অপমান করেছে।' এবার যেন গম্ভীর হয়ে উঠেছিল রোশেনারা, 'ওকে শাস্তি দেওয়া উচিত।'

'তুমিও নিশ্চয় অপমান করতে চেয়েছিলে।'

'তার মানে তুমি ওকে কিছু বলবে না। বাজারের একটা লেড়কী শাহজাদীর অপমান করবে তার কোন শাস্তি নেই। তোমার দেখি মান সম্মান জ্ঞানটুকু গেছে ঐ বাজারের লেড়কীর পাল্লায় পড়ে।' রোশেনারার জিহ্বা যেন থরথর করছিল।

'রোশেনারা, যা বলবার তা বলেছি। এখন যাও, অন্য কাউকে নিয়ে গিয়ে আনন্দ কর। নয় ত তুমি নিজেও নাচতে জান। কিম্বা কাউকে ডেকে গোপনে বসে তাকে নাচাও। সেটাও ত পার।' দারা তীক্ষ্ন কণ্ঠে কেটে কেটে কথা গুলো বললেন।

পিয়ারা কি করবে ভেবে পায় না এই বাগযুদ্ধের মাঝে। নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

'তার মানে?'

'অর্থ পরিষ্কার।'

'তুমি—তুমি—আমাকে বাঁদীদের সামনে অপমান করলে। হ্যাঁ, পিয়ারা যেমন বাঁদী, তোমার পেয়ারের 'রাণাদিলও তেমনি বাঁদী।' উন্মত্ত ক্রোধে যেন লাফিয়ে উঠেছিল রোশেনারা।

'এবার তুমি যেতে পার।'

রোশেনারার কানে যেন কথা যায় না। সে বলেছিল, 'আমি এ সহ্য করব না। সাবধান।' সাপের হিস্‌হিসানির মত শোনায় সতর্কবাণীটা।

দারা নীরব।

রোশেনারা ফুঁসে ফুঁসে বলেছিল, 'শাহজাদাই বটে। নিজে তুমি কি করছ। বাজারের আর হারেমের উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে বেড়াচ্ছ।'

'রোশেনারা।' দারা চীৎকার করে উঠেছিলেন, 'তোমার যে মুখ দিয়ে অশালীন কথা বেরুবে, সে মুখ আমি বন্ধ করে দেব।'

'খুন ত আগে করেছ। শাদাউল্লা খাঁর পাশে আমার নাম লিখতে চাও নাকি? সে সুযোগ আসবে না। খুনীকে ভয়ও করি না। জোর আমারও আছে।'

নিস্ফল আক্রোশে দারা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আরক্ত চোখে বলেছিলেন, 'রোশেনারা, তুমি যাও এখান থেকে।'

'তোমার হুকুমে যাব না। নিজের ইচ্ছায় যাচ্ছি। তবে এর জবাব তোমায় দেব কাফের।' ক্রূঢ়তায় রোশেনারার মুখ বিকৃত দেখায়।

'তুমি ধর্মপ্রাণা মহিলা কবে থেকে হয়েছ? সে কথা থাক, এবার যাও।' রাগে দারার শরীর থরথর করে কাঁপছিল, তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

'যাচ্ছি।'

'তুমিও সাবধানে থেক। রাণাদিলের সম্বন্ধে যেন কোন কথা না শুনি।' দারা বলেছিলেন।

মুখে বাঁকা একটা হাসি নিয়ে রোশেনারা বেরিয়ে গেছিল।

ঘরের সেই উত্তপ্ত আবহাওয়ায়, কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় পিয়ারা। বাক্য বিধ্বস্ত নীরব ক্রন্দনমুখর রাণাদিল। আর উত্তেজিত দারার পদক্ষেপ। ঝড়ের পরের অবস্থা।

এও সে দিনের কথা। থাক, আর এটা ভেবে লাভ কি?

হ্যাঁ, ভেবে লাভ কি? সে দিনের পর আর ত এমন হয় নি। মেনেই নিয়েছে যেন সবাই, শাহজাদা দারার স্বীকৃতিকে।

শাদীতে বিরাট উৎসব হয় নি। ঝলমল করে ওঠে নি রোশনাই। উৎসব-সাজে বিশেষভাবে সাজে নি প্রাসাদ। তবু রাণাদিল তৃপ্ত। সবাই জেনেছে, সে শাহজাদা মহম্মদ দারাশিকোর বেগম। আর বেশী লোভ নেই রাণাদিলের। ভালবাসার জন আরও কাছে এসেছে। ব্যস, আর কি।

রবাবটাকে টেনে নিয়ে একটা গান ধরে রাণাদিল। শাহজাদার জয় নিশ্চিত। তার মন বলছে শাহজাদা সুজার পরাজয় হবে। নইলে—থাক সে চিন্তা।

গান গায় রাণাদিল। সুরেলা কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে বাতাসে।

পাঁচ

শাজাহান যেন অভ্যাসবশেই চিন্তাভরা দৃষ্টি মেলে রেখেছিলেন, তাঁর মমতাজের 'তাজের' দিকে।

নিঃস্তব্ধ মুহূর্তের মাঝে দানিশমন্দ খাঁ নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন শাজাহানের কথার প্রত্যাশায়।

শাজাহান অসুস্থ হওয়ার পর থেকে দানিশমন্দ তাঁর সামনে উপস্থিত হ'ন নি। প্রয়োজনও হয় নি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতির দরুণ বাদশাহ শাজাহানের ডাকে তাঁকে আসতে হচ্ছে প্রায় রোজই, অবস্থা জানাতে এবং পর্য্যালোচনার জন্য।

তাজের দিকে তাকিয়েই অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করলেন শাজাহান ওমরাহ দানিশমন্দকে, 'ঔরঙ্গজেব তাহ'লে সসৈন্যে আগ্রার দিকে পা বাড়াচ্ছে!'

সংবাদটা দানিশমন্দেরই বয়ে আনা। শাজাহানের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, জাহাঁপনা।'

'সংবাদটা কে দিল?'

'হাইবাত, জাহাঁপনা।' দানিশমন্দ জানালেন।

হাইবাত! দিল্লীর এক উচ্চ বংশে তার জন্ম। কিন্তু ভাগ্য-চক্রের ঘূর্ণীতে বাদশাহী সামরিক বিভাগে তার জীবনের নৌকা ঠেকাতে হয়েছে।

শাজাহান হাইবাতকে চেনেন। কারণ ফর্মান হাতে দিয়ে তাকে অনেকবার তিনি নিজে পাঠিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। তার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে শাজাহানের সন্দেহ নেই বললেই চলে। সুতরাং হাইবাতের দেওয়া খবরে গুরুত্ব দিতে হয় বই কি। বিশ্বাসী যুবক এই হাইবাত।

শাজাহান কিছুক্ষণ নীরবে থেকে আস্তে আস্তে বললেন, 'সুজা আর ঔরঙ্গজেব দুজনেই এক সঙ্গে—কি করা যায় বল ত দানিশমন্দ?'

উৎকন্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করলেন শাজাহান। সমাধানের সূত্র যেন তিনি খুঁজে পান না বর্তমানে। ভাবেন, এ সময় শাদাউল্লা যদি বেঁচে থাকত—তাহ'লে হয় ত সমাধানের পথটা দুজনে মিলে বার করা যেত। কিন্তু সে ত—। শাজাহান চিন্তার সূত্র কেটে দেন। ও কথা মনে করে লাভ নেই আজ। শাদাউল্লা আর ফিরবে না। দারাই—না থাক, ও সব ভাবনা।

একটু থেমে শাজাহান আবার বললেন, 'মসনদের জন্য এ লড়াই ত হওয়া উচিত নয় দানিশমন্দ, এ লড়াই আমি দেখতেও চাই না। নিজের অভিজ্ঞতা যদি মনে পড়ে, তাহ'লে ত এ পরিস্থিতিকে অভ্যর্থনা করতে পারি না।'

দানিশমন্দ সম্ভ্রম সহকারে সঙ্কুচিত স্বরে বললেন, 'কারণ কি তা ত জা'হাপনা জানেন?

'জানি। কিন্তু সে যাই হোক, আমি সকলকে জানিয়ে দিয়েছি, আমার মৃত্যুর পর এ মসনদ দারার—দারাই আমার উত্তরাধিকারী। সে ইচ্ছাটা আমার এই মিথ্যা মৃত্যু সংবাদের বেলাতে প্রযোজ্য এবং পালনীয়। তাই নয় কি?'

কথাগুলি বলে নিজের অজ্ঞাতেই যেন ডান হাতটা নাকের সামনে ধরে ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করেন শাজাহান।

বহুদিন আগে কোন এক ফকির বলেছিল যে, যতদিন হাতে আপেলের গন্ধ থাকবে, ততদিন জীবন থাকবে। মৃত্যুর কথা প্রসঙ্গে তাই বুঝি অবচেতন মনের ইঙ্গিতে ঘ্রাণ নিয়ে জীবনের শেষ দিনের সময় নির্ণয় করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। গন্ধ তিনি

কিসের পান, তিনিই জানেন। তাঁর কথায় জাহানারা বেগমকে ঘ্রাণ নিতে হয়।

শাজাহান ভাবেন, যদি এ সময় তাঁর শরীর সুস্থ থাকত—সমর্থ থাকত যদি কিছু করার—তাহ'লে সামর্থ কারো হ'ত না এ পরিস্থিতি উদ্ভবের, এ কথা সত্যি। বিবাদের সূত্র যেত হারিয়ে। সে কথা ভেবে লাভ নেই।

এখন শুধু ভাববার বিষয় যে, এ পরিস্থিতি কি ক'রে এড়ান যায়। মসনদের দ্বন্দ্ব। খুররমের অতীত জীবনের তিক্ততাপূর্ণ অভিজ্ঞতা—রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। এ বিবাদের ফলাফল শিউরে ওঠার ত। সেই অতীত জীবনে—প্রীতির সম্পর্ক, মনের সম্পর্ক, রক্তের সম্পর্ক—সে দ্বন্দ্বে কোন কিছুরই স্থান নেই। এই দ্বন্দ্বের ফলাফলের দিকে চেয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন যেন শাজাহান। তিনি এ বিবাদ চান না—চান না—চান না।

মন পিছু হটে। অনেক—অনেক দিন আগে। পর্দা তুলে পুরোণ অস্পষ্ট ছবি দেখার মত আবছা স্মৃতির ছায়াগুলির মাঝে মিশে যান যেন শাজাহান। সেদিন—মসনদের লড়াই লেগেছিল —সেইদিন—

বাদশাহ জাহাঙ্গীর মসনদে বসার মাস পাঁচেক বাদে খসরু আগ্রা ছেড়ে পাঞ্জাবের দিকে চলে গেছিল। সেখান থেকে সে বিদ্রোহ শুরু করল। অবশ্য বাদশাহ আকবরের জীবনের শেষ দিক থেকেই সম্পর্ক ভাল ছিল না বাপ-বেটায়।

বাদশাহ জাহাঙ্গীর দেরী না করে সসৈন্যে রওনা হলেন। অনেকে বলে, তিনি এত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে যাত্রার প্রথম দিনে দৈনিক বরাদ্দ আফিমের গুলি পর্যন্ত খেতে ভুলে গেছিলেন।

জলন্ধরের কাছে খসরু সহজেই হার স্বীকার করল। কাবুলে পালাবার পথে হুসেন বেগ আর আবদুল আজিজ সহ খসরু ধরা পড়ল। খোলা দরবারে বাদশাহ বিচার করলেন খসরুর—কয়েদখানাই তার উপযুক্ত স্থান বলে মনে করলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীর। আর হুসেন ও আজিজকে বাদশাহের হুকুমে গরু আর গাধার চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে—গাধার পিঠে চরান হ'ল এবং তাদের মুখ থাকল লেজের দিকে। এভাবে তাদের সহরের চারিদিকে ঘোরান হ'ল। তারপর—

তারপর খসরু কয়েদখানাতেই চোখ বুজল। সে মরণও বড় কষ্টের মাঝ দিয়ে এসেছিল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ঝড়ে পড়ল শাজাহানের, খসরুর মুখ মনে পড়তে। বড় ভালো ছিল সে। সর্বসাধারণের ভালোবাসা কুড়িয়ে ছিল খসরু। স্বভাব গুণে জনপ্রিয়তার উর্ধ্ব শীর্ষে বিচরণ করেছিল সে। শাজাহানও ভালবাসতেন তাকে। কিন্তু—

সে যাক, শাহজাদা খুররমের দিন চলে যাচ্ছিল সাম্রাজ্যের কর্তব্য সম্পাদনে। আহমদনগর বিজয়ের পর বাদশাহ জাহাঙ্গীর খুররমের নাম দিলেন 'শাজাহান' বা দুনিয়ার শাহ।

দ্বন্দ্ব শুরু হ'ল কান্দাহার অভিযানের সময়। বাদশাহ খুররমকে হুকুম দিয়েছিলেন সেই অভিযানের পরিচালনার জন্য।

মেহেরউন্নিসা বা নুরজাহান—মসনদের উপর ভবিষ্যতে যাতে জোর বজায় থাকে—সেইজন্য তাঁর প্রথম পক্ষের—আলিকুলী বেগ ইস্তাজী বা বাংলাদেশের জায়গীরদার শের আফগানের ঔরস-জাত একমাত্র কন্যার সঙ্গে খুররমের ছোট ভাই শা'রিয়ারের শাদী দিয়েছিলেন।

কান্দাহার অভিযানের সুযোগে শারিয়ারের মসনদে বসবার

ব্যবস্থা পাকা করে রাখতে চেয়েছিলেন বেগম নুরজাহান। অন্ততঃ শাজাহানের সেই ধারণা, এবং সেই কারণে শাজাহান নড়তে চাইলেন না। ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেয়ে শাজাহান বিদ্রোহ করে উঠেছিলেন।

উত্তর-পশ্চিমে পারসিকদের চাপ, আর এদিকে শাজাহান। কোনটা আগে সেটা ঠিক করতে একটু যেন দ্বিধায় পড়ে গেছিলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীর। কিন্তু বাইরের অশান্তি থেকে ঘরের শান্তি রাখতে মন দিলেন তিনি।

শাজাহান বৃদ্ধ আবদুর রহিমকে নিয়ে আগ্রার দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে শাহী ফৌজ এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। যার নামেমাত্র পুতুল নায়ক ছিল ভাই পরভেজ, আর আসল পরিচালনার ভার মহাবত খাঁর হাতে ছিল।

সে যাই হোক, দিল্লীর দক্ষিণে বালুচপুরে ভীষণভাবে হেরে গেলেন শাজাহান সে লড়াইএ।

তারপর চলল পালিয়ে বেড়ানর পালা। এ সুবা থেকে ও সুবা। কোথাও দুদণ্ড যেন স্থির থাকতে পাচ্ছিলেন না তিনি। তাড়া খেয়ে অবশেষে দাক্ষিণাত্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি।

শেষে শাজাহানকে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছিল। ভবিষ্যতের কার্য্যকলাপের জামিন হিসাবে দারা আর ঔরঙ্গজেবকে বাদশাহের কাছে পাঠিয়ে। নাসিকে আসফ খানের কন্যা—নুরজাহানের ভ্রাতুষ্পুত্রী মমতাজ বেগম আর মুরাদকে নিয়ে আস্তানা গাড়লেন তিনি। ব্যর্থতায় শেষ হ'ল সব কিছু।

ওদিকে আফগান মহাবত খাঁ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল। তার বীরত্বের বদলে সে নিচ্ছিল পদোন্নতি আর নির্ভরতা।

নুরজাহানের সেটা সহ্য হয় নি। তাঁরই জন্য মহাবত খাঁও

বিদ্রোহী হ'ল। জাহাঙ্গীরকে কাবুলের পথে বন্দী করল। নুরজাহান পালিয়ে গেলেন তাকে ফাঁকি দিয়ে।

নুরজাহান বাদশাহকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা নিষ্ফল হ'ল! শেষে নুরজাহান বিফল হয়ে বাদশাহের সাথে বন্দীত্ব মেনে নিলেন নিজেই।

তারপর দুজনে কৌশল করে মহাবতের চোখে ধূলো দিয়ে খাঁচা ছেড়ে পালালেন। ইতিমধ্যে তাঁদের হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার হয়েছিল।

এদিকে ভয়ে মহাবত খাঁ শাজাহানের কাছে পালিয়ে এসে সন্ধি করেছিল তাঁর সাথে।

ওদিকে বিজয়োল্লাস কিছুদিনের মধ্যে মিলিয়ে গেল। বাদশাহ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হ'ল ১০৩৭ হিজরত ২৮ সফর—২৯শে অক্টোবর, ১৬২৭ খ্রীঃ।

খসরুও নেই—পরভেজও পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে এই সময়ের মাঝে। মসনদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে গেলে তখন শাজাহানের ছোট ভাই শারিয়ার—নুরজাহানের জামাতা।

বাদশাহের মৃত্যুর পর সময় নষ্ট না করে নুরজাহানের কথায় শারিয়ার লাহোরে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন।

নুরজাহানের ভাই আসফ খাঁনও তাঁর জামাতার অধিকার ছেড়ে দিতে চাইলেন না। তিনি শাজাহানকে খবর পাঠিয়েছিলেন—যেন শাজাহান শীঘ্র আগ্রায় চলে আসেন। আর আসফ খাঁন, মীরবক্সী, ইরাদত খাঁকে নিয়ে লাহোরের দিকে সসৈন্যে রওনা হলেন। শাজাহানের আসার সময়টুকুর জন্য খসরুর পুত্র দাওয়ার বক্সকে সাক্ষী গোপাল করে মসনদে বসিয়ে রেখে গেলেন। তারপর বিজিত শারিয়ারের অন্ধ হ'য়ে জীবন কেটেছিল কয়েদখানায়।

শাজাহান এত্তেলা পেয়ে তড়িঘড়ি আগ্রা পৌঁছে মসনদে বসলেন বাদশাহ হ'য়ে। বিরাট এক নাম নিলেন—আবুল মুজাফ্‌ফর শিহাব-

উদ্দীন মহম্মদ সাহিব-ই-কিরাণ দুশরা, শাজাহান পাদশা গাজী।' দিনটাও মনে আছে, ৮ জামাদি-উস-মানি ১০৩৭ হিজরত—'৪ ঠা ফেব্রুয়ারী ১৬৪৮ খ্রীঃ।

আর দাওয়ার বক্স? অনেকে ওকে নাম দিয়েছিল 'উৎসর্গীকৃত ভেড়া।' মসনদের খেলায় নিষ্প্রাণ পুতুলের মত। পরে দাওয়ার বক্সকে বন্দী করা হয়েছিল—ছেড়েও দেওয়া হয়েছিল। সে তারপর পাড়ি দিয়েছিল পারস্যের পথে। বেচারী দাওয়ার বক্স। আজও মনে পড়ে তাকে। মসনদের দ্বন্দ্ব সেদিন শেষ হয়েছিল এইভাবে।

এই ত মসনদ ঘিরে খেলা। বর্তমান পরিস্থিতি প্রকার ভেদে আলাদা হ'লেও আকারে একই রকম। সেই বিগত দিনের অভিজ্ঞতার চশমা দিয়ে দেখে একটু অস্থির হয়ে পড়েছিলেন শাজাহান। অবস্থাও ঘোরালো হয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। তিনি যেন এ বিপদে সায় দিয়ে উঠতে পারছিলেন না। অন্যরকম কিছু হ'লে দারার অবস্থা কি হবে?

ভাবনার আস্তরণ ভেদ করে মনে হ'ল, কেউ যেন কিছু বলছে। বাস্তবে ফিরে এলেন শাজাহান। দানিশমন্দের দিকে তাকালেন। প্রশ্ন করলেন, 'কিছু বলছিলে দানিশমন্দ?'

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা। আপনি যদি জানিয়ে দেন, আপনি জীবিত আছেন, তাহ'লে হয় ত সমস্যার সমাধান হতে পারে।'

মাথা নেড়ে শাজাহান বললেন, 'না, তাতে কিছু ফল হ'বে বলে মনে হ'চ্ছে না। যদি সবার সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারতাম, তবে হয় ত একটা কিছু হ'তে পারত। দেখি ভেবে। কিন্তু একটা কথা ঠিক, আমি বেঁচে থাকি আর না থাকি, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ কাজ বিদ্রোহ বলেই ধরা উচিত।'

'হ্যাঁ, সেটা ঠিক, জাঁহাপনা।'

দারা বিদ্রোহীকে দমন করুক সেটা আমি চাই। কিন্তু ঔরঙ্গজেব যাতে এখন চাপ না দিতে পারে সেটা দেখতে হবে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শাজাহান বললেন, 'বেশ, তোমার কথামত ফজিল খাঁকে দিয়ে তার কাছে বলে পাঠাচ্ছি, সে যেন আগ্রার দিকে না এগিয়ে তার সুবা দাক্ষিণাত্যে ফিরে যায়। আমি এখনও বেঁচে আছি।'

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে শাজাহান যেন হাঁপিয়ে ওঠেন। জোরে শ্বাস টেনে সশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়েন তিনি।

দানিশমন্দ বললেন, 'তাহ'লে ফজিল খাঁকে ডাকতে বলে দিই জাঁহাপনা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন সম্রাট। চিন্তাভারাবনত কুঞ্চিত মুখ নীচু করে কিছু যেন চিন্তা করতে থাকেন তিনি।

দানিশমন্দ দ্বাররক্ষীকে শাহী কোষাধ্যক্ষ ফজিল খাঁকে ডাকতে হুকুম করলেন। তারপর আবার শাজাহানের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন।

অর্দ্ধশায়িত শাজাহান নীচু স্বরে সেই একই মাথা ঝোঁকান অবস্থায় বললেন, 'দারা যদি রাজনীতিজ্ঞ আর রণকৌশলী হ'ত—তাহলে আমি এত ভাবতাম না, দানিশমন্দ। দারা এ সব কিছু নয় বলেই ভাবনা। বাধাও দিতে পারছি না, নীতিতে বাঁধছে। বাধা দিতে পারছি না, যদি দারা রাগ করে, সেই ভয়ে।'

'শাহজাদা দারা মসনদের কোন অবমাননা করবেন না। তিনি হৃদয়বান পুরুষ। সাধারণের ভালবাসা তিনি ঠিকই পাবেন।' দানিশমন্দ বললেন।

শাজাহান বললেন, 'তা আমি জানি দানিশমন্দ আর মানি এ কথাও। দারাকে আমি যে জানি—সে ভাবপ্রবণ। যুক্তিতে

ভরসা না করে কল্পনায় ভাসতে চায়। আবেগের বশে সবকিছু ক'রে বসে। ভাব, কল্পনা, আবেগ, এ সমস্ত দিয়ে ত একটা সাম্রাজ্য চলে না। অন্য কিছু জানা দরকার—বোঝা প্রয়োজন।'

দানিশমন্দ বললেন, 'কিন্তু জাঁহাপনা, কোন কিছু গড়বার জন্য কল্পনা না থাকলে চলবে কি ক'রে ?'

শাজাহান দানিশমন্দের মুখের দিকে চাইলেন। সূক্ষ্ম একটা হাসি মুখে নিয়ে বললেন, 'তোমার কথা আমি বুঝেছি। তুমি দারাকে স্নেহ কর কিন্তু আমিও ত কম ভালবাসি না। কিন্তু যা সত্য সেটাকে মেনে নিতেই হবে। স্নেহের দৌর্ব্বল্যে দারাকে কিছু বলতে পারি না, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারি না তা নয়।' একটু থেমে আবার শাজাহান বললেন, 'কল্পনা না হ'লে গড়া যায় না ঠিক। কিন্তু জমীন না থাকলে ইমারত কল্পনা করাটা কি অলীক নয়, দানিশমন্দ ?' শাজাহান থামলেন। যেন হাঁপিয়ে ওঠেন এতগুলো কথা বলে।

দানিশমন্দ শাজাহানের কথায় আর কিছু বলেন না। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

শাজাহান আবার বললেন, 'আমি নিজের পাশে দারাকে সবসময় রেখেছি—বোঝাতে চেষ্টা করেছি সব কিছু—কিন্তু দারা বোঝে নি। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শেখাতে চেয়েছি কূটনীতি—দারা শেখে নি। বিরক্ত হয়েছি কিন্তু কিছু বলতে পারি নি। পড়া শুনার নেশায় সে কোন দিকে তাকায় নি। আমি ইতিহাসের কোন বীরের নাম করেছি—সে সেটা উড়িয়ে দিয়ে কোন দার্শনিকের নাম করেছে। তার কাছে সেটাই সত্য। কিছু বলি নি, পাছে দারা অভিমান করে। ঔরঙ্গজেবকে তাই ভয় হয়।'

দানিশমন্দ সবই বোঝেন। ভয়ের কারণ কি তাও বুঝতে

পারেন। দারা হৃদয়বান উদার পুরুষ, কিন্তু শুধুই ভাল মানুষ। লেখাপড়ার গণ্ডীর বাইরে তার ধীশক্তি নেই।

সুজা বীর, কিন্তু শ্লথ স্বভাবের। বিলাসপ্রিয়তা তাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

মুরাদ বীর, দিল খোলা লোক। কিন্তু অসংযমী, নেতৃত্বের শক্তি নেই।

ঔরঙ্গজেব সে দিক থেকে সর্বগুণান্বিত, রণকৌশলী, কূটনীতিক, শাসক। কখন কি করতে হয়, তা ঔরঙ্গজেবের জানা আছে। সুতরাং তাকে ভয় করার কারণ কি তা দানিশমন্দ বোঝেন। স্নেহের পাত্র দারার সাথে এই পরিস্থিতির সম্পর্ক নিয়ে তাই ভাবিত হয়ে পড়েছেন শাজাহান।

দানিশমন্দ তবু বললেন, 'ও সব সময়ে ঠিক হয়ে যাবে জাঁহাপনা।'

'হ্যাঁ, ঠিক হয়ে যাবে। সবকিছু ভুলে তাই এখনও ভাবি আমি। সব সময়ের স্রোতে ঠিক হয়ে যাবে। মমতাজকে আমার কথা জানিয়েছিলাম—সেও বলেছিল, ঠিক হয়ে যাবে সময়ে। এই আশা আমিও করি দানিশমন্দ।' একটানা কথা বলার পর দম নিতে যেন থামেন সম্রাট। মনের কথাগুলো যেন ভীড় করে বেরিয়ে আসতে চায়।

দানিশমন্দ নিজেও দারাকে লক্ষ্য করেছেন। শাহজাদা দারা ভারপ্রাপ্ত সুবাগুলিতে বলতে গেলে যেতেনই না! সুফী মত বিশ্বাসী দারা ছুটে যেতেন এলাহাবাদের দিকে মাঝে মাঝে। কারণ সুবা শাসন নয়—আকর্ষণ, হিন্দু পণ্ডিতরা আর সুফী মতালম্বী শেখ সাহেব মহিবউল্লা এলাহাবাদী।

সে তুলনায় গুজরাট, মুলতান, কাবুল সুবায় পদার্পণ ঘটত

না বললেই চলে। আগ্রায় সময় কাটাতেন দারা। শুধু কি খেয়ালে পাঞ্জাব সুবার লাহোরে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। জন হিতে সেখানে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তার প্রমাণ, সেখানকার মানুষগুলোর দারার প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু এটা সত্যি, বিরাট হিন্দুস্থানের শাসন ক্ষমতার সমতা রাখার জন্য সঞ্চয়ের ভাণ্ডার তিনি বিশেষ ভরান নি।

চমক ভাঙে দানিশমন্দের শাজাহানের কথায়।

'মসনদে বসাব দারাকে, সেটা অনেকদিন আগেই ঠিক করা। মমতাজের ইচ্ছেও তাই ছিল। সেই জন্য বিশেষ করে দরবারে 'নজর' 'নিসার' দুই-ই দারাকে দিয়ে করান হয়েছিল। মমতাজও যদি আজ বেঁচে থাকত, তাহলে—' চুপ করে যান শাজাহান। মমতাজের স্মৃতি যেন তাঁকে উদ্বেলিত করে তোলে। যে ছিল একদিন পাশে, সে আজ নেই। সে অভাববোধটাও কম নয় আজ। তাকে আজ স্মৃতি ছাড়া কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নীরবে কাটে কিছুক্ষণ। দানিশমন্দ আরো কিছুক্ষণ শাজাহানের কথার জন্য অপেক্ষা করে বললেন, 'জাঁহাপনা, যদি অনুমতি করেন তাহলে আমি যাই।'

'যাবে ? আচ্ছা যাও।'

'জাঁহাপনা কি আর কিছু বলবেন ?' যাওয়ার আগে শেষ বারের মত জিজ্ঞাসা করেন দানিশনন্দ।

'না, তুমি যেতে পার। আর পরিস্থিতি কি দাঁড়াচ্ছে তার খবর দিয়ে যেও।' শাজাহান আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন।

'আমি জানিয়ে যাব জাঁহাপনা। সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।' দানিশমন্দ জানালেন।

দানিশমন্দ কুর্নিশ করে বেরিয়ে যান।

শাজাহান একা তাঁর পালঙ্কে চুপ করে শুয়ে থাকেন উদ্বেল হৃদয় নিয়ে।

জাহানারা বেগম চিন্তাচ্ছন্ন শাজাহানের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। কিছু দূরে যমুনার পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা শুভ্র তাজমহলের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন তিনি।

শুভ্র সেই তাজমহলের দিকে চেয়ে জাহানারা বেগমও কেন জানি এক অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করেন। মনে পড়ে বুঝি, সেই সুন্দর ভালো আম্মিজানের কথা। কত ছবি যেন ভেসে ওঠে, কিন্তু সেগুলি যেন বাষ্প দিয়ে গড়া।

জাহানারা চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন অর্দ্ধশায়িত ভাবিত শাজাহানের উপর। হাতের সঞ্চালনে অলঙ্কারের শব্দ ওঠে।

শাজাহানের চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। মুখ তুলে চাইলেন শব্দের উৎপত্তিস্থল দেখবার জন্য। জাহানারাকে দেখতে পেয়ে বলীরেখাঙ্কিত মুখের উপর চিন্তার কুফল সরে গেল। স্নেহ জড়ান স্বরে বললেন, 'জাহানারা, কখন এলে?'

'এখুনি এসেছি। আপনি কি এত ভাবছেন বাদশা?' জাহানারা শাজাহানের বালিশটা সযত্নে ঠিক করে দিয়ে বললেন।

'ভাবনার কারণ ঘটেছে জাহানারা। খবর পেলাম, ঔরঙ্গজেব সসৈন্যে আগ্রার দিকে আসছে!' শাজাহান জাহানারাকে জানালেন।

'ঔরঙ্গজেব—ঔরঙ্গ—আপনাকে এ সংবাদ কে দিল?' জাহানারা বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে যে পারেন নি, সেটা তার প্রশ্নের স্বরে বেশ অনুভব করা যায়।

'দানিশমন্দ হাইবাতের কাছে খবরটা পেয়েই আমায় জানিয়েছে।

আমিও একটু হতভম্ব হয়ে গেছি জাহানারা। ঔরঙ্গজেব বড় ক্রুর, কৌশলী—তাই একটা কিছু পথ ভাববার চেষ্টা করছিলাম।'

'শ্বেতসর্প।' দাঁতে দাঁতে চেপে উক্তিটা করলেন জাহানারা।

চিরকালের খলতা যেন ঔরঙ্গজেবের মাঝে বিরাজ করছে। জাহানারা ঔরঙ্গজেবকে অপছন্দের চোখেই দেখেন। কেন যেন ঔরঙ্গজেবকে ভয়ও হয়। যতটুকু হাত জাহানারার দারার উপর আছে, সেটা ঔরঙ্গজেবের উপর থাকবে না তাও জাহানারা জানেন। ঔরঙ্গজেবের চোখে আত্মবিশ্বাসের দৃঢ় গর্বিত ছাপ যেন দেখা যায়। জাহানারা নিজের ইচ্ছার কিছু বিকাশ যেন চান। দারা তাকে মানে। ঔরঙ্গজেব হয় ত তাকে বড় বোনের ভালবাসা দিতে চায়—কিন্তু কোন অনুরোধ, উপরোধ, উপদেশ তার উপর যে বিফল, সেটা তার চতুর চোখের ছায়ায় জাহানারা বুঝতে পারেন। সেই চতুরতাই জাহানারার অপছন্দ। সেই জন্যই ঔরঙ্গজেবকে অপছন্দ করেন, কারণ ঔরঙ্গজেবের কাছে জাহানারার মর্যাদা সীমাবদ্ধ। এও এক কথা—দারার উপর জাহানারার মমত্ব—সেটাও ঠিক। দারা বোঝেন জাহানারার মন। তাই জাহানারা একটু ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন ঔরঙ্গজেবের আচরণে—তার উপর এই খবর আরও বিক্ষুব্ধ করে তোলে জাহানারাকে। অপছন্দ থেকে যেন একটা ঘৃণা ঔরঙ্গজেবের উপর হয় জাহানারার।

'জাহানারা।' সস্নেহে ডাকেন শাজাহান। বেটীর ভ্রূকুটি যেন বুঝতে পারেন কিন্তু পিতৃকর্তব্য আরও দুরূহ, সেটা একমাত্র অভিজ্ঞ শাজাহানই অনুভব করতে পারেন।

শাজাহানের ডাকে চমক ভাঙ্গে জাহানারার। নিজের মনকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, 'কিছু বলছেন বাদশা ?'

'হ্যাঁ। আমি কি করি ভেবে পাচ্ছি না জাহানারা। কি করা

উচিত, কিছুই চিন্তা করে ঠিক করতে পারছি না? কারণ যা শুরু হয়েছে তা ত সহজে থামবে বলে মনে হয় না। বড় গুরুতর বস্তু নিয়ে এ দ্বন্দ্ব।' শাজাহান আস্তে আস্তে বললেন কথাগুলো। যেন জাহানারার কাছে এর কোন মীমাংসা সূত্র চাইলেন তিনি।

'সুজা ঔরঙ্গজেব দুজনেই তাহলে বিদ্রোহী। বিদ্রোহীকে দমন করে শাস্তি দিতে হবে।' তীক্ষ্ম কণ্ঠে জাহানারা বলে উঠলেন।

'তা ঠিক। কিন্তু—'

শাজাহানের কথা শেষ করতে দেন না জাহানারা। বলে উঠলেন, 'মাফ করবেন বাদশা। বিদ্রোহীকে শাস্তি আর বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করা দুটো কি এক হবে, না সম্মানের হবে। তা ছাড়া ঔরঙ্গজেব খল। খলকে বিশ্বাস করা যায় না—নিবৃত্তও করা যায় না।' শেষের দিকে ঘৃণাভরা স্বর ঝরে পড়ে জাহানারার কণ্ঠে। একটু থেমে যোগ করে দিলেন আরো, দারার ইচ্ছা বিদ্রোহী দমন করা। সেটাই ঠিক ইচ্ছা বলে আমারও মনে হয়।'

'হুঁঃ। দেখি কত দূর কি হয়। ফজিল খাঁকে দিয়ে ঔরঙ্গজেবকে সতর্ক করে দিচ্ছি। তারপর—'

নীরব হ'লেন শাজাহান। দারার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তিনি স্নেহের দৌর্বল্যে কোন দিন পারেন নি। এখানেও তাঁকে যত রকম সাহায্য করা সম্ভব তা করতে হবে সেই ইচ্ছা বজায় রাখতে।

প্রসঙ্গে মনে পড়ে শাজাহানের সে দিনের কথা। রাণাদিলকে ঘিরে দারার ইচ্ছা। সেদিন—

শাজাহানের কক্ষে এসে দারা ঢুকে পড়েছিলেন। চোখে মুখে উদভ্রান্ততার ছাপ।

শাজাহান দারার সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে একটু বিস্মিত হয়েছিলেন প্রথমে। তারপর শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। অসুস্থ নয় ত? শঙ্কাভরা প্রশ্ন করেছিলেন তিনি, 'কি হয়েছে দারা?'

'কিছু না।' দারার স্বরে ছিল আত্মমগ্ন অস্থিরতার ছাপ।

'তোমার চেহারা এ রকম দেখাচ্ছে কেন?' শাজাহান আবার প্রশ্ন করেছিলেন।

দারা কি যেন বলতে চেয়েছিলেন, 'বাদশা—আমি—আমি।'

কিন্তু মন স্থির করতে পারছিলেন না যেন দারা। কি কথা বলা উচিত, কি রকম ভাবে বলা উচিত।

শাজাহান কৌতূহলী স্বরে সস্নেহে দারাকে বলবার জন্যে বলেছিলেন, 'বল, তুমি— ?'

'হ্যাঁ, আমি রাণাদিলকে—' সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছিলেন দারা।

'তুমি রাণাদিলকে—।' শেষ না করা কথার রহস্য তিনি বুঝতে পারেন নি। তবু ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল তাঁর।

দারা এক নিঃশ্বাসে যেন বলে ফেলেছিলেন, 'হ্যাঁ, রাণাদিলকে আমি—আমি শাদী করতে চাই।'

শাজাহান প্রথমে কোন কিছুই বুঝতে পারেন নি। কোন অর্থই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয় নি। কথাটার আকস্মিকতা থেকে স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন শাজাহান। শুধিয়েছিলেন, 'তুমি রাণাদিলকে শাদী করতে চাও। কথাটা ত তাই বললে তুমি। তাই না? আর রাণাদিল, মানে হারেমের নাচনা গানা উলি—তাই ত?'

'হ্যাঁ বাদশা।' নতমুখে দারা জবাব দিয়েছিলেন।

স্তম্ভিত হয়ে শাজাহানের বাক্যলুপ্তি ঘটছিল—শাহজাদা আর হারেমের মেয়ে। শুধু তাই নয়, রাস্তায় যার জীবিকানির্বাহ হত, গান গেয়ে বেড়াত এই সেদিনও।

অসম্ভব। দারাকে তারপর বলেছিলেন, 'তুমি কি বলছ একবার ভেবে দেখেছ দারা?'

'হ্যাঁ বাদশা। ভেবে দেখেই আপনার কাছে অনুমতি নিতে এসেছি।' ক্রমশঃ যেন জোর পেয়েছিলেন দারা।

'মানে—তুমি—।' শাজাহানের মনে এক অব্যক্ত হুড়োহুড়ি।

দারা একবার শাজাহানের দিকে চেয়ে চোখ নামিয়ে বললেন, 'আমি তাকে ভালোবাসি, বাদশা।'

'কিন্তু তুমি শাহজাদা। সমস্ত হিন্দুস্থানের মালিকের বেটা। সেটা ভুলে যাও নি নিশ্চয়।'

'না। আমি তা ভুলি নি বাদশা।'

'তবে—?'

'সেটা না ভুলেই তাকে ভালোবেসেছি। সেই শাহজাদা হিসেবেই তাকে আমার বেগমেরও মর্যাদা দিতে চাইছি।' জড়তাবিহীন স্বরে দারা বলেছিলেন।

'তোমার বিচারশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, নইলে তোমার বংশ মর্যাদা তুমি ভূলে যাচ্ছে কি করে—কি করে ভুলে যাচ্ছ নাদিরার কথা।' শাজাহান একটু জোরেই কথা বলেছিলেন। যেন সজাগ করতে চেয়েছিলেন দারাকে, 'তা ছাড়া সে হারেমের একটা সামান্য মেয়ে, কি তার বংশ পরিচয়?'

'আমি কিছু ভুলি নি বাদশা। সে কথা আপনাকে আমি জানিয়েছি। রাণাদিলকে নাদিরার পাশেই রাখতে চাই। আর বংশ মর্যাদা? বাদশাহের ঘরে সেই মর্যাদা আসবে।' দারা আবেগ ভরা গলায় বললেন। তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন।

শাজাহান অস্বস্তিকর অবস্থার মাঝে পড়েছিলেন, 'তার উপযুক্ততা কোথায়?'

'মনে, বাদশা।'

শাজাহান কিছুক্ষণ অস্থির চিত্তে ভেবে দারাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, 'দেখ দারা, রাণাদিলের রূপ আছে—তোমার তাকে ভালোও লেগেছে, সেখানে কিছু বলার নেই। বেশ, তুমি তাকে তোমার হারেমে রাখ। আমি এখনি সে হুকুম দিয়ে দিচ্ছি।'

যেন এ কথাটাতেই সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে এ রকম ভাব নিয়ে শাজাহান কাউকে যেন ডাকতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন।

দারা বলে উঠেছিলেন, 'না, বাদশা। সেটা সম্ভব নয়।'

শাজাহান একটু থমকে গেছিলেন। ভ্রূকুঞ্চিত মুখে দারার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কেন, সম্ভব নয় কেন?'

'আমার মর্যাদার প্রশ্নে সম্ভব নয়।'

শাজাহান বিস্মিত হয়েছিলেন আবার, 'তোমার মর্যাদার প্রশ্ন?'

'হ্যাঁ। রাণাদিল আমাকে ভালোবাসে। আমিও তাকে চাই বাদশা। জন্তুগুলোর মত খাঁচা বদল আমি চাই না। তাতে আমিই নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব বাদশা। আমি তাকে স্বীকৃতি দিতে চাই, তার ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে—সকলের কাছে।' দারার আবেগমন্দ্রিত গলা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল।

শাজাহান কিছুক্ষণ কোন কথা না বলে পায়চারী করে বেরিয়েছিলেন। তারপর যেন প্রায় হতাশার সুর মেশান গলায় আবার বোঝাতে চেয়েছিলেন পার্থক্য। তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না এ প্রস্তাব। বলেছিলেন, 'শিক্ষা-দীক্ষায় তোমার থেকে কতখানি পার্থক্য ভেবে দেখেছ। তাছাড়া বুদ্ধি বৃত্তিতেও—'

দারা বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলেন, গোস্তাকী মাফ করবেন বাদশা। শেখালে আর দেখালে শিক্ষা হয়। রাণাদিল বুদ্ধিমতী,

সেদিকে অসুবিধা কিছু হবে না। শিক্ষা সে নিতে পারবে, সে স্বাভাবিক বুদ্ধিও তার আছে।'

শাজাহান এবার একটু কঠিন কণ্ঠে যেন শেষ বাণ নিক্ষেপের আগে বলেছিলেন, 'তাহলে তুমি তাকে শাদি করবেই ?'

'হ্যাঁ বাদশা। আপনি আমার কথা বুঝতে পারবেন এটুকু আশা করি।' দারা বলেছিলেন।

'হু, তাকে আমি যদি সরিয়ে দি।' শেষ তীর নিক্ষেপ করে ছিলেন তখন শাজাহান।

'তাকে খুঁজে বার করব।'

'যদি তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলি।'

শাজাহানের কথায় দারার দৃষ্টি যেন ক্ষণেকের জন্য কেঁপে উঠেছিল। শিউরে যেন উঠেছিলেন তিনি। নত মস্তকে মৃদু স্বরে বলেছিলেন, 'আপনার পক্ষে সেটা কঠিন হবে না।'

'তাহলে ?' শাজাহান ভেবেছিলেন, তীরটা ঠিকই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। একটুকু হাসিও তাঁর মুখে সূক্ষ্মভাবে খেলা করেছিল।

দারা শান্তজনের মত জবাব দিয়েছিলেন, 'তাহলে রাণাদিলের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে—যেহেতু আমাকে ভালোবেসে তাকে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হ'ল। হ্যাঁ, সে যাই হোক, তাকে বলতে হবে আমায় যে, ভালোবাসার পুরস্কার হিসেবে তার ভাগ্যে এ রকম কিছু ঘটবে, এটা আমি ভাবি নি।'

'তার মানে ?' কথার অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন না যেন শাজাহান।

'আমাকেও তার সঙ্গে অন্য দুনিয়ায় চলে যেতে হবে।' শাজাহানের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন দারা।

'কি বলছ তুমি পাগলের মত ?' শাজাহান একটু শঙ্কিত হয়ে

বলে উঠেছিলেন। ভাবাবেগে চালিত দারার পক্ষে আশঙ্কা করার মত কিছু করাও সম্ভব।

'হ্যাঁ, বাদশা। আমি ঠিকই বলেছি।' মৃদুস্বরে দারা বলেছিলেন।

'তোমাকে জীনে পেয়েছে নাকি ?'

'না বাদশা, আমি সুস্থ শরীরে এবং সজ্ঞানেই বলছি।'

'শাদি তুমি করবেই ?' শঙ্কিত শাজাহান বলে উঠেছিলেন।

'হ্যাঁ। আপনার অনুমতি নিশ্চয় পাব বলে আশা করি।'

'তোমার মত কিছুতেই পাল্টাতে পার না ?'

'না বাদশা, তা হয় না।'

'আচ্ছা।'

দারা মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন জানিয়ে ধীরে ধীরে নত মস্তকে বেরিয়ে গেছিলেন কুঠুরী ছেড়ে।

শাজাহানের মনে ভয় ঢুকেছিল, কি জানি, কি করে বসে দারা। মন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। একটু ভীতও যেন হয়ে উঠেছিলেন মনে মনে প্রিয় পুত্রের জন্য।

ব্যস্ত হয়ে তিনি দারার অধীনস্থ অন্যতম সেনাধ্যক্ষ গুল মহম্মদকে ডেকে পাঠিয়ে নজর রাখতে বলেছিলেন।

গুলমহম্মদ দারার উপর শ্রদ্ধাশীল। এই ভাবুক শাহজাদাকে সে ভালোবাসত। সে কিছু বোঝে নি। তবে যতটুকু ইঙ্গিত আর তাগিদ পেয়েছিল, তাতে সেও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

খবর পেয়েছিলেন শাজাহান। যেন উদভ্রান্ত হয়ে গেছেন দারা। কোন কিছুতেই যেন খেয়াল নেই। মুখে রাজ্যের মলিনতা যেন।

হারেমের দরজা অবধি গিয়ে রাণাদিলের সংবাদ নিয়ে ফিরে আসেন সম্রাট। তার কারণ—তিনি বুঝেছিলেন, রাণাদিলের কিছু ঘটেছে কিনা দেখে যান দারা।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন শাজাহান—পাগল না হয়ে যায় ছেলেটা। তাই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা স্থির করে ফেলেছিলেন—মত দেবেন এ শাদিতে। যদি এতে দারাকে সুখী করা যায় তাই মত দেবেন তিনি। এই রকমই ঠিক করে ফেলেছিলেন শাজাহান। দারার বিষণ্ণ মুখ কেবলই ভেসে উঠেছিল তাঁর মনে।

জাহানারাও দারার খবরের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। সংবাদের পরিমান যতখানি হয়, তার থেকে পরিধি ত মহলের লোকমুখে বেড়েই যায়।

সেদিন শাজাহানের ঘরে জাহানারা, রোশেনারার সম্মুখেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'দারার কি হয়েছে? আপনি কি কিছু জানেন?'

শাজাহান জবাবে জানিয়ে ছিলেন, 'হ্যাঁ।'

'কি?'

'দারা রাণাদিলকে শাদি করতে চায়।'

'রাণাদিলকে—মানে নর্তকী রাণাদিল?'

'হ্যাঁ। আমার কাছে সে অনুমতির জন্য এসেছিল।'

'আপনি অনুমতি দিয়েছেন?' জাহানারা প্রশ্ন করেছিলেন আবার।

'না, এখনও দিই নি। তবে হয় ত দিতে হবে। দারার কষ্টে আমারও কষ্ট লাগছে জাহানারা।' শাজাহান মৃদুস্বরে দীর্ঘ একটা শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলেছিলেন।

'অনুমতি দিয়েই দিন বাদশা। দারার ইচ্ছা যখন—আমি

একবার দেখেও আসব রাণাদিলকে। শুনেছি, সে খুব সুন্দরী।' সায় দিয়ে জাহানারা বলে উঠেছিলেন।

শাজাহান একটু চোখ তুলে তাকিয়েছিলেন জাহানারার দিকে। হয় ত পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন জাহানারার অন্তরের খবর।

রোশেনারা ব্যঙ্গোক্তি করে উঠেছিলেন, 'এক নাচনেওয়ালী বাজারের মেয়ে, ওকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন?'

'রোশেনারা।' শাজাহানের সম্মুখেই ধমক দেওয়ার সুরে বলেছিলেন জাহানারা।

রোশেনারা গম্ভীর মুখে তীক্ষ্ণ স্বরে বলে উঠেছিলেন, 'না, আমি বলব। ধমক দিয়ে আমাকে চুপ করাতে পারবে না। বাদশা এ শাদিতে মত দিতে পারেন না। আমিও এ শাদি সমর্থন করি না।'

'তোমার মতের জন্য কিছু আটকে থাকবে না। তোমার সমর্থন নেই, কিন্তু বাদশার সমর্থন আছে। তিনি অনুমতি দেবেন বলে ঠিক করেছেন। সুতরাং তোমার মতটা চাপাবার চেষ্টা কর না।'

জাহানারা সংযত, গম্ভীর স্বরে রোশেনারার উদ্দেশ্যে কথাগুলি বলেছিলেন।

'বাদশা?' শাজাহানের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন রোশেনারা, বাদশাহের সিদ্ধান্ত জানতে।

শাজাহান জাহানারা বেগমের কথার সমর্থনেই বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি এ শাদিতে অনুমতি দেব বলেই ঠিক করেছি।'

'কিন্তু কি উপযুক্ততা, মর্যাদা রাণাদিলের আছে যাতে—'

রোশেনারার কথায় বাধা দিয়ে শাজাহান বলেছিলেন, 'দারা তাকে শাদি করতে চেয়েছে সে টুকুই যথেষ্ট।'

'কিন্তু এর ফল কি ভাল হবে?'

'খারাপ হবে কি না একথা যখন বলতে পারছি না, তখন

ভালো হবে না এমন কথাও বলতে পারছি না।' শাজাহান বলেছিলেন, 'তাছাড়া দারা যখন চাইছে—'

শাজাহানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রোশেনারা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'কেন, সে যা চাইবে তাই পাবে? কই, আমি যা চাই সেটা ত পাই না।'

রোশেনারার মনের আসল কথা বেরিয়ে পড়েছিল। শাজাহান কিছুক্ষণ ভ্রুকুটিভরা দৃষ্টিতে রোশেনারার দিকে চেয়েছিলেন। খারাপ লেগেছিল তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কথা বলতে। এ রকম বেয়াদপী তাঁর পছন্দ হয় না।

জাহানারা আব্বাজানের হয়ে জবাব দিয়ে ছিলেন, 'কারণ, তোমার চাওয়া আর দারার চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে।'

'কিসের পার্থক্য?'

'মনের পার্থক্য। মন তার উঁচু বলেই সে স্বীকৃতির মর্যাদা দিতে চাইছে।'

'শাহজাদা দারাশিকোর মন আছে আর কারো নেই। এক কাফের যখন যা চাইবে—' ফুঁসে উঠে রোশেনারা বলেছিলেন।

'রোশেনারা,' জাহানারা রূঢ়ভাবে একটু জোরে বলেছিলেন, 'দারার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে ভেবে বলবে। শাদির কথা তোমার বক্তব্য নয়। দারার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ানই তোমার ইচ্ছা। কেন তোমার এত অপছন্দ তাকে? তোমার জঘন্য কার্যকলাপের জন্য সে তোমার মুখের ওপর প্রতিবাদ জানায় বলেই তোমার এত রাগ। তাই বাধা সৃষ্টি করাটাই তুমি ঠিক করে নিয়েছ, তাই না?'

'আমি কি করি না করি, তার বিচারক তুমি নাকি?' চোখ দুটো ছোট করে রোশেনারা প্রশ্ন করেছিলেন।

'যদি বলি তাই। তোমার মন জঘন্য, কাজও জঘন্য। শুধু তাই নয়, নিন্দনীয়ও।' গম্ভীর ভাবে বলেছিলেন জাহানারা বেগম।

'কি বলতে চাইছ তুমি?' রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করেছিলেন রোশেনারা।

'তুমি তা ভাল করেই জান, কি বলতে চাইছি। দারার সম্বন্ধে কোন কথা তোমার মত মেয়ের মুখে শোভা পায় না।' জাহানারা বেগম বলেছিলেন।

'আমার মত মেয়ে? এ কথার অর্থ।' রেগে রোশেনারা ফুলে ফুলে উঠছিলেন যেন।

'আরও পরিষ্কার করে তোমার গোপনাচারের কথা বলতে হবে?' ব্যঙ্গের স্বর নিয়ে এবার বলেছিলেন জাহানারা।

'কি বললে? আর আমি তোমার কথা জানি না মনে কর, তাই না? আমি সব জানি। তুমি, তুমি—' রোশেনারার মুখ যেন বিকৃত হয়ে ওঠে ক্রোধে।

শাজাহান এতক্ষণ নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে দুজনের কথা শুনছিলেন। রোশেনারার কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলেন, 'রোশেনারা তোমার বেয়াদপী অনেকক্ষণ থেকে সহ্য করেছি। আর নয়। আমার ধৈর্য্যের পরীক্ষা করতে যেও না।'

'কিন্তু আমাকে অপমান কেন করা হবে?' শাজাহানের কণ্ঠস্বরে নিজেকে অনেকটা যেন গুটিয়ে নিয়েছিলেন রোশেনারা।

'ব্যস্।' শাজাহান ছেদ টেনে দিতে চেয়েছিলেন প্রসঙ্গের উপর। তারপর বলেছিলেন, 'দারার শাদির ব্যাপারে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই নি। দারাও তোমার অনুমতি চায় নি।'

'মর্যাদার প্রশ্ন বলেই বলেছি। তাছাড়া দারা যা চাইবে

তাই বাদশা দেবেন, সেটা কি পক্ষপাত নয়? এ ভাল নয়।' রোশেনারা ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদটা সোচ্চার করতে চেয়েছিলেন।

'চুপ কর। এবার তুমি যেতে পার।' শাজাহান তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠেছিলেন।

'বেশ।' যাবার আগে জাহানারাকে শুনিয়ে গেছিলেন, 'আমার কাজের বিচার তোমারও করা শোভা পায় না। আমার খুশী হয় করি। তুমি কি ভাববে তা আমার প্রয়োজন নেই।' বলে আর দাঁড়ান নি রোশেনারা।

শাজাহান নিষ্ফল ক্রোধে প্রথমে একটু কেঁপে উঠেছিলেন। তারপর নিজেকে শান্ত করে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে যেন স্বগতোক্তি করেছিলেন, 'আমার বাগিচায় যে গাছ আমি পুঁতেছিলাম, সব কটায় ভাল ফল ধরে নি।'

আর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শাজাহান যেন বাস্তবে ফিরে আসেন।

রোশেনারা সেদিনের পর থেকে প্রয়োজন না পড়লে আসে না। সে চিন্তা থাক। বর্তমান সমস্যা ভাবিয়ে তুলেছে শাজাহানকে। হাকিমদের নির্দেশের রজ্জুতে বাঁধা সম্রাট শয্যার মাঝে অস্বস্তি বোধ করেন যেন। এক অশুভ ছায়া যেন তাঁর দৃষ্টিতে। সে ছায়া যেন ক্রমশঃ ঘিরে ধরছে তাঁকে।

চঞ্চল মনে হতাশা মাখান এক বিরক্তি যেন অনুভব করেন শাজাহান। কর্তব্য স্থির করে উঠতে পারেন না।

কি উপায়? উত্তরের আশায় যেন চিন্তাভরা দৃষ্টি মেলে ধরেন তাঁর মমতাজের 'তাজের' দিকে।

ছয়

রাণাদিল চঞ্চল চোখে দরজার দিকে তাকায় মাঝে মাঝে। পদধ্বনি শোনার চেষ্টায় কান পেতে রাখে। প্রতীক্ষা করে।

সুলেমান শিকোর যাত্রার দিন থেকে দারা আর আসেন নি। রাণাদিল দারার আগমনের আশায় মুহূর্ত গুণছিল।

প্রতীক্ষা করা মন দেখা না পেয়ে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল। সামনের বাগিচায় ফুলের সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে ভর করে ঘুরে বেরায়। ভ্রমরের মত মধুলোভা মন গুন্‌গুন্‌ করে ঘুরে ফিরে সেই সাথে।

রাত্রির পূর্বরাগে সন্ধ্যার আলাপন আকাশে। তারার বাতিগুলো জ্বেলেই পালিয়ে যাবে সন্ধ্যা। তারই আয়োজন চলেছে যেন আকাশটায়। দুটো একটা তারা জ্বেলে যেন ব্যস্ত পরীক্ষায়।

ঘরের বাতিদানে বাতিটা পিয়ারী বাঁদী জ্বেলে দিয়ে গেল। রাণাদিল চুলের বিনুনীটাকে ঠিক করে বাঁধতে বাঁধতে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলল। সামনের গাছটায় ছোট পাখীগুলো ফিরে এসে সমস্বরে হাঁকডাক শুরু করেছে—কলরবে বুঝি সারাদিনের কত জমান কথাই বলছে।

রাণাদিল গুন্‌গুন্‌ করে নতুন শেখা আবু সৈয়দের গানের একটা কলি গাইছিল, আর অলস অঙ্গুলি সঞ্চারে বসে চুলগুলিকে সুসংবদ্ধ করছিল।

মৃদু একটা পদশব্দ যেন কানে ভেসে আসে রাণাদিলের। তবে নিশ্চয়ই···। না, অভিমানের পরদায় মুখটা ঢেকে রাখে সে। ফিরে না দেখাই ভাল।

অখণ্ড মনোযোগে যেন নিজেকে তার লম্বা বিনুনীর পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলেছে রাণাদিল। অন্তত বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হয়।

'বহিন।'

নারীকণ্ঠের মৃদু ডাকে মুখ ফিরিয়ে তাকায় রাণাদিল। নাদিরাকে দেখে একটু বিস্মিত বোধ করে সে। উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রশ্ন করলে, 'করিম উন্নিসা বেগম, আপনি ?'

যেন কোন আশঙ্কায় নাদিরার মন ভরে ছিল। চোখে তারই আভাস। সে জবাব দিলে, 'হ্যাঁ বহিন, আমি।'

নাদিরা, রাণাদিলের সঙ্গে বহিনের সম্পর্ক পাতিয়েছে প্রথম দিন থেকে। সব খবরই নাদিরা জানত।

যেদিন দারা এসে সব কথা খুলে বলেছিলেন, সেদিন কিছুসময় চুপ করে ভেবে মৃদু হাসিভরা মুখে নাদিরা বলেছিল, 'বেশ ত, আপনাকে আমি যতটা ভালোবাসি, সে এসে কি কিছু কমাতে পারবে। না, তা পারবে না। আপনি যাকে ভালোবাসেন, সে ত আমারও ভালোবাসার লোক।'

দারা একটু অবাক চোখে নাদিরার চকচকে চোখ দুটির দিকে চেয়ে ছিলেন। নাদিরা কিছু পেল কি না বিচার করে নি। সে যে দিতে পারে, অনেকটা গর্ব করে যেন সেটুকুই জানিয়েছিল।

রাণাদিল সেই প্রথম দিনটিতে দুরু দুরু বুকে পাওয়ার আনন্দ ভরা মনে পা রেখেছিল দারার প্রাসাদে। স্বপ্নের মত এক আবেশ ঘিরে রেখেছিল তার চিন্তা। ভয় ছিল, এই বুঝি তার ঘুম ভাঙবে, মিলিয়ে যাবে সব কিছু। অকল্পিত অবস্থা, অভাবিত পাওয়া স্বপ্নের জগতে যেন এনে ফেলেছিল তাকে।

নাদিরা নিজেই এগিয়ে এসেছিল। রাণাদিলের হাত দুটি ধরেছিল সে সেদিন—মুখে ছিল স্বচ্ছ হাসি—চোখে ছিল নরম আলো। মিষ্টি স্বরে বলেছিল, 'এস বহিন, আমি একা ছিলাম, দুজন হওয়াতে ভালই হ'ল। কি বল?'

রাণাদিল কি বলবে ভেবে ঠিক করে উঠতে পারে নি। চুপ করে ছিল। একটু যে লজ্জা ছিল তাও কি কেটে যাবে? এত সুখ কি তার জন্যে জমা হয়েছিল? গলার কাছে কি যেন জমাট বেঁধে ওঠে।

নাদিরা আবার হাসতে হাসতে বলেছিল, 'কি, কথা বলছ না যে? আমাকে বুঝি ভালো লাগছে না?'

রাণাদিল কোনমতে মৃদুস্বরে বলেছিল, 'না, না, ভালো লাগছে খুব।'

'সান্ত্বনা দিচ্ছ না ত? সে যাক, দেখ তুমিও বেগম, আমিও বেগম। সুতরাং আজ থেকে তুমি আমার বহিন হ'লে। কেমন?' খুশীতে আন্তরিকতা মিশিয়ে গাঢ় করে তুলেছিল নাদিরা রাণাদিলের মনকে।

নাদিরা দারাকে কত গভীর ভালোবাসে, সেটা যেন নাদিরা বেগমের স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতির মাঝে বুঝতে পেরেছিল রাণাদিল। বড় মহৎ মনে হয়েছিল নাদিরা বেগমকে।

রাণাদিল আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিয়েছিল সেই বহিন সম্পর্ক। স্বস্তিতে সহজ হয়ে উঠেছিল যেন সে। সত্যিই প্রথম সাক্ষাতেই বড় ভালো লেগেছিল কোমল প্রাণের নাদিরা বেগমকে।

নাদিরা বলেছিল, 'তুমি ত ভাল গান গাও। আমাকে কিন্তু গান শোনাতে হবে। কেউ থাকবে না, শুধু তুমি আর আমি। শোনাবে না?'

রাণাদিল নাদিরার কথায় সারা দিয়ে বলেছিল, 'নিশ্চয় শোনাব বহিন।'

নাদিরা ভালোবাসতে জানে—ভালোবাসা আদায় করে নিতেও জানে তার গুণে।

নাদিরা আবার কৌতুকভরা গলায় বলেছিল, 'ঠিক আছে, শুনব তোমার গান। খুশী করতে পারলে বুঝব তোমার কেরামতি।'

নিজের কৌতুকে নিজেই হেসে অস্থির হয়ে উঠেছিল নাদিরা বেগম। সে হাসিতে রাণাদিলও যোগ দিয়েছিল।

নাদিরা বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া যে রাণাদিলের কাছে আসে না এমন নয়। কিন্তু আজ যেন তার উদ্বেগভরা মুখ। চোখে এক বিষণ্ণতা ভরা দৃষ্টি।

নাদিরা বেগম কোমলতা দিয়ে গড়া। তার সাজান সংসারের বাইরে আর কিছু মন চায় না। গোছান সংসারে এতটুকু নড়চড় হলে সে সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠে। সে স্বভাব সম্বন্ধে রাণাদিল অবহিত। এইটুকু নিয়েই বেঁচে থাকতে চায় নাদিরা।

কিন্তু আজ এমন কি হ'ল? যত্নহীন অগোছাল চুল তার।

নাদিরা আস্তে আস্তে পালঙ্কের উপর বসে তাকিয়াটা টেনে নেয়। তারপর হাতদুটি তার উপর রেখে চিবুকটা ন্যস্ত করে শরীরটা এলিয়ে দেয়।

রাণাদিল নাদিরার কাছে এসে বসে। গায়ে হাত রেখে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে বহিন?'

নাদিরা কোন কথা বলে না।

রাণাদিল আবার প্রশ্ন করল, 'কি, কথা বলছ না কেন? কি হয়েছে?'

নাদিরা থরথর দৃষ্টি মেলে কাঁপা গলায় বললে, 'আমার বড় ভয় করছে বহিন।'

নাদিরা কোন অজানা ভয়ে শঙ্কিত, সেটা রাণাদিল বুঝতে পারে না। রাণাদিল তাই আবার জানতে চেয়েছিল, 'ভয়? কিসের ভয় বহিন?'

'কেন, এই লড়াই-এর।' নাদিরা বলেছিল।

'সে ত একটু আধটু থাকবেই বহিন। তাছাড়া এ লড়াই হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না, সেটা ত তুমি জান।' রাণাদিল সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে।

'এ লড়াই ভালো লাগছে না। বড় ভয় করছে আমার।'

'শাহজাদারও ভালো লাগছে না এ লড়াই করতে বহিন।' রাণাদিল বলে।

'সুলেমানের কোন খবর পেলাম না এখনও।' এক নিঃশ্বাসে যেন আবার নাদিরা তার উদ্বেগ জানায়।

রাণাদিল বললে, 'সুলেমানের জন্য ভেব না বহিন। সে বীর— তাকে ত লড়াই করতেই হবে। দেখ, দু'একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই তার খবর পেয়ে যাবে। লড়াই বাঁধলে ওরকম গণ্ডগোল একটু আধটু হয়।'

নাদিরা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলে ওঠে, 'শুধু সুলেমানের জন্য নয়,আমার মন বলছে,এই গণ্ডগোল—না, না, আমি বলতে পারব না।'

রাণাদিল যে লড়াই পছন্দ করছে তা নয়। তবু সে নাদিরার উদ্বেগ দূর করতে বলে, 'তোমার মন সুলেমানের জন্যে অস্থির হয়ে রয়েছে বহিন।'

'হ্যা। কিন্তু জান, আজকাল আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখি প্রায়ই।' নাদিরা মৃদুস্বরে আত্মগতভাবে যেন বলে চলে, 'একটা মরুভূমির উপর দিয়ে পাল্কী চড়ে আমি যাচ্ছি। চারিদিকে ধূ-ধূ করছে শুধু বালির প্রান্তর। কোথাও জল নেই। দূরে যেন চিকচিক করছে মরুদ্যান। বাহকদের আমি এগিয়ে যেতে বললাম। কিন্তু এগিয়ে যেতেই সব যাদুর মত মিলিয়ে গেল। তারপর মুখ বাড়িয়ে বাহকদের ডাকতে গিয়ে দেখি, কেউ নেই—আমি একা। কোথায় গেল সব? হঠাৎ শুনলাম, শাহজাদা যেন আমাকে ডাকছেন কোথা থেকে। একটা মেঘের মত পাকান ধোঁয়া আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি হারিয়ে যাচ্ছি—সব অন্ধকার। বীভৎস সে অন্ধকার। কারা যেন আমাকে ডাকল। আমি হারিয়ে ফেললাম নিজেকে। একটা শূন্যতা আমাকে ভয় দেখাতে চায়। আমি—আমি—' কথা আর শেষ করতে পারে না নাদিরা বেগম। দু'হাতের মাঝে মুখটা লুকিয়ে ফেলে। সেইভাবেই অবরুদ্ধ স্বরে কিছুক্ষণ পর আবার বলল, 'ঘুম ভাঙার পরও সেই স্বপ্নের ছবিগুলো আমার বুকে যেন চেপে বসে থাকে। আমার কষ্ট হয়, ভয়ে শিউরে উঠতে থাকি। কি জানি, সেই স্বপ্নে কি এমন আছে? অকারণে আমার ভয় করে যেন। আমি—আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। সে স্বপ্ন নিজে না দেখলে অনুভব করা যায় না।'

থরথর করে কাঁপতে থাকে নাদিরা স্বপ্নের সেই দৃশ্য কল্পনা করে।

রাণাদিল আস্তে আস্তে নাদিরার অবহেলিত চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, 'স্বপ্ন ঘুম ভাঙলেই মিলিয়ে যায়। ওতে ভয় পাবার কি আছে। মন যখন অস্থির থাকে, দুশ্চিন্তা করলে ওরকম কত স্বপ্ন দেখা যায়।' তারপর একটু হেসে বললে, 'আমিই কত সময় কত কি যে দেখি তার ঠিক নেই।'

নাদিরা আস্তে আস্তে মুখ তোলে। ভেজা চোখে চেয়ে বলে, 'শুধু এই স্বপ্ন নয়, আরো একটা দুঃস্বপ্ন।'

স্বপ্নের কথা বলে যেন নিজেকে হাল্কা করে নিতে চায় নাদিরা। রাণাদিল চুপ করে শোনে।

'আমি একা দাঁড়িয়ে আছি অন্ধকার অজানা প্রান্তরের মধ্যে। ফিসফিস করে কারা যেন কথা বলছে—শিরশিরে একটা হাওয়া। আকাশটার দিকে চাইতে দেখি, সেটা যেন একটা বিরাট মুখগহ্বর হয়ে আমাকে গিলতে চাইছে। আমি দৌড়ে পালাতে যাই—পা কিন্তু চলে না। অবশ হয়ে গেছে যেন। একটা বীভৎস ঠাণ্ডা স্বর আমাকে ডাকে যেন। কে যেন ধরতে আসে আমায়। চীৎকার করতে যাই—গলার স্বর ফোটে না। তারপর হঠাৎ দেখি, আমি শূন্যে কিসে করে যেন যাচ্ছি। উপরে নীচে কোথাও কিছু নেই—সব দিকে শূন্যতা। কোথা থেকে যেন গাঢ় গরম লাল রক্ত ছিটকে এসে গায়ে লাগল? কোথা থেকে এল বুঝলাম না। রক্ত, তাজা রক্ত। শাহজাদা, সুলেমান, সিপির, জাহানজেব, আমল উন্নিসা, হঠাৎ যেন দূরে এসে দাঁড়াল। আমি ডাকলাম, কেউ শুনতেও পেল না। হঠাৎ সবাই হারিয়ে গেল। ঘুম ভাঙলেও সত্যি বলে মনে হয়। দুঃস্বপ্ন আমার মনে এঁটে বসেছে তাই। কি জানি কেন, যন্ত্রণায় কেঁদে ফেলি। একা থাকলে ভয় পাই, এই দুঃস্বপ্নের কথা মনে হলে। দুঃস্বপ্ন আমায় তাড়া করে বেড়ায়।'

নাদিরার চোখের কোণে টলটল করে ওঠে জলের ফোঁটা। রাণাদিল সহানুভূতি মাখান স্বরে বললে, 'বেশী ভেব না বহিন। সব ঠিক হয়ে যাবে। দুঃস্বপ্ন ভয়ই দেখায়।'

'কিন্তু যদি সত্যিই আমার সব কিছু হারিয়ে যায়। তাহলে আমি কি করব?' নাদিরার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে।

'কি বলছ তুমি? চুপ কর ত। ওসব ভাবনা ছাড়।' রাণাদিল বলে।

'সব হারিয়ে যাবে, আমি যে সেটা সহ্য করতে পারব না রাণাদিল। বেঁচে থেকে আমি তা সহ্য করতে পারব না। না, না, না।' কান্নায় ভেঙে পরে নাদিরা বেগম।

রাণাদিল সসব্যস্তে নাদিরাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বলে, 'বহিন, চুপ কর।'

নাদিরা রাণাদিলের দিকে অশ্রুভেজা চোখ দুটি তুলে তাকায়। থরথর করে ঠোঁট দুটি যেন আকুলতায় কাঁপে। রাণাদিলের কাঁধে মুখটা রেখে আবার বলে, 'আমার যে বড় ভয় বহিন। শাহজাদা, আমার ছেলেমেয়েরা আর তুমি। এইটুকু সাম্রাজ্যের ওপর আমার লোভ। হারাতে বড় কষ্ট যে।'

'আমারও সেই লোভ আছে বহিন।' তারপর যেন সমস্ত কিছু দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রাণাদিল বলে, 'তোমার চুল বাঁধবে না? কি রকম হয়ে আছ দেখেছ? এস, বেঁধে দি।'

'এখন থাক, পরে বাঁধব।' নাদিরা ভেজা গলায় বলে।

'তাহলে একটা গান শুনবে?'

'তোমাকে খুব বিরক্ত করলাম। তাই না বহিন?' মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে নাদিরা ভারি গলায় বললে।

'বিরক্ত তুমি মোটেই কর নি। তবে করতে।' কপট গম্ভীর গলায় রাণাদিল বললে।

নাদিরা বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে, 'কি করে?'

'যদি তুমি আমার কাছে না আসতে। যদি কোন কথাই আমাকে না বলতে।' হাল্কা গলায় বললে রাণাদিল। তারপর

বললে, 'আমি সব কিছু বুঝি বহিন। তোমার মনের কথা আমাকে বলে ভালই করেছ।'

নাদিরা নিরুত্তর থাকে।

'এবার গান শোন একটা, নতুন শিখেছি।' রাণাদিল বলে।

'গান!'

'হ্যাঁ, গান। বুঝতে পারছ না যেন।'

'গাও।'

রাণাদিল রবাবটা টেনে নিয়ে আবু সৈয়দের গানটা গাইতে শুরু করলে।

সুরের হাওয়ায় সমস্ত দুশ্চিন্তা যেন উড়িয়ে দিতে চায় রাণাদিল।

শোনাতে আর শুনতে থাকে দু'জনে। সন্ধ্যা তারাদের বাতিগুলো জ্বেলে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। ঝিকিমিকি ভরা আকাশটা সুরের তরঙ্গে নিজের মাঝে বিলীন হয়ে যায়।

সেই রাতেই দারা এলেন। নাদিরা বেগম চলে যাওয়ার অনেক পরে।

ক্লান্ত পদক্ষেপ। চিন্তার ভারে মুখটা ভারি। সর্বাঙ্গে যেন কতদিনের ক্লান্তি জমা হয়ে রয়েছে।

পালঙ্কের উপর ধীরে ধীরে শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন দারা। চোখ বুজে পড়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

রাণাদিল বিশ্রামাকাঙ্খী দারার শরীর ও মনের কথা ভেবে কিছু আর বললে না।

কিছু সময় বাদে চোখ বুজেই দারা ডাকলেন, 'রাণাদিল।'

'শাহজাদা।'

'শুনলাম, নাদিরা তোমার কাছে এসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে তোমরা কি সব কথা বলেছ?' কৌতুকের ছোঁয়া দারার গলায়।

'কার কাছে শুনলেন?' রাণাদিল পাল্টা প্রশ্ন করলে।

'চারদিকে আমার গুপ্তচর আছে তা জান না বুঝি।' দারা ক্লান্ত দুই চোখ তুলে রাণাদিলের দিকে চেয়ে পরিহাস ভরা কণ্ঠে বললেন।

'আমার ওপর নজর রাখার জন্যে গুপ্তচর রেখেছেন না কি?' চক্‌চকে চোখে পরিহাসের সঙ্গেই রাণাদিল আবার প্রশ্ন করল।

'আমার দুই বেগমেরই ওপর নজর রাখার জন্যে গুপ্তচর লাগিয়েছি।'

'কেন শাহজাদা?'

'গুপ্তচর কেন রাখে জান না? গুপ্তভাবে থেকে তোমাদের গুপ্ত গতিবিধির ওপর নজর রাখা।' হাসতে হাসতে দারা বললেন। হাসি থামিয়ে বললেন আরো, 'পিয়ারা আমায় বললে নাদিরার কথা। তারপর কি কথা হ'ল তোমাদের?'

'গুপ্তচরী আমাদের গুপ্ত কথাবার্তা গুপ্তভাবে থেকে শোনে নি? তার কাছেই শুনে নিন।' রাণাদিল মুখে হাসি মাখিয়ে বললে।

'না, সেটা ওদের বারণ। শুধু গতিবিধি নজর রাখবে, কথাবার্তা নয়। ধরা যখন পড়ে গেছ, তখন কি কথা হ'ল আমাকে বল।' মৃদু হাসতে হাসতে দারা বললেন।

রাণাদিল শায়িত দারার পাশে বসতে বসতে মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'আমাদের দুই বহিনে অনেক কথা হ'ল। আমাদের কথা আপনার শুনতে নেই।'

'তা হ'লে ত কৌতূহল বেড়ে গেল। কি এমন কথা, আমার শুনতে নেই। কি ব্যাপার? :তোমরা কি ঠিক করেছ, শাহজাদা

দারাশিকোকে আর ভাল লাগছে না।' পরিহাস তরল দারার কণ্ঠস্বর।

'তুজনের মনের খবর ত জানেন। পরীক্ষা করতে পারেন। ও সব বলে কথা বার করতে পারবেন না।' রাণাদিল বললে।

'কোথায় আর তোমাদের মনের খবর জানি বল। তাহ'লে তোমাদের কি কথাবার্তা হ'ল তা জানতাম—জিজ্ঞেস করতে হ'ত না। আর তুমি ত খুব চালাক ? আমি কথা বার করতে চাইছি, ঠিক ধরে ফেলেছ। তাহলে তোমাকে বিশ্বাস করা যায় কিনা পরখ করতে হবে।' দারা হাসতে হাসতে বললেন। ভারাক্রান্ত মনে লঘু কথার দেওয়া নেওয়া করতে ভালই লাগছিল তাঁর।

রাণাদিল এবার আন্তরিকতা সহযোগে বলে উঠল, 'দেখুন না একবার। দেখবেন, আপনার বিশ্বাস আমি হারাব না।'

দারা কিছুক্ষণ স্মিতমুখে রাণাদিলের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, 'বেশ, কিন্তু আমি তোমাদের তুই বহিনের কথাবার্তা জানতে পারলাম না।'

'উঁহু।' মাথা ঝাঁকিয়ে রাণাদিল জানালে। কানের তুলটা তার তুষ্টুমি ভরা চোখ তুটির মত আলোয় চিকচিক করে উঠল।

দারা আর কোন কথা বললেন না।

কিছুক্ষণ নীরব মুহূর্ত কাটল। আড়চোখে তু'একবার দারার মুখের দিকে দৃষ্টি হেনে রাণাদিল বললে, 'করিমউন্নিসা বেগম তুশ্চিন্তায় ভুগছে। বড় ভয়ও পেয়েছে।'

'ভয় ? কেন, কিসের ?

'বলছিল, এই গণ্ডোগোল বহিনের ভালো লাগছে না। হয় ত স্থলেমানের জন্যে তাকে ভয় আর তুশ্চিন্তা চেপে ধরেছে।' রাণাদিল জানালে।

'নাদিরা ওই স্বভাবের। কোন রকম অশান্তি তার সহ্য হয় না। তার নিজের লোক হলে তো কথাই নেই।' দারা বলে চললেন, 'বড় কোমল নাদিরার স্বভাব। তার ওপর দুঃস্বপ্ন দেখেও মনে তার ভয় ঢুকেছে। আমাকেও বলেছিল বটে।'

'বহিন স্বপ্নের কথা আমাকেও বলেছে। কিন্তু ভয় আর দুশ্চিন্তা তার মনে বাসা বেধেছে ভালভাবে, আজ তা বুঝতে পেরেছি। অনেক কষ্টে তার মনটা অন্যদিকে ফেরাতে হয়েছে।' রাণাদিল বললে।

দারা বললেন, 'স্বপ্নের কি অর্থ জানি না। হয় ত বা আছে—' কথা থামিয়ে আস্তে আস্তে ডান হাতটা তুলে রাণাদিলের গালে কোমল স্পর্শ বুলাতে বুলাতে গাঢ় স্বরে শুধালেন, 'তুমি—তোমার ভয় হয় না? আর হয় না বলেই বোধহয় তুমি একটু শক্ত থাকতে পার।'

রাণাদিল চোখ বুজে দারার হাতটা তার গালের সঙ্গে চেপে ধরে বললে, 'আমার ভয় হয় নিশ্চয়ই। শুধু প্রকাশ করতে পারি না। কিছুই ছিল না, সব কিছু পেয়েছি। ভয় হয়, যদি ঘুম ভেঙে দেখি, আমি সুখ-স্বপ্নে ডুবে ছিলাম। এ সবই শুধু স্বপ্ন।'

দারা স্মিতস্বরে বললেন, 'তুমি ত বেশ কথা বলতে পার রাণাদিল। বেশ ভাল লাগে। কিন্তু তোমাদের এত হারাবার ভয় কেন? আমি ত কোথাও আমার হারবার সম্ভাবনা দেখছি না।'

রাণাদিল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনার হারবার কথা ভাবি নি শাহজাদা। আমাদের এমনি ভয় হয়। স্বভাবও বলতে পারেন।'

দারা একটু থেমে বললেন, 'থাক এখন ও সব কথা। মনটা এমনিতেই ভারি হয়ে আছে।'

'সেই ভাল।' রাণাদিল সায় দিয়ে ওঠে দারার কথায়। একটু থেমে রাণাদিল বললে, 'শাহজাদা, এতদিন আসেন নি কেন?'

'একটু ব্যস্ত ছিলাম।' দারা জবাব দিলেন।

'ও।' কপট অভিমানে ঠোঁট দুটি ফুলে ওঠে রাণাদিলের।

দারা হয় ত রাণাদিল কিছু বলবে এই আশায় চুপ করে ছিলেন। কিন্তু কোন কথা না শুনে তার দিকে চাইলেন। রাণাদিল তার দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে রেখেছিল। দারা বুঝলেন। মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসির রেখা। রাণাদিলের পিঠে হাত রেখে শুধালেন, 'কি হ'ল, কথা বলছ না যে?'

রাণাদিল নিরুত্তর।

দারা হাত দুটি দিয়ে রাণাদিলের গলা জড়িয়ে তাকে একটু বুকের কাছে টেনে আনলেন।

রাণাদিল নিরুদ্ধশ্বাসে নিমীলিত আবেশমাখা চোখে দারার দিকে তাকাল।

দারা মৃদুস্বরে বললেন, 'অভিমান হয়েছে? সত্যিই কাজে ব্যস্ত ছিলাম।'

সোহাগীমন ওজরও শোনে না, আপত্তিও মানে না। শুধু চায় সমর্পণ। যুক্তির দুয়ারের বাইরে তার আনাগোনা।

রাণাদিল গাঢ় স্বরে বললে, 'কি এমন কাজ ছিল যে কদিন একবারও দেখতে পেলাম না?'

'এখন একটু ব্যস্ত থাকতে হয় রাণাদিল। নিজের ব্যক্তিগত কাজ ছাড়াও বর্তমান পরিস্থিতির দরুণ কি ভাবে দিন যাচ্ছে তা ত তুমি জানই।'

রাণাদিল নীরবে শোনে দারার কথা।

দারা আবার বললেন, 'আমি জানতে চেষ্টা করছিলাম, বাদশার

মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ কারা রটালো। সন্দেহ হচ্ছে কারও কারও উপরে, কিন্তু স্থির করতে পারছি না। কি করা কর্তব্য, তাও ঠিক করতে পারছি না। রোশেনারা যে আমার বিপক্ষে সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু—'

অন্তরঙ্গ পরিবেশের মাঝে যেন বাইরের আবহাওয়াটা ছেদ আনছে বলে মনে হল রাণাদিলের। সে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ও সব কথা এখন থাক শাহজাদা।'

'আচ্ছা বেশ। কিন্তু তুমিই ত জানতে চেয়েছিলে।' দারা মৃদু হেসে বললেন। তারপর রাণাদিলের চোখের সাথে দৃষ্টি মিশিয়ে নীচুস্বরে ডাকলেন, 'রাণাদিল।'

রাণাদিল সেই দৃষ্টির ছোঁয়ায় সলজ্জে চোখ বুজে সেই ধরা পড়া অবস্থাতে সাড়া দিলে, 'শাহজাদা।'

'তোমার আমাকে রোজ দেখতে ইচ্ছে করে, তাই না?' গাঢ় মৃদুস্বরে শুধান দারা।

'জানি না।' রাঙা মুখে পাতলা লাল ঠোঁট দুটি না নড়েই যেন জবাব দিল।

'তাহ'লে তুমি আমাকে ভালবাস না?'

রাণাদিল দারার বুকের মধ্যে মুখটা লুকিয়ে জানাল, 'না।'

'একটা গান শোনাবে?'

আবার মাথা নেড়ে নীরবে জবাব আসে, 'না।'

'তাহলে আমি যাই।'

সেই একই নীরব উত্তর। বুকের মাঝে মুখ লুকিয়ে রেখে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ—'না।'

ধূপের গন্ধে, চুলের সুবাসে মুখ লুকিয়ে থাকা রাণাদিল। বুকের মাঝে আবেগের দাপাদাপি। দারার যেন সব কথা হারিয়ে

যায় রাণাদিলের কাছে প্রতি মুহূর্তে। শুধু একটা কথাই ঘুরে ফিরে বারে বারে বলেছেন, আজও অস্ফুট স্বরে বললেন, 'তুমি বড় সুন্দর রাণাদিল।'

সাত

আলোচনার আসর বসেছে আমিন খাঁর আবাসে। মীর জুমলার পুত্র আমিন খাঁ। শায়েস্তা খাঁ, ওমরাহ আবুল ফজল, আর আমিন খাঁ—এরা তিনজনই বিশিষ্ট ব্যক্তি।

শাহজাদা দারা সন্দেহ করেছিলেন এদের ওপর, কিন্তু ধরতে পারেন নি নিশ্চিতভাবে। কিন্তু সে কথা থাক।

লোকচক্ষুতে সৌজন্যমূলক নিমন্ত্রণ। সুতরাং সেই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা।

কারণ হিসেবে এই বক্তব্য খাড়া করে জমায়েত হয়েছিল তারা তিনজন আমিন খাঁর বাসভবনে। একসময়ে এল সিরাজী ভরা পাত্র। সরে গেল অযাচিত পাত্র পাত্রীরা।

শায়েস্তা খাঁ একটা সিরাজীর পাত্র টেনে নিয়ে এক চুমুক দিয়ে পরিতৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললে। আমিন খাঁকে বললে, 'একটা খবর আছে আমিন খাঁ। ঔরঙ্গজেব আগ্রার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বাদশাহের কাছে সে খবর গেছিল নিশ্চয়ই। বাদশা ফজিল খাঁকে দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন। বলে পাঠিয়েছেন, ঔরঙ্গজেব যেন তার সুবায় আবার ফিরে যায়। কারণ, তিনি এখনও জীবিত।'

শায়েস্তা খাঁ বাদশাহের পরিবারের লোক। সম্পর্কে স্বর্গতা মমতাজের ভাই। সুতরাং তার দেওয়া খবর বিশ্বাসযোগ্য।

আমিন খাঁ বললেন, 'খবরটা এনেছে কে ?

'তা জানি না। তবে দানিশমন্দ বাদশাকে জানিয়েছেন এইটুকু জানি। তারই ফলে ফজিল খাঁর এই দৌত্য।' শায়েস্তা খাঁ বললেন।

আমিন খাঁ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, 'তাহলে ফজিল খাঁর খবরে শাহজাদা ঔরঙ্গজেব কি করবেন ?'

'বলতে পারছি না।' শায়েস্তা খাঁ জবাব দিল চিন্তিত স্বরে।

এবার ওমরাহ আবুল ফজল বলে উঠল, 'কিন্তু শাহজাদা ঔরঙ্গজেব যদি পিছিয়ে যান, তাহ'লে শাহজাদা দারাকে হটাবার মত লোক দেখছি না।'

শায়েস্তা খাঁ সিরাজীর পাত্রটা শেষ করে নামিয়ে রেখে বললে, সে যাই হোক, বর্তমানে আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। ঔরঙ্গজেব কি করে, সেটা দেখতে হবে।' একটু থেমে বললে, 'আমরা যা চাইছি, দারার কর্তৃত্বের অবসান। ঔরঙ্গজেবই সেটা করতে পারে।'

রোষভরা কণ্ঠে যেন সঞ্চিত ক্ষোভ নিয়ে আবুল ফজল বললে, 'শুধু তাই ? বৃদ্ধ শাহানশার দুর্বলতা আর পক্ষপাতের সুযোগ নিয়ে শাহজাদা দারা ওমরাহদের কাউকে যেন তোয়াক্কা করে না—অপমান করছে সবাইকে। অনেক অপমান সহ্য করেছি, আর নয়। এই সুযোগ কাজে লাগাতেই হবে।'

শায়েস্তা খাঁ মুখে একটা বক্র হাসি টেনে বললে, 'সব ঠিক হয়ে যাবে আবুল ফজল।'

'শুধু কি তাই। দারা উজীর শাদাউল্লা খাঁর মত লোককে হত্যা করেছে। তাঁর মত মানুষ কটা মেলে।' আবুল ফজল একই স্বরে বললে আবার।

শায়েস্তা খাঁ হাতটা নেড়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে বললে, 'হবে। সমস্ত কিছু ঠিক হবে, বললাম ত। আমরা কিছু একটা ঘটবে এই আশা নিয়েই ত শাহজাদাদের কাছে বাদশার মিথ্যা মৃত্যু সংবাদ জানিয়েছিলাম। তার ফল ত শুরু হয়েছে, আমরা দেখতেই পাচ্ছি।'

আমিন খাঁ বললে, 'শাহজাদা ঔরঙ্গজেবই এখন ভরসা। শাহজাদা সুজার কাছে কিছু আশা করা যায় না।'

'শাহজাদা সুজা স্বভাব দোষে ভিজে নষ্ট হয়ে যাওয়া বারুদ— ক্ষমতাশূন্য তিনি। তাঁর কাছে সত্যিই আশা করা যায় না কিছু।' সায় দিয়ে আবুল ফজল বললে।

'ও সব কথা থাক এখন। শাহজাদী রোশেনারাও ঔরঙ্গজেবের দলে। অবশ্য সে কথা সকলেই বুঝতে পারে, সে একটু সোচ্চার বলে। সুতরাং রোশেনারার ওপর নজর থাকবে। বিশেষ ভিতরের খবর কিছু আমরা পাব না। যদিও রোশেনারা বলেছে, সে যতটুকু সম্ভব ঔরঙ্গজেবের কাজে লাগবে।' শায়েস্তা খাঁ দাড়িটাতে হাত বুলাতে বুলাতে বললে।

আমিন খাঁ বললে, 'যদি দারা জিতে যান। আর আমাদের ধরে ফেলেন।'

শায়েস্তা খাঁ একটু গলার স্বর তুলে বললে, 'সে পরিস্থিতি এখনও আসে নি আমিন খাঁ। আর দারা অতখানি বুদ্ধিমান নয়। সে পরিস্থিতি আগে আসুক, তার পর ভাবা যাবে। তোমাদের মত আমিও আশা করছি, ঔরঙ্গজেব মসনদে বসবে। সে থাকলে আরও একটা কাজ হবে, ইসলাম রক্ষা পাবে। নইলে ইসলামের অঙ্গহানি হবে। এ বিষয়ে আমাকে কথা বলতে দেখে দারা বলেছিল, আমি নাকি গোঁড়া মুসলমান। অত গোঁড়ামী সে পছন্দ করে না।'

নিজের বিরক্তিতে ফুৎকার দিয়ে কথা শেষ করল শায়েস্তা খাঁ। আরো বললে, 'আর দারা যদি সত্যিই মসনদে বসে, তবে—' হাত নেড়ে এমন একটা ভঙ্গী করে শায়েস্তা খাঁ, যেন সমস্ত অর্থ সেই ভঙ্গীমায় পরিস্ফুট।

'যে করেই হোক, সেটা যাতে না হয়, সেই চেষ্টাই করতে হবে। এই সুযোগ—সুলেমান নেই, দায়ুদ খাঁ নেই। রাজধানীতে সৈন্যও নেই বেশী। এই খবরটা জানিয়ে দিতে হবে শাহজাদা ঔরঙ্গজেবকে।' আমিন খাঁ বললে।

'নিশ্চয়ই।' শায়েস্তা খাঁ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলেন।

আমিন খাঁ বললে, 'ভয় আমারই সবচেয়ে বেশী।'

'হ্যাঁ। তোমাদের পরিবারের সকলেই দারার মুঠোর মধ্যে। যদি দারা আঁচ পায়, তাহলে খারাপ হবে সেটা ঠিক। সে যাই হোক, আমাদের সাবধানে থাকতে হবে। দেখা সাক্ষাৎ খুব দরকার না হলে না করলেই ভাল। নতুন কোনো পরিস্থিতি দেখা দিলেই—যে কেউ দেখুক না কেন, জানাবে। তখন আমরা জড় হব আবার। কেমন?' শায়েস্তা খাঁ নেতৃত্বের সুরে বললে।

'বেশ।' আবুল ফজল সম্মতি জানালে।

'তাহলে এ প্রসঙ্গ থাক এখন। আমিন, মাহিফিলের আয়োজন করেছ, তাহলে আর দেরী করছ কেন!' শায়েস্তা খাঁ বলে।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' আমিন খাঁ বলে।

'তাহ'লে সুন্দরীদের ডাক। আবহাওয়াটাও স্বাভাবিক মনে হবে। তা ছাড়া জীবনে ত আমোদ প্রমোদেরও প্রয়োজন আছে।' সজোরে হেসে ওঠে শায়েস্তা খাঁ। সিরাজীর পাত্রটা কানায় কানায় ভরে নেয় সে।

আমিন খাঁর ইঙ্গিতে শুরু হ'ল নাচ আর গান। সিরাজীর

বান বইতে লাগল। রঙীন চোখ আরো রঙিন মনে হতে লাগল নর্তকীদের। হাস্যে লাস্যে মুখর হ'ল আমিন খাঁর আবাস।

কোন পথচারী যদি মুখ তুলে চেয়ে দেখে, ভাববে, বেশ একটা মজলিস চলছে।

বেনারসের কাছেই বাহাদুর গড়। ভোরের আলো সুলেমান শিকোর দলের অনায়াস সাফল্যের আলো এনে দিল।

বুদ্ধিটা অবশ্য অম্বররাজ জয়সিংয়ের মাথা থেকেই এসেছিল। অবস্থা বিচার করে করণীয় সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য পেশ করেছিলেন তিনি।

বাহাদুর গড়ে সুলেমান শিকোর দল প্রতিপক্ষ শাহজাদা সুজার বাহিনীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তখন গভীর রাত্রি।

ওদিকের তাঁবু থেকে হৈচৈ আর নিশীথের হাওয়ায় ভেসে আসা মত্ত হাসি সুলেমান শিকোদের কানে এসে পৌঁছতে লাগল। নেশা ভরা জড়িত কণ্ঠস্বর আরও যেন জড়িয়ে যাচ্ছিল হাওয়াটায়। যেন উৎসব বসেছে ওদিকে—শাহজাদা সুজার সীমানায়।

দূরে অন্ধকারে শুধু জ্বলে থাকা আলোর নিশান অবস্থিতি জানাচ্ছিল প্রতিপক্ষের।

সুলেমানের তাঁবুতে বসল বৈঠক, যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য।

রাজা জয়সিং সিদ্ধান্ত জানালেন, 'আমার মতে দেরী না করে সুর্যোদয়ের আগেই আমরা আক্রমণ করব। কারণ শাহজাদা সুজার বাহিনী দীর্ঘ পথের শ্রমে ক্লান্ত। তাছাড়া কান পেতে শুনুন একটু।

সকলে নিঃশব্দ রাত্রির মাঝে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলে।

'কি শুনতে পেলেন?' জয়সিং প্রশ্ন করলেন।

'হৈ চৈ শুনছি।' দাউদ খাঁ জবাব দিল।

'হ্যাঁ, মত্ত হৈ চৈ। নেশা করে হল্লা করছে মনের আনন্দে।' জয়সিং বললে।

সুলেমান বললে, 'বুঝেছি, আপনি কি বলতে চাইছেন রাজা জয়সিং। আমাদের প্রতিপক্ষ ক্লান্ত এবং নেশায় মত্ত। সুতরাং—'

সত্যি, শাহজাদা সুজার বাহিনী দীর্ঘ পথযাত্রায় ক্লান্ত, তা সত্ত্বেও তারা আগামী দিনের গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের গোলাপী নেশার মাঝে ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের শ্রান্ত শরীর ক্রমে ঢুলে পড়ল গভীর ঘুমে।

এই সুযোগ কাজে লেগে গেল। ভোরের আলো ফোটার আগেই সুলেমান শিকোর বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল তন্দ্রামগ্ন অসতর্ক প্রতিপক্ষের উপর।

শাহজাদা সুজার বাহিনীর যে কয়জন সিরাজীতে গা ভাসায় নি, তারা প্রথমে একটু বিহ্বল হয়ে পড়ল। কিন্তু ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই আক্রমণে তারা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল। বাকী সকলে চোখ কচলে ব্যাপারটা অনুধাবন করে কোন রকমে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে।

কিন্তু বিপর্যস্ত, পর্যুদস্ত হয়ে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সেই তড়িত অতর্কিত আক্রমণে। বলতে গেলে লড়াই আর কি হ'ল।

আঁধার সরিয়ে রাঙা সূর্য ওঠার সাথে সাথে উঠল সুলেমন শিকোর দলের বিজয় নিশান।

শাহজাদা সুজা বাহাদুর গড়ের যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেলেন।

সুলেমানও প্রস্তুত হ'ল, শাহজাদা সুজার পিছনে ধাওয়া করে যেতে।

দাউদ খাঁ বললে, 'এবার আগ্রা ফিরে চলুন। আমরা বিজয়ী দল নিয়ে আগ্রায় এই সংবাদ পৌঁছে দি।'

কিন্তু সুলেমান একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'না, ধাওয়া করে যেতে হবে। ওদের একটু শিক্ষা দিতে হবে।'

'কিন্তু কি লাভ হবে? শাহজাদা সুজাকে আমরা ত পরাস্ত করেছি।'

'তবু যেতে হবে।'

এ কথা পরিষ্কারভাবেই সুলেমান বুঝেছিল, এ যুদ্ধ বাদশা শাজাহানের বিরুদ্ধে হয় নি, হয়েছে শাহজাদা দারাশিকোর বিরুদ্ধে। সুতরাং এ জ্বালার মাঝে তারও অংশ আছে।

বিজয় বাহিনী নিয়ে শাহজাদা সুজার পিছনে ছুটে চলল সুলেমান শিকো। আর দুজন সেনা মারফৎ বিজয় সংবাদ আগ্রায় পৌঁছে দিল।

আগ্রার উপর সন্ধ্যা তখন নিপুনভাবে রাত্রির রূপসজ্জা গ্রহণ করছে ধীরে ধীরে। ঝিরঝির করে মৃদুল হাওয়া বইছিল সেই সময়। চাঁদের মাথা ক্রমশঃ উজিয়ে উঠে মলিন আকাশটাকে মিঠে আলোর ধারায় যেন মেজে ঘষে পরিষ্কার করে তুলছিল। একটু ঠাণ্ডার আমেজ লাগান আবহাওয়া।

শাহজাদা দারাশিকো মন্থরগতিতে তাঁর ঘোড়া পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অল্প পিছনে, যেন দেহরক্ষীর মত সেনাধ্যক্ষ গুলমহম্মদ তাকে অনুসরণ করে চলেছে। নীরব পথপরিক্রমায় শুধু খুড়ের শব্দ উঠে মিলিয়ে যাচ্ছিল। দারার দিকে একবার দেখে নিয়ে চতুর্দ্দিকে আরেকবার দেখে নেয় গুলমহম্মদ।

গুলমহম্মদ একদিনের সামান্ত সৈনিক থেকে উন্নতির ধাপে উঠে অন্যতম সেনাধ্যক্ষ আজ।

শাহজাদা দারাশিকোকে গুলমহম্মদ ভালোবেসেছিল। শাহজাদা অনেক কথা বলেছেন, গুলমহম্মদ শুনেছে। অনেক কথার অর্থ সে বোঝে নি, কিন্তু সে কথার গুরুত্ব সে অনুভব করেছে। তার থেকে বড় কথা, গুলমহম্মদ দারার মহত্ত্বে মুগ্ধ। মানুষটাকে ভালোবেসে ফেলেছে গুলমহম্মদ। নীরবে সে অনুসরণ করেছে দারাকে মনে প্রাণে।

দারাও এই প্রায় নির্বাক লোকটার উপস্থিতি অনুভব করতে পারেন। অনুভব করেন, গুলমহম্মদের তাঁকে আগলে রাখা দৃষ্টির প্রলেপ।

দারার পিছনে গুলমহম্মদ সজাগ দৃষ্টি মেলে এগোতে থাকে। বলা যায় না, কখন কি হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সে এই ভার তুলে নিয়েছে।

বিশৃঙ্খল আগ্রা শহরে বিপর্যস্ত শহরবাসীর জীবন। কচ্চিৎ কখনও এক-আধ জন লোক দেখা যায়। প্রাণস্পন্দনহীন বলে মনে হয়। নিস্তব্ধ পথে খুড়ের আওয়াজ তুলে এগিয়ে চলে তুই আরোহী।

চিন্তামগ্ন দারার দিকে আরেকবার তাকালে গুলমহম্মদ। দারা কি ভাবছেন তা ঠিক আন্দাজ করতে পারে না সে।

ফকির সারমাদ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর মন্থর গতিতে অগ্রসর হন তাঁরা।

গুলমহম্মদ নিজের মনে শাহজাদার সঙ্গে ফকির সাহেবের তু'একটা কথা নাড়াচাড়া করছিল। ভাববার চেষ্টা করছিল সে কথার গুরুত্ব।

ফকির সাহেব বলেছিলেন যে, আমরা তুটো ফাঁদে আটকা পড়ে আছি, এক হিন্দু—আরেক মুসলমান।

দারা বলেছিলেন, 'সে কথা ঠিক। আল্লার দোয়া যেমন আমরা চাইছি, তেমনি তারাও চাইছে ভগবানের দয়া। কিন্তু বাহ্যিক অনুশাসন গুলি বেঁধে রেখে দিয়েছে সমস্ত বুদ্ধির বিকাশ, বৃত্তির প্রসারকে। সেটাই আমার অপচ্ছন্দ।'

'হ্যাঁ, মনের প্রসার না বাড়লে সব কিছুই সার্থকহীন। আমি কেন এই বক্তব্য নিয়ে কথা বলছি, সেটা যদি না বুঝি, অন্যের যুক্তি যদি না বুঝি, অন্যের ভাল যদি গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে—' ফকির সাহেব আরো বলেছিলেন।

শাহজাদা দারা বলেছিলেন, 'সেই জন্যই ত আমি চাই নতুন একটা পথ বার করতে, যার উপর দাঁড়িয়ে নিজেদের এই লড়াই বন্ধ হবে। সাধারণ বলেই যে তার জ্ঞান বাড়বে না, সে ভাবেই বা নিশ্চিন্ত থাকব কেন? জ্ঞানই ত সব।'

গুলমহম্মদ শুনে যাচ্ছিল এক মনে। অর্থ করার চেষ্টা করছিল। ভালো লাগছিল শুনতে।

শাহজাদা আরও বলেছিলেন, 'জ্ঞান না বাড়লে গোঁড়ামী আসে। আর গোঁড়ামী দিয়ে ধর্মমত রক্ষা হয়—পথ পাওয়া যায় না।'

গুলমহম্মদ দূরাগত ঘোড়ার খুঁড়ের আওয়াজে সজাগ হয়ে ওঠে। তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে কারা দুজন যেন। আলো ছায়ার মাঝে চেহারা তাদের অস্পষ্ট ছায়া মাত্র।

দারার কানেও সে শব্দ ভেসে আসছিল। তিনি মুখ তুলে চাইলেন। অনুসন্ধিৎসু দুই চোখ দিয়ে ছায়া দুটির কায়ার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে গুলমহম্মদকে প্রশ্ন করলেন, 'কারা আসছে বল ত?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না শাহজাদা। আপনি এখানে অপেক্ষা

করুন, আমি দেখছি।' বলে তরবারি খুলে নিয়ে এগিয়ে গেল গুলমহম্মদ সেই দ্রুত এগিয়ে আসা অশ্বারোহী দুজনের দিকে।

গুলমহম্মদ তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালে, কি কথাবার্তা যেন হল তাদের সঙ্গে।

গুলমহম্মদ অশ্বারোহী দুজনকে নিয়ে দারার কাছে এগিয়ে এল। কাছাকাছি আসতে দুজনকে দারা ভালো করে দেখলেন, তারা দুজনই সিপাহী।

তারা ঘোড়া থেকে নেমে কুর্নিশ করে সম্মুখে দাঁড়ালে।

দারা প্রশ্ন করলেন, 'এরা কারা গুলমহম্মদ।'

'এরা আমাদেরই সিপাহী। শাহজাদা সুজার সঙ্গে মোকাবিলার জন্যে আমাদের হয়ে এরা গেছিল।' গুলমহম্মদ সসম্ভ্রমে জানালে।

দারার স্নায়ু যেন একটু উত্তেজিত হয়ে ওঠে। উদ্গ্রীব হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কি খবর এনেছ তোমরা? কোন দুঃসংবাদ আছে কি?'

'না, শাহজাদা। বাহাদুর গড়ে আমাদের সঙ্গে লড়াই-এ শাহজাদা সুজা পরাজিত হয়েছেন এবং পালিয়ে গেছেন তারপরই।' সিপাহী দুজনের একজন জানালে।

'সাবাস।' জয়ের খবরে দারার মন খুশীতে দুলে ওঠে। একটু সামলে নিয়ে জানতে চাইলেন, 'তাহলে সুলেমানরা কি ফিরে আসছে?'

'না শাহজাদা। তিনি অন্যান্যদের নিয়ে শাহজাদা সুজার পেছনে ধাওয়া করেছেন।' আরেকজন সিপাহী জানায়।

'জিত হয়েছে—সুজা যখন হেরেই গেছে কি দরকার ছিল।' আত্মগত ভাবেই যেন দারা বললেন। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, এবার যাও, ওমরাহ দানিশমন্দকে খবরটা দিয়ে দাও। দরবারের লোকজন যাদের পাবে খবরটা জানিয়ে দেবে।'

'যো হুকুম' কুর্নিশ করে তারা ঘোড়ার পিঠে উঠে চলে যায়।

দারা বললেন, 'গুলমহম্মদ তাড়াতাড়ি চল। নাদিরাকে খবরটা দিতে হবে। সে বড় দুশ্চিন্তায় আছে। মহলের সবাইকে খবরটা জানিয়ে দিতে হবে। আগে চল, বাদশাকে খবরটা জানাই।'

বলগার ইঙ্গিতে ঘোড়া ছুটে চলে দ্রুত, মনের খুশীর হাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে।

গুলমহম্মদ নীরবে দারার অনুসরণ করল।

শাজাহান শুনলেন বিজয় সংবাদ। নিঃশব্দ একটা হাসি মুখে নিয়ে বললেন, 'সুলেমান তাহলে সুজাকে ধাওয়া করেছে?'

'হ্যাঁ বাদশা।' দারা বললেন।

'বেশ।'

'কিন্তু তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাকে দমন করা দরকার ছিল, সেটাই যখন হয়ে গেছে—'

দারার কথায় বাধা দিয়ে শাজাহান বলে উঠলেন, 'প্রয়োজন আছে দারা। সুলেমান ঠিকই করেছে।'

জাহানারা বললেন, 'হ্যাঁ, তাকে বন্দী করে সাজা দেওয়া উচিত। শত্রুতা করলে তাই নিয়ম।'

'কিন্তু—' মনের মধ্যে ক্ষোভ নেই দারার। যতটুকু দরকার মিটে গেছে বলেই মনে করছেন তিনি।

জাহানারা বেগম দারার মনের কথা যেন বুঝতে পেরে বললেন, 'কোন কিন্তু নেই। এই নিয়ম—আমিও তাই চাই।'

শাজাহান এবার বলে উঠলেন, 'ওসব কথা এখন থাক। দুশ্চিন্তাটা কমল একদিক থেকে। সুলেমান নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিতে পারবে। তুমি তোমার মহলে খবরটা দিয়েছ?'

'না, এবার দেব।'

'যাও। নাদিরা বোধহয় এই খবরের জন্য অপেক্ষা করে আছে। রাণাদিলও এ খবর শুনে খুব খুশী হবে।' শাজাহান বললেন।

'হ্যাঁ, খবরটা দাও। আমি রোশেনারাকে খবরটা জানিয়ে দেব। সেও বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।' ব্যঙ্গের সুরে জাহানারা বললেন।

দারা আর কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তার প্রাসাদের দিকে।

দারার বুকে মাথা রেখে নাদিরা শান্তভাবে শুনল সব। চোখে বিষণ্ণতা কেটে গিয়ে ফুটে উঠল স্বস্তির আলো।

দারা গাঢ় গলায় তার কানের কাছে মুখ রেখে আস্তে আস্তে বললেন, 'কি, এবার খুশী ত? সুলেমানের খবর পেলে—সব চিন্তার শেষ, দুঃস্বপ্নেরও শেষ।'

নাদিরা একই ভাবে দারার বুকে মাথা রেখে ধরা গলায় বললে, 'শুধু কি আমার ছেলেমেয়েদের কথা ভাবি। আপনার জন্যেও ভাবনা হয় যে।'

'ভাল, তবু আমার জন্য ভাব জানতে পারলাম। আমি ত ভাবছিলাম, আমাকে ছাড়া সবার জন্যেই তোমার ভাবনা হয়।' পরিহাস তরল কণ্ঠে দারা বললেন।

'না শাহজাদা। আপনার জন্যে চিন্তাই সবচেয়ে বেশী।' নাদিরা একটু দারাকে আকড়ে ধরে।

দারা নাদিরার মাথায় হাত রেখে বললেন, 'সে আমি জানি নাদিরা। তোমাকে পেয়েছি—নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হয়। হয় ত সে রকম মূল্যও আমি তোমায় দিতে পারি না।'

'ও কথা বলবেন না শাহজাদা।' দারার মুখের উপর হাতটা চেপে ধরে টলটলে চোখ দুটি তুলে নাদিরা বললে, 'আপনাকে ত জানি। আপনার পাশে থেকে যদি কোন সাহায্যে আসি, সেইটাই আমার কাম্য। আমারই ভাবনা হয়, হয়ত আপনার মত মানুষের মর্যাদা আমি দিতে পারি না। আমার বুদ্ধি দিয়ে আপনাকে কোন সাহায্যই করতে পারি না।'

দারা কিছুক্ষণ নাদিরার দিকে চেয়ে রইলেন। তার মুখের উপরে রাখা নাদিরার হাতটা নিজের মুটিতে ধরে ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি আমাকে কতটা সাহায্য কর, তা তুমি জান না। তোমার ভালোবাসায় মনটা আমার ভরিয়ে রাখ যে।'

'কি জানি শাহজাদা। বুঝতে পারি না।'

নাদিরা চোখ বুজে শুয়ে থাকে দারার বাহু বন্ধনে।

কিছুক্ষণ যায় নিস্তব্ধতার মাঝে গভীর অন্তরঙ্গতার পরশ নিয়ে।

দারা প্রথম মৃদু স্বরে কথা বললেন, 'নাদিরা।'

সোহাগে ভরা স্বরে নাদিরা বললে, 'বলুন শাহজাদা।'

'তোমার বহিনকে এ খবরটা জানিয়ে আসি, কেমন?' দারা বললেন।

নাদিরা আস্তে আস্তে চোখ খুলে মাথাটা তোলে। বললে, 'হ্যাঁ শাহজাদা। সেও ত সুসংবাদের আশায় বসে আছে।'

'তবে যাই।' অনুমতি চাইলেন দারা প্রীতিভরা স্বরে।

'হ্যাঁ।' নাদিরা আস্তে আস্তে উঠে বসে একটা শ্বাস জোড়ে টেনে নিয়ে ছাড়তে ছাড়তে বললে।

নাদিরার উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে ওর ঠোঁটে নিজের ঠোঁটের মৃদু পরশ বুলিয়ে দারা বললেন, 'একটু মনে কষ্ট দিলাম, তাই না?'

নাদিরা মৃদু হেসে বললে, 'কষ্ট? কই না। আর আমরা যে দু বহিন সে কথা কি ভুলে গেলেন?'

'না ভুলি নি। তোমাকে দেখলে ভুলতে পারি না।' দারা গাঢ় স্বরে বললেন।

তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন দারা। একটু এগিয়ে আবার কাছে এসে নাদিরার মুখটা তুলে ধরে বললেন, 'তুমি—তুমি বড় ভাল, নাদিরা।'

নাদিরা চোখ বুজে ফেলে, কেন কে জানে।

দারা চলে যান। নাদিরা তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে থাকে।

দারা রাণাদিলের ঘরের পর্দা তুলে ঘরের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। মুখ ভরা হাসি নিয়ে বললেন, 'একটা সুখবর আছে রাণাদিল।'

'কি?' উদগ্রীব হয়ে ওঠে রাণাদিল।

'সুজা বাহাদুর গড়ে পরাজিত হয়েছে।'

রাণাদিল উচ্ছসিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'শাহজাদাকে কি বন্দী করা হয়েছে? সুলেমান ফিরেছে?'

'না, শাহজাদা সুজা বন্দী হয় নি। সে পলাতক। সুলেমানও ফেরে নি।' হাসি মুখে দারা জবাব দিলেন, 'সুজার পিছন পিছন সুলেমান তাড়া করে গেছে।'

'আমি জানতাম, জয় আপনার হবেই।' রাণাদিল বললে।

'দুশ্চিন্তা গেল ত?'

'হ্যাঁ। আর ভাবতে হবে না।'

'আমার যে আজ কি আনন্দ হচ্ছে বোঝাতে পারব না রাণাদিল।' দারা এগিয়ে এসে তাঁর অভ্যাসমত পালঙ্কের উপর বসেন।

'আমারও হচ্ছে। বহিনকে খবরটা দিয়েছেন ত?' রাণাদিল জানতে চাইলে।

'হ্যাঁ।' তারপর একটু চুপ করে থেকে কি ভেবে নিয়ে উজ্জ্বল চোখ দুটি তুলে বললেন, 'আচ্ছা রাণাদিল, তুমি আমাকে খুব ভালবাস, তাই না?'

'পরীক্ষা করবেন নাকি শাহজাদা?' রাণাদিল হাসতে হাসতে পাল্টা প্রশ্ন করলে।

দারা বললেন, 'আচ্ছা ধর, যদি আজ আমি আবার অন্য কারও প্রতি ঝুঁকে পড়ি। পারবে আমাকে তার কাছে ছেড়ে দিতে?'

'কষ্ট হবে। যদি বুঝতে পারি—' রাণাদিল একটু চুপ করে থেকে জবাব দিল।

রাণাদিলের অসম্পূর্ণ কথার রেশ ধরে দারা বললেন, 'যদি বুঝতে পারি কি, বল?'

'যদি বুঝতে পারি যে সে আমার থেকেও বেশী আপনাকে ভালোবাসে। যেমন বহিন আপনাকে ভালোবাসে—আমি হয় ত পারি না। সেই জন্যই ত বহিনের কাছে আপনাকে রাখতে এতটুকুও দুঃখ হয় না।' রাণাদিল গম্ভীর গলায় কথাগুলি বললে।

দারা স্মিতহাসি হেসে বললেন, 'তাহলে ছেড়ে দিতে পারবে না বোঝা গেল। কারণ, তোমাদের মত আমাকে কেউ ভালোবাসতে পারবে না।' একটু থেমে বললেন, 'তোমরা দুজন ভয়ানক চালাক। দুজনে ছেড়ে দিয়ে আবার বাঁধ। একটু দূরে গেলেই বুঝতে পারি, বাঁধনের টান পিছন থেকে টানছে।'

রাণাদিল নত চক্ষু হয়ে চুপ করে থেকে জবাব দিল, 'আমি আপনার উপযুক্ত নই শাহজাদা।'

দারা উঠে গিয়ে রাণাদিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। নত মুখ

দুহাতে নিয়ে বললেন, 'ওসব কথা বল না রাণাদিল। তোমাকে ভালোবাসি আমি—অন্য কিছুকে নয়।' তারপর একটু পরিহাসের স্বরে বলে উঠলেন, 'আর তোমার গান আর নাচকেও ভালোবাসি। এ দুটোই ত তোমায় ভালবাসতে বললে।'

রাণাদিলের দুটি গভীর চোখ ভ্রমরের কৃষ্ণতা, আর চকচকে উজ্জ্বলতা নিয়ে চেয়ে থাকে দারার চক্ষু দুটির দিকে।

দারা চেয়ে থাকেন। আরও যেন মথিত হয়ে ওঠে তাঁর বুকের মাঝে। দুহাতের মাঝে সেই সুডৌল মুখটি আরো কাছে এনে অস্ফুট স্বরে বললেন, 'তুমি—তুমি বড় সুন্দর রাণাদিল।

সেই এক কথা। বহুবার শোনা। তবু বুকে যেন থরথর বিহ্বলতা এনে দেয় রাণাদিলের। কোন কথা মুখে জোগায় না। পৃথিবীর সমস্ত সুখকর রোমাঞ্চ যেন মিশে থাকে শিরার মাঝে। মুখ হয় মূক।

'রাণাদিল, তুমি আমাকে কতখানি ভালোবাস?' অবুঝভাব যেন পরিমাপ করতে চায় অসম্ভাব্যতা না মেনে।

'আমি জানি না, জানি না—' ভাঙা গলায় রাণাদিল বলে। আর কিছু যেন মনে আসে না। সব তলিয়ে যায় যেন একটা ঢেউয়ের তলায়।

দারার গাঢ় প্রীতির উপহার গ্রহণ করে রাণাদিল নিঃশব্দে। দোদুল বুকে চুপ থাকে দুটি মন।

নিস্তব্ধ রাত্রির মাঝে জোৎস্না দিয়ে প্রকৃতি নিজেকে সাজিয়েছে —যেন নিজের মনেই সে উল্লসিত।

নিস্তব্ধ রাত্রি—নীরব দুটি প্রাণ। নিস্তব্ধ ঘুমন্ত পৃথিবী—সরব দুটি আকুল মন। নিস্তব্ধ শান্তিভরা আকাশ—তরঙ্গিত হিয়া নিয়ে প্রতিশ্রুতি জানায় দুটি প্রাণী।

চুপ করে সময় কাটে সোহাগ বিহ্বল দারাশিকো আর রাণাদিলের।

'শাহজাদা।'

'বল।'

'আর কিছু বলবেন না।'

'না। একটা গান শোনাও রাণাদিল।'

'উঁহু, গান গাইতে আজ ইচ্ছে করছে না।' আদরভরা গলা রাণাদিলের।

'কেন?'

'এইত বেশ ভাল।'

'হুঁ। তুমি আজকাল বড় ফাঁকি দিচ্ছ।' দারা হাসির সঙ্গে বললেন, 'না গাও। অনেকদিন তোমার গান শুনি নি।'

'কি গাইব?' রাণাদিল আদুরে গলায় প্রশ্ন করে।

'যা খুশী।' দারা রাণাদিলকে আস্তে আস্তে মুক্ত করে দেন।

রাণাদিল ধীরে ধীরে গিয়ে জাজিমের উপর বসে রবাবটা কোলের উপর টেনে নিয়ে ভাবতে থাকে, কি গাইবে? কোন সুরের জানে এ ভরা হৃদয়ের কথা রাখা যায়?

দারা পালঙ্কের উপর গা এলিয়ে দিয়ে একটা তুষ্টির আওয়াজ করে বললেন, 'কই গাও।'

রাণাদিল মৃদু স্বরে গান ধরলে—'যদি তুমি ডাক, সাড়া দেব সে ডাকে, যদি অস্থিমজ্জা মাটীতে মিশেও যায়, তবু—'

গান শেষ হ'ল। রেশটুকু রেখে গেল যেন ঘরের হাওয়ায়।

তৃপ্তির সুরে দারা বললেন, 'সুন্দর, সুন্দর!'

চোখ বুজে শুয়ে থাকলেন দারা। কিছুক্ষণ পরে ডাকলেন, 'রাণাদিল।'

রাণাদিল শয্যাপাশে এসে দাঁড়ায়। প্রতীক্ষা করে থাকে কথার জন্য।

দারা চোখ খুলে একবার দেখে নিয়ে তাঁর পাশে বসতে ইঙ্গিত করলেন রাণাদিলকে।

রাণাদিল বসল।

দারা আবার চোখ বুজলেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'বেশ লাগছে রাণাদিল। আমি ভাবি কেন এই বেশ লাগা—তার জবাব পাই সাহায্য—সাহায্য আর ভালোবাসা। স্বপ্ন দেখি, যদি আরো বড় ভাবে সবাইকে সবার মাঝে সুখী করা যায়। যদি নতুন পথ দেখাতে পারি।' একটু হেসে বললেন, 'সবই স্বপ্ন দেখা।'

'আমি অত বুঝতে পারি না শাহজাদা। ভাবতেও পারি না।' রাণাদিল দারার কপালে কোমল হাতের পরশ বুলতে বুলতে বললে।

দারা বললেন, 'কেন পারবে না বুঝতে। তুমি ভালোবাসতে পার, ভালোবাসা নিতে পার—তারই মধ্যে দিয়ে তুমি সব রকম শক্তি পাবে।'

রাণাদিল চুপ করে থাকে। যেন ভাবতে চেষ্টা করে।

দুয়ারের কাছে পরদার ওপার থেকে ডাক আসে, 'শাহ-ই-আলিজা।'

'কে?' দারা সাড়া দিয়ে বললেন।

জবাব আসে, 'আমি কোয়েল।'

'কোয়েল। ভেতরে আয়।' দারা উঠে বসতে বসতে বললেন।

কোয়েল অনুমতি পেয়ে ভেতরে এসে সেলাম জানালে দারাকে।

দারা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন. 'কি ব্যাপার কোয়েল? তুই হঠাৎ—'

'বেগম সাহেবা আপনাকে কাল সকালে দেখা করতে বলেছেন। বিশেষ দরকার।'

'ঠিক আছে।'

কোয়েল ইতঃস্তত করছে দেখে দারা আবার প্রশ্ন করলেন, 'আর কিছু বলবি?'

'না, এবার আমি যাই শাহ-ই-আলিজা?'

'আচ্ছা যাও।'

কোয়েল থমকে যায়। যেতে গিয়ে বলে, 'শাহ-ই-আলিজা, গুল মহম্মদ সাহেবকে আপনি কি পাহারা দিতে দাঁড় করিয়ে এসেছেন?'

'গুলমহম্মদ? দারা একটু থতমত খেয়ে যান কোয়েলের কথায়।

'হ্যাঁ। সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের তারা গুণছেন।' একটু প্রগলভ শোনায় কোয়েলের কণ্ঠ।

বেগম সাহেবার প্রিয় বাঁদী শাহজাদা দারার প্রশ্রয় পায়। দারা একটু হেসে জবাব দিলেন, 'ওহো, গুলমহম্মদের কথা ত একেবারেই মনে ছিল না। আমি তাকে দাঁড়াতে বলে এসেছিলাম বটে। বেচারী!' একটু থেমে লঘুকণ্ঠে কোয়েলকে দারা বললেন, 'তুই বেচারাকে তারা গোণায় সাহায্য করলেই পারতিস। আকাশে অনেক তারা, গুলিয়ে ফেলতে পারে ত। তুই সঙ্গে সঙ্গে গুণে দিলে ওর সাহায্য হ'ত।'

'আমি গুণতে শুরু করলে সাহেবের গোণা যদি ভুল হয়ে যায়, তাহ'লে—'

'তোর গলাটা ঘ্যাঁচ করে গুলমহম্মদ কেটে ফেলত। যোদ্ধা লোক ত।'

কোয়েল দারার কথায় বললে, 'কাটতে চাইলেই কি কাটা যায়?'

'কেন, গুলমহম্মদ ত কাটাকাটিতে ভয় পাবার লোক নয়।

ব্যাপার ত তাহলে ভাল নয়। তোর গলার ওপর তাহ'লে ওর মায়া আছে।' হাসতে হাসতে দারা বললেন।

কোয়েল একটু যেন লজ্জারুণ হয়ে ওঠে। সেনীরব থাকে নত চোখে।

দারা বললেন, 'যাও, বেচারীর জন্য যখন এত সহানুভূতি, তখন তাকে বল, আমি তাকে তার ঘরে যেতে বলছি। তারা যখন গুণছে লোকটা—বাগিচায় ফুলের গন্ধ শুঁকতেও ঢুকতে পারে।'

কোয়েল দারার কথা শেষ হতে কোনমতে সেলাম করেই যেন পালিয়ে যায়।

দারা একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কোয়েলটা আমার কথা শুনে পালিয়ে গেল।'

'হ্যাঁ। ঠাট্টা করলেন যে।' রাণাদিল হেসে জবাব দিল।

'তা ত একটু করলাম।'

'তাই লজ্জা পেল।' রাণাদিল একইভাবে জবাব দিল।

'কেন?'

'গুলমহম্মদকে নিয়ে ঠাট্টা করলেন, তাতে ও জড়িয়ে পড়ছিল বলে।'

'কিন্তু আমি ত এমনি বলছিলাম। তাতে এতটা—'

'এমনিতেই গুলমহম্মদ সম্বন্ধে কোন কথা ওকে ঘুরিয়ে বললেই ও লজ্জা পায়। ধরা পড়ে গেছে ভাবে।'

'ধরা পড়েছে, তাই বল। তাহলে আমার কথা অজান্তে মৌচাকে ঢিল মেরেছে। আমাদের নীরব গুলমহম্মদ মনে মনে সরব।' দারা দরাজ গলায় সজোরে হেসে উঠলেন।

রাণাদিল হাসিভরা মুখ, খুশীভরা চোখে চেয়ে থাকে।

আট

মহীউদ্দীন মহম্মদ ঔরঙ্গজেব। হাত দুটি পেছনে রেখে পায়চারী করছিলেন। মনের কথাগুলির দোলনের সমতা রাখছিলেন যেন সেইভাবে। মুখাবয়বে চিন্তার ভ্রূকুটি স্পষ্ট।

দারা! দারা! দারাশিকো! তারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এইবার সুযোগ এসেছে তাকে দমন করার। ঔরঙ্গজেবের মনে বহুদিনের লালিত উচ্চাকাঙ্খা—মুঘল মসনদ। হিন্দুস্থানের মসনদ। তিনি সেই মসনদের দিকে চেয়ে আছেন।

দারাশিকো। তাকে কি ক'রে অবনমিত করা যায়। ঔরঙ্গজেব এতদিন শুধু সুবার শাসন করেই এসেছেন। এবার তিনি চান সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করতে।

ঔরঙ্গজেব সুশাসক। যোদ্ধা হিসেবে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন বহুবার। তিনি যখন কোথাও বিদ্রোহী দমন করেছেন, তখন দারা ওদিকে নিরুদ্বিগ্ন শান্ত জীবনযাপন করে চলেছেন।

দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী যখন তাঁর হাতে এল, তখন দাক্ষিণাত্যের ওপর মারাঠা বীর শাহজীর বিদ্রোহী মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আর তাঁর কতইবা বয়স—বছর আঠারো হবে।

নতুন সুবাদার হয়েই তুলে নিতে হ'ল বিদ্রোহ দমনের ভার। দক্ষতার সঙ্গে দখল করে নিলেন খান্দেশ আর সুরাটের উপকুলবর্তী বালগান জেলা। পরাজয়ের মূল্য স্বরূপ শাহজীকে কতকগুলি বিশেষ দুর্গ সমর্পণ করতে হল। তারপর শাসনের দণ্ড তুলে নিলেন ঔরঙ্গজেব নিজের হাতে।

দারাশিকো। তিনি যেন ঔরঙ্গজেবকে অতিষ্ঠ করে তোলার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—অন্ততঃ ঔরঙ্গজেবের সেই বিশ্বাস।

দারার দাক্ষিণাত্যের অনুচরেরা অস্থির করে তুলল তাঁকে। তারপর ছিল অর্থের অসম বণ্টনের হেতু অর্থের অপ্রতুলতা। তবু সেই অপ্রাচুর্য্য ঔরঙ্গজেবের কাছে বিশেষ কোন সমস্যা ছিল না, যতটা অসুবিধা আর অস্বস্তি দারার অনুচরেরা সৃষ্টি করে চলেছিল।

এক একসময় ঔরঙ্গজেব ভাবতেন, দারা কি চায়? নিজের মনে জবাব পেতেন, লোকচক্ষুতে তাঁকে হেয় করে তুলতে। হয়ত এ ধারণাটাই ঠিক।

দারা! এই দারা তার ভাই! বাদশার দৌর্বল্য আর পক্ষপাতের সুযোগ নিয়ে অপ্রিয়ভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব প্রতিবাদ পর্যন্ত করেন নি তখনও।

তারপর অশান্তি আর অস্বস্তির মাঝে ঔরঙ্গজেব একদিন দিলরস বানুকে শাদি করলেন। সেটা ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দ।

তারপর একই ভাবে দিন গেল, মাস গেল। বছরও ফুরল। হঠাৎ একদিন খবর এল, জাহানারা বেগম আগুনে ভীষণভাবে পুড়ে গেছেন। আশঙ্কাজনক অবস্থা তাঁর।

খবরটা শুনে তাঁর প্রিয় বোনের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন ঔরঙ্গজেব। সঙ্গে সঙ্গে জাহানারা বেগমকে দেখার জন্য আগ্রার দিকে ছুটে ছিলেন তিনি।

আগ্রায় পৌঁছেই সেই দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত শুনলেন শাহজাদা।

শাজাহানের ঘর থেকে বেরিয়ে সেদিন জাহানারা নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন।

অন্যমনস্কতার সুযোগে ঢাকাই মসলিনের অসংযত আঁচল উড়ে গিয়ে একটা বাতিদান উল্টে দিয়েছিল। আতর মাখান কাপড়ে মুহূর্তে আগুন ধরে গেল।

বাঁদীদের একজন দেখে চীৎকার করে বলে উঠেছিল, 'বেগম সাহেবা, আগুন।'

হতচকিত জাহানারা ভালো করে বুঝে ওঠার আগেই আগুন তার শিখা মেলে গ্রাস করে নিয়েছিল কাপড়ের অনেকটা অংশ। জাহানারা নিজেই প্রথমে আগুন নেভাতে চেষ্টা করেছিলেন—চেষ্টা করেছিলেন মুক্ত হতে, কিন্তু জড়িত হাতে কোন চেষ্টা সফল হ'ল না। ক্রমশঃ আগুনের স্ফুলিঙ্গ জাহানারার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিপদ দেখে বেগম সাহেবাকে রক্ষা করার জন্য চার জন বাঁদী এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আগুন নেভানোর পরিবর্তে ওরা নিজেরাই অল্পবিস্তর আহত হ'ল।

ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি পড়ে গেছিল মহলে। সাহায্য এরই মধ্যে এসে পৌছল—আগুনও নিভল।

কিন্তু জাহানারা বেগম ততক্ষণে আগুনের শিকার হয়েছেন। পিঠ, দেহের দুদিক এবং হাত দুটি আগুন এবং সাহায্যের প্রচেষ্টার ধকলে ভীষণভাবে পুড়ে গেছে। যন্ত্রণায় কাতর দেহে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় জাহানারা ছটফট করছিল।

শয্যাশায়ী জাহানারার অবস্থা আশঙ্কাকুল হয়ে উঠেছিল। হাকিম বদ্দিদের কোন ওষুধই কাজে লাগছিল না।

শাজাহান প্রিয় কন্যার এই অবস্থা দেখে উদ্বেগে আকুল হয়ে উঠেছিলেন। প্রার্থণা জানালেন খোদার কাছে, জাহানারার রোগ আরোগ্যের জন্য।

কিন্তু সেই একই অবস্থায় জাহানারা বেগম পড়ে রইলেন।

বিষণ্ণ দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল বহু হাকিম-বদ্দির বৃথা

চিকিৎসায়। বিদেশী হাকিম পর্যন্ত এসে চিকের আড়াল থেকে দেখলেন। কিন্তু সবই বৃথা হ'ল।

শাজাহান উৎকণ্ঠায় যেন পাগলের মত হয়ে উঠলেন।

একদিন ক্রীতদাস আরিফ এসে সংকোচ ভরে বললে, 'মালিক।'

'কি?' শাজাহান বিরক্ত চোখ দুটি তুলে বলেছিলেন।

'মালিক যদি হুকুম করেন তাহলে বেগম সাহেবাকে আমি সারিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে পারি।'

অবিশ্বাসভরা চোখে তার দিকে চেয়েছিলেন শাজাহান, 'তুই?'

'হ্যাঁ, মালিক। অনেক চেষ্টা ত করলেন, এবার আমাকে একটু সুযোগ দিন মালিক।'

'তুই পারবি?'

'চেষ্টা করব মালিক।'

ক্রীতদাস আরিফকেই শাজাহান আঁকড়ে ধরেছিলেন যেন শেষ অবলম্বনের জন্য। বলেছিলেন, 'তুই যদি আমার বেটীকে সারিয়ে তুলতে পারিস, তোকে যা পুরস্কার দেব, তুই তা ভাবতে পারবি নে।'

ভালই করেছিলেন শাজাহান আরিফকে অনুমতি দিয়ে। আরিফের তৈরী মলম প্রলেপে জাহানারার অবস্থার উন্নতি হয়েছিল, এবং তারই মলমের গুণে তিনি সেরে উঠেছিলেন।

দুর্ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ দগ্ধ জায়গাগুলিতে অস্পষ্ট চিহ্ন রেখে গেল।

আরিফকে পুরস্কার দিতে কার্পণ্য করেন নি শাজাহান। তাছাড়া সমস্ত শাহজাদাদের কাছ থেকেও সে প্রভূতভাবে পুরস্কৃত হ'ল। সব থেকে বড় জিনিষ সে যা পেল, তা হচ্ছে দাসত্ব থেকে মুক্তি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে আগ্রা দুর্গের বাসিন্দারা।

জাহানারা বেগম সেরে ওঠার পর একদিন শাহজাদা ঔরঙ্গজেব

নিজের ক্ষোভ জানিয়েছিলেন শাজাহানের কাছে। বলেছিলেন, 'বাদশা, দাক্ষিণাত্য শাসন করা আমার পক্ষে খুব অসুবিধাজনক হয়ে উঠছে।'

'কেন ?' প্রশ্ন করেছিলেন শাজাহান।

'দারার প্ররোচনায়, তার দাক্ষিণাত্যের অনুচরেরা শাসনে বাধা সৃষ্টি করছে।' ঔরঙ্গজেব জানিয়েছিলেন।

'নিজের দোষ ঢাকতে চাইছ ? দারা এখান থেকে কি ভাবে তার অনুচরদের প্ররোচিত করতে পারে, তা ত আমি ভেবে পাচ্ছি না।' শাজাহান বিশ্বাস করতে চান নি ঔরঙ্গজেবের কথা।

'আমার কথা সত্যি বাদশা। আমাকে হেয় করে তোলার চেষ্টা ছাড়া আর কি হতে পারে। তাই আপনাকে জানিয়ে দিলাম আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।'

'তোমাকে হেয় করে দারার কি লাভ ?'

'আমাকে তারা অপমান করার চেষ্টা পর্যন্ত করে।' ঔরঙ্গজেব ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন শাজাহানকে।

'আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না।'

ঔরঙ্গজেবের মনে হয়েছিল, দারার প্রতি পক্ষপাতের দরুণ সম্রাট কোন কিছুই দেখতে পান না।

ঔরঙ্গজেব ক্ষুব্ধ স্বরে বলেছিলেন, 'আমি বললেও না!'

'হ্যাঁ। তুমি বললেও বিশ্বাস হয় না।' শাজাহান বুঝতে চান নি।

'আমার কাছে প্রমাণ আছে।' ঔরঙ্গজেব বলেছিলেন

'সেটা বিশ্বাসযোগ্য হবে কি না আমার সন্দেহ আছে। তুমি দারার প্রতি বিদ্বেষ বশে এই সব কথা বলছ।' শাজাহান কিছু বিচার করতে চান নি।

ঔরঙ্গজেব একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'বিদ্বেষ? দারার ওপর আমার বিদ্বেষ হবে কেন?'

'সেটা চিরকাল তোমার আছে। তাছাড়া দারা ভাল মানুষ। তার ওপর সব দোষ চাপান সোজা।' শাজাহান জবাব দিয়েছিলেন।

ঔরঙ্গজেব কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। তারপর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ধীরে ধীরে বলেছিলেন, 'গোস্তাকী মাফ করবেন বাদশা। দারার ওপর আপনার পক্ষপাত যদি থাকে তাহলে আমাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী থেকে রেহাই দিন। আমি নিজের সম্মান নষ্ট করতে পারব না। আশা করি আমার কথাটা ভেবে দেখবেন।'

'আচ্ছা, ভেবে দেখব।' শাজাহান অন্য দিকে চেয়ে বলেছিলেন।

ঔরঙ্গজেব আর দাঁড়ান নি। ক্ষোভে দুঃখে তার মনের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠেছিল। সত্য কথার এই পুরস্কার।

দারা। দারাশিকো। মনে মনে নামটা উচ্চারণ করলেন ঔরঙ্গজেব।

অনেক করেও বাদশার মন পান নি ঔরঙ্গজেব। সমস্যা পুরণের সময় ঔরঙ্গজেব। আর কলকাঠি নাড়ার বেলায় দারা আর জাহানারা বেগম। জাহানারাও তার ওপর বিরূপ। পরিশ্রম করেও ঔরঙ্গজেব বাদশা শাজাহানের কাছে এতটুকু প্রশ্রয় পান নি। যত কিছু উপভোগ করছেন, সে দারাশিকো, আর জাহানারা বেগম। শুধু রোশেনারা বেগমকেই যা তাঁর পক্ষে পেয়েছেন।

বর্তমানে রোশেনারাকেও প্রয়োজন আছে তাঁর। ভাল টোপ

দেওয়া যায় ওকে, যেহেতু রোশেনারার কামনা ঔরঙ্গজেব জানেন। জৈবিক প্রয়োজন চরিতার্থই রোশেনারার বিশেষ আগ্রহ।

কিন্তু এবার সুযোগ এসেছে। আজ উনচল্লিশ বছর বয়সে আশার আলো দেখতে পেয়েছেন বহুদিন প্রতীক্ষার পর।

ওমরাহরা অনেকেই দারার বিপক্ষে। বিশেষ করে তিনজন তাঁকে প্ররোচিত করছে প্রতিদিনই। অবশ্য যারা দারার বিপক্ষে, তারা সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর পক্ষে আসে নি। স্বার্থের সংঘাতে অথবা দারার উপর কথা বলতে যাওয়া—দু'ক্ষেত্রেই দারার প্রতিকুল মনোভাব ওদেরকে দারার শত্রু করে তুলেছে।

দারা যদি একটু কুটবুদ্ধিসম্পন্ন হতেন, তাহলে অবশ্য এতটা ঘটত না। নিজের মনে হাসলেন মহীউদ্দীন মহম্মদ ঔরঙ্গজেব।

হ্যাঁ, তারপর! তারপরই ঔরঙ্গজেবকে দেওয়া হ'ল গুজরাট শাসনের ভার (ফেব্রুয়ারী, ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ)। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে যেতে হ'ল বালখ, বাদখসান এবং কান্দাহার অভিযানে। এ সমস্ত ব্যাপারেও কি দারার হাত ছিল ? থাকতে পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু কেন ?

ঔরঙ্গজেবের ধারণা, দারাশিকো কাউকেই আগ্রার কাছে থাকতে দিতে রাজী নন। বিশেষ করে ঔরঙ্গজেবকে ত নয়ই। কিন্তু দারা নিজে আগ্রায় থেকেছেন। সুবাদারী পেয়েও তিনি আগ্রা ত্যাগ করেন নি—শুধু দু'একবার ব্যতিক্রম হয়ে ছিল মাত্র।

কান্দাহার অভিযান থেকে ফিরে এলে, সেখানেও আবার দারার অনুচররা সৃষ্টি করলে প্রতিকুল অবস্থা। অতিষ্ট হয়ে উঠলেন ঔরঙ্গজেব। আবার অশান্তি ঘিরে ধরল তাঁকে।

ঔরঙ্গজেবের এক একসময় মনে হত, ছেড়ে দেবেন সমস্ত

কিছু। কি লাভ আছে? তার থেকে খোদার চিন্তায় দিন কাটিয়ে দেবেন।

ঔরঙ্গজেব আবার তাঁর অসুবিধার কথা শাজাহানকে জানালেন। ঔরঙ্গজেবকে আবার ফিরে যেতে হ'ল দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী নিয়ে।

শাহজাদা ঔরঙ্গজেবের ভাল লাগত না কিছু। তাঁর মনে হয়েছিল লড়াই করাই তাঁর কাজ বুঝি। কিন্তু একটা লাভ হয়েছে, লড়াই সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা বেড়েছে।

সেদিনগুলোর জ্বালা ঔরঙ্গজেব ভোলেন নি। অপেক্ষা করেছেন সুযোগের। সুযোগ এবার এসেছে প্রতিশোধ গ্রহণের। তার উপর আছে মসনদ পাবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাও কি সম্ভব?

হ্যাঁ, তাঁর ইচ্ছার রূপ দিতে হবে। চাই সাহায্য। নিজের পরিমিত শক্তিকে বাড়াতে হবে। কৌশল করে এগুতে হবে। তারপর··· প্রথম দারাশিকো—তারপর মসনদ।

নিজের মনে হেসে উঠলেন মহীউদ্দীন মহম্মদ। না, এতটা উল্লসিত হওয়া উচিত নয়। এখনও কিছুই করা হয় নি।

প্রথমবার একটু ভুল করেই পা বাড়িয়ে ফেলেছিলেন। অবশ্য তখন বাদশা সত্যিই মৃত বলে মনে হয়েছিল আগ্রা থেকে আসা সংবাদে। কিন্তু ফজিল খাঁর কথায় জানা গেছে, বাদশা জীবিত কিন্তু কথাটা গোপন রাখতে হবে। তাছাড়া জোট বাঁধলে সুবিধা হবে। তারপর যখন প্রয়োজন হবে, জোট ভেঙে বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ। নচেৎ, একযোগে যদি অন্যান্য শাহজাদাদের দিক থেকে বিপদ দেখা দেয়।

অতএব এখন জোট বাঁধতে হবে। তাতে নিজের শক্তিও

বাড়বে। সুযোগ এসেছে—ছাড়া চলবে না। মুরাদ আর সুজা দুজন আছে। সুজাকে পাওয়া যাবে না। বাকী রইল মুরাদ। মুরাদকে পেলেই চলবে।

মুরাদ বোকা বটে, কিন্তু শক্তিতে ভরপুর। তাকে পেলেই হবে। মসনদের লোভ জেগে উঠেছে তারও। বক্রহাসির রেখা ফুটে উঠল ঔরঙ্গজেবের মুখে।

আর একজনকে পেলেই হবে তাঁর। সে হচ্ছে মীরজুমলা। লোকটা গুণী। সমরবিদ্যায় প্রতিভাবান, পারদর্শী। সুতরাং এদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর পাশে দাঁড় করাতে হবে।

দরজার কাছে পায়ের শব্দ পেয়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়ালেন ঔরঙ্গজেব।

বাহাদুর খাঁ আর আজম খাঁ তাঁর দুই সেনাধ্যক্ষ সেলাম জানাল মহীউদ্দীন মহম্মদকে।

'এস বাহাদুর খাঁ।' ঔরঙ্গজেব আহ্বান জানালেন।

'আমাদের ডেকেছিলেন শাহজাদা?'

ঔরঙ্গজেব বাহাদুর খাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ। তোমাদের আমি কতকগুলো কথা বলার জন্য ডেকেছি বাহাদুর খাঁ। সেগুলো তোমাদের জেনে রাখা দরকার বলে আমি মনে করছি।'

বাহাদুর খাঁ সসম্ভ্রমে বললে, 'বলুন।'

'বাহাদুর খাঁ, আজম খাঁ, তোমরা দুজনেই জানতে পেরেছ নিশ্চয়—বাদশা জীবিত আছেন।'

'হ্যাঁ।' আজম খাঁ উত্তর দিল।

'একথা তোমরা ছাড়া আর কেউ জানে?' ঔরঙ্গজেব প্রশ্ন করলেন।

'না।'

'বেশ, শোন। একথা যেন কেউ জানতে না পারে। বুঝেছ।' ঔরঙ্গজেব বললেন। তিনি জানতেন, তাঁর বিশ্বাসী এই সেনাধ্যক্ষরা, তাঁর এই কথার পর প্রাণ গেলেও কাউকে বলবে না।

'যো হুকুম।' সমস্বরে তুজনে বলল।

ঔরঙ্গজেব বললেন, 'শোন, আমাদের অভিযান কেন বন্ধ রেখেছি জান? একা আমার এতটা উচিত নয়। সেটা তাহলে বড় রকমের ঝুঁকি নেওয়া হত। কোন রকমে হেরে গেলে সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যেত। তাই সাহায্যের প্রয়োজন।'

'সাহায্য?' বাহাতুর খাঁ প্রশ্ন করলে।

'হ্যাঁ। সাহায্য ছাড়া হবে না। অর্থবল এবং লোকবল তুইই আমার কম। আমি তুজনকে আমার কাজে লাগাব। প্রথম জন হচ্ছে শাহজাদা মুরাদ।'

'শাহজাদা মুরাদ!' বাহাতুর খাঁ বিস্মিত হয়।

আজম খাঁকেও বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাতে দেখা গেল ঔরঙ্গজেবের দিকে।

ঔরঙ্গজেব হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, শাহজাদা মুরাদ। অবাক হচ্ছ কেন?'

বিস্মিত বাহাতুর খাঁ জানে, এই পরিকল্পনা কিসের জন্য। কিন্তু শাহজাদা মুরাদ কি তাঁর ভাইএর সঙ্গে যোগ দেবে? একই লক্ষ্য ত তুজনের।

বাহাতুর খাঁ ইতঃস্তত করে বললে, 'কিন্তু শাহজাদা মুরাদ কি রাজী হবেন?'

ঔরঙ্গজেব হেসে উঠলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'বাহাতুর খাঁ, কাকে কি দিতে হবে, এটুকু বুঝতে পারলে কোন

কার্যোদ্ধারেরই অসুবিধা হয় না।' একটু থেমে আবার বললেন, 'সেটা আমি ভাবব বাহাদুর খাঁ। আমি শুধু চাই কাফের দারাকে শাস্তি দিতে।'

বাহাদুর খাঁ শাহজাদা দারাকে জানেন। দরবারে অনেকের কাছে অপ্রিয় হলেও শাহজাদা দারাকে প্রজারা ভালবাসে তার হৃদয়ের জন্য। কিন্তু সে কথা ভাবা এখন উচিত নয়। ঔরঙ্গজেবের প্রতি আনুগত্যই তার কর্ত্তব্য বলে মনে করলে বাহাদুর খাঁ।

ঔরঙ্গজেবকে চুপ করে থাকতে দেখে বাহাদুর খাঁ বললে, 'শাহজাদা সুজাকেও দলে টানলে হয় না?'

'সে আসবে না। আমার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে আগেই।' তারপর বললেন, 'সুজা একাই বেরিয়ে পড়েছে বলে জানি।' আমার অনুমান দু একদিনের মধ্যেই তার পরাজয়ের সংবাদ পাবে।'

'তাহলে এই ত সুযোগ। শাহজাদা সুজার দিকে শাহজাদা দারা ব্যস্ত থাকবে। এই সুযোগ আমরা কাজে লাগাতে পারি। তার উপরে আগ্রা থেকেও সংবাদ এসেছে—ওমরাহরা শাহজাদা দারার দমন চায়। অনেকে আবার উজীর শাদাউল্লা খাঁ সাহেবের মৃত্যুতে শাহজাদা দারার উপর অসন্তুষ্ট। সুতরাং....'

উজীর শাদাউল্লা খাঁর মৃত্যু সত্যিই দরবারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। হয়ত তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুই হয়েছিল—হয় ত নয়। শাহজাদা দারাশিকোকে মৃত্যুর জন্য দায়ী মনে করেছিলেন অনেকেই। বাদশা শাজাহানও দুঃখিত হয়েছিলেন। উজীর শাদাউল্লা খাঁর মত লোক তাঁর পাশ থেকে সরে যাওয়াতে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি দারার উপর। সেই অসন্তোষ কখনও শাজাহানের মুখ ফুটে বেরিয়েও পড়েছে।

ঔরঙ্গজেব কিন্তু সে রকম ভাবেন না। অন্য দিক থেকে ভাববার চেষ্টা করেছেন।

উজীর শাদাউল্লা খাঁ ছিলেন হিন্দু। হয়েছিলেন মুসলমান। শাদি করেছিলেন এক পাঠান মহিলাকে। গণ্য ছিলেন দশজনের মধ্যে—মান্য করত সকলে। শাদাউল্লা খাঁয়ের সঙ্গে কিছু বন্ধুত্ব করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করত সে। সুতরাং এ ধরণের মানুষের হঠাৎ রহস্যজনক মৃত্যু হ'লে একটু সোরগোল হবেই।

কিন্তু যদি সন্দেহ সত্যি হয়। ঔরঙ্গজেব দুটো কারণ তার পেছনে থাকতে পারে বলে মনে করেন।

প্রথম, শাদাউল্লা খাঁ শাহজাদা সুজার পক্ষে ছিলেন বলে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে।

দ্বিতীয় জনরব, শাদাউল্লা খাঁ হয় ত হিন্দুস্থানের মসনদ অধিকার করার চেষ্টা করেছিলেন নিজে। অথবা যে লোদী সাম্রাজ্যের পতন হয়েছিল বাদশা বাবরের হাতে, সেই সাম্রাজ্য আবার পাঠানদের হাতে হয় ত বা তুলে দিতে চেয়েছিলেন শাদাউল্লা।

হয়ত দ্বিতীয় ধারণার দ্বিতীয় সূত্র এসেছে—যেহেতু শাদাউল্লা সাহেবের স্ত্রী পাঠান ছিলেন।

যদি এই ধারণা সত্যি হয়, তাহলে গুরুতর অভিযোগ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

হয় ত এই দ্বিমুখী ধারণার অবস্থায় পড়লে ঔরঙ্গজেবকেও এই ব্যবস্থাই নিতে হ'ত।

সে যাই হোক, সত্যি শাদাউল্লা খাঁর মৃত্যুতে অনেকেই অসন্তুষ্ট দারার উপর। কিন্তু এটা খুব বড় সুযোগ বলে এখন আর মনে করছেন না ঔরঙ্গজেব।

ঔরঙ্গজেব বলে উঠলেন, 'না, বাহাদুর খাঁ, এটা কোন সুযোগই নয়। যারা শাদাউল্লা খাঁর মৃত্যুতে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, তারা অনেকেই বিশেষ সাহায্য করবে না। যারা করবে, তারা নিজেদের স্বার্থের জন্যই সাহায্য করবে। তার চেয়ে আমাদের অপেক্ষা করাই ভাল।'

আজম খাঁ এবার জানতে চাইলে, 'আপনি আর কার সাহায্য পাবেন বলে আশা করছেন শাহজাদা।'

'মীরজুমলা।'

'মীরজুমলা? কিন্তু তিনিও কি সাহায্য করতে রাজী হবেন বলে মনে হয়?' আজম খাঁ আবার প্রশ্ন করলে।

'প্রথমে হয় ত রাজী হবে না। আর কেন হবে না, তাও আমি জানি। তবে আমি তাকে রাজী করিয়ে নেব যে কোন ভাবেই হোক। সুলতান মহম্মদকে আমার দূত হিসেবে পাঠিয়েছি। তার আজ এখানে ফিরে আসার কথা।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'সে ফিরে এলে পর, করণীয় যা করব।'

আজম খাঁ কিছু বলার জন্য ইতঃস্তত করতে থাকে।

ঔরঙ্গজেব বুঝতে পেরে বললেন, 'কিছু বলবে আজম খাঁ? নির্ভয়ে বলে ফেল।'

আজম খাঁ বললে, 'আমি ভাবছিলাম যে শাহজাদা মুরাদ আপনার সাথে মসনদের ব্যাপার নিয়ে কোন গণ্ডোগোল করবেন না ত?'

'মসনদ? গণ্ডোগোল?' হেসে উঠলেন ঔরঙ্গজেব, তারপর বললেন, 'আজম খাঁ, আমি ফকির মানুষ। গণ্ডোগোল হ'লে খোদা আমায় ঠিক পথ দেখাবেন। সমস্ত পরিকল্পনা সার্থক হোক আজম খাঁ, তারপর দেখি খোদা আমাকে দিয়ে কি করান। আর মুরাদ ত নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণাই করেছে!'

আজম খাঁ আর কথা বলে না।

ঔরঙ্গজেব আবার বললেন, 'আজম খাঁ, তুমি মুরশীদকুলী খাঁকে ডাকতে বল ত।'

'যো হুকুম।' আজম খাঁ খবর পাঠাতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে জানায়, 'সুলতান মহম্মদ এসে গেছেন শাহজাদা।'

সুলতান মহম্মদ ঘরে প্রবেশ করতেই, উৎসুক ঔরঙ্গজেব প্রশ্ন করলেন, 'কি খবর মহম্মদ?'

মহম্মদ ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল, 'মীরজুমলা যোগ দিতে রাজী নয়। কারণ হিসেবে বলেছে যে আপনি নাকি সবই জানেন।'

'আমি জানতাম। কিন্তু বাবাজীকে দৌলতাবাদে আনতেই হবে।' ঔরঙ্গজেব অস্ফুট স্বরে আত্মমগ্ন হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে মহম্মদ। তুমি বিশ্রাম কর গে। আর সুলতান মজুমকে পাঠিয়ে দাও শিগ্রী।

পুত্র মহম্মদ আদেশ নিয়ে চলে গেল।

মহম্মদের ব্যর্থ দৌত্যের জন্য আরেক পুত্র সুলতান মজুমকে পাঠাবার চিন্তা সঙ্গে সঙ্গে করে নিয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে উঠলেন, 'ঠিক আছে। এখন মুরাদকে একটা চিঠি পাঠাতে হবে। সময় নষ্ট করলে চলবে না।'

ঔরঙ্গজেব কলমদান টেনে নিয়ে মুসাবিদায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

ভাই—

কি প্রতিকুল অবস্থার মধ্যে প্রচুর শ্রমসহকারে যে আমাকে সুবা সামলাতে হয়, তা ত তুমি জান। তারই মাঝে খবর পেলাম

দারা আর সুজা মসনদের লোভে লড়াই শুরু করে দিয়েছে। আমি ফকির, এসব দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কি করতে পারি।

আমি ফকির বলেই সাম্রাজ্যের উপর কোন লোভ আমার নেই। তবে এ ব্যাপারে আমি তোমার পক্ষই সবসময় সমর্থণ করব! কারণ, সকলের মধ্যে তুমিই আমার প্রিয়।

দারাশিকো এই বিশাল সাম্রাজ্যের ভার নেওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত। উপরন্ত সে কাফের। দরবারের ওমরাহরা পর্যন্ত তাকে পছন্দ করেন না। সুজাও তাই। তাহলে বাকী কে রইল? তুমি।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, তাহলে কে এই মসনদের উপযুক্ত? আমি নির্দিধায় উত্তর দেব—তুমি। একমাত্র তোমার মধ্যেই শাসক হওয়ার সমস্ত গুণ গুলো দেখেছি।

অবশ্য এই মত শুধু আমার একার নয়—বহু সম্মানিত নাগরিকদেরও। যাঁরা তোমার উপর ভরসা রাখেন এবং বাদশাহী দরবারে তোমার উপস্থিতির জন্য আশার আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

আমার পক্ষ থেকে এইটুকুই শুধু বলার আছে—যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমি তোমার সাম্রাজ্যের একটা আলাদা জায়গায় নিরুদ্বিগ্নভাবে জীবনের বাকী কটা দিন খোদাতালার চিন্তায় কাটাতে পারব, তাহলে তোমাকে আমার পরামর্শ শুধু এই যে আমার এবং বন্ধুদের সৈন্য দিয়ে সর্বপ্রকার সাহায্য করে তোমার যাত্রাপথ প্রশস্থ করে দিতে প্রস্তুত আছি।

এ পত্রের সঙ্গে আমার শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে এক লক্ষ টাকা পাঠালাম। আশা করি গ্রহণ করবে। সময় খুব ঘোরালো। ইতি—

নিজের দস্তখত করে পত্রটা আগাগোড়া আবার পড়ে নিলেন ঔরঙ্গজেব।

মুরাদের পক্ষে এ টোপ না গেলা অসম্ভব। সে ঘায়েল হবেই। মুরাদের বুদ্ধি কম—লোভ বেশী। শক্তি বেশী—সংযম কম।

নিজের মনে হাসলেন ঔরঙ্গজেব।

মুরশীদকুলি খাঁ এসে সেলাম জানাতে ঔরঙ্গজেব বললেন, 'এই পত্র তুমি একজন বিশ্বাসী লোক দিয়ে মুরাদের কাছে এখনই পাঠিয়ে দাও।'

'যো হুকুম।'

'আর শোন, এর সঙ্গে এক লক্ষ টাকা পাঠাবে।' ঔরঙ্গজেব আদেশ দিলেন।

'যো হুকুম।'

'আচ্ছা, তোমরা সকলে এবার যাও। আমি আর একটু ভেবে নি।' ঔরঙ্গজেব বললেন।

সকলে চলে যেতে ঔরঙ্গজেব চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন।

নয়

ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য শাসনের সময় সমৃদ্ধ গোলকুণ্ডা আর বিজাপুরের শিয়া শাসকদের স্বাধীনতা হরণ করার ইচ্ছা হয়।

মহম্মদ সৈয়দ—অতি পরিচিত নাম মীরজুমলা খাঁ। পারস্য থেকে এই ভাগ্যান্বেষী এসেছিল হিন্দুস্থানে। দামী পাথরের বেসাতি করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিল এই মীরজুমলা খাঁ।

তখন গোলকুণ্ডার শাসক ছিলেন আবদুল্লা কুতব শাহ। তাঁরই যোগাযোগে মহম্মদ সৈয়দ তাঁর দরবারে প্রবেশ করল।

মীরজুমলা খাঁ বা মহম্মদ সৈয়দের কিছু গুণ ছিল। সামরিক কৌশল আর সুষ্ঠু শাসনকার্য পরিচালনা করার সহজাত প্রতিভা সুলতান লক্ষ্য করেছিলেন তার মধ্যে। সেই প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ সুলতান মীরজুমলাকে দিলেন তাঁর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদ।

ক্ষমতা হাতে পেয়ে মীরজুমলা রাজ্যের একাধিপতি হয়ে উঠল।

প্রায় তিনশ মাইল লম্বা এবং পঞ্চাশ মাইল চওড়া কর্ণাটক রাজ্যে নিজের প্রভুত্ব কায়েম করে বার্ষিক চল্লিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব ভোগ করতে শুরু করল মীরজুমলা, এবং সেখানে ঐ অর্থাগমের সুযোগে এক শক্তিশালী বাহিনীও গঠন করল সে।

কিন্তু সুলতান মীরজুমলার আধিপত্যে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। মীরজুমলার ব্যবহারের প্রতিফলস্বরূপ উপায়ান্তর না দেখে তাঁর পুত্র আমিন খাঁ সহ সমস্ত পরিবারকে বন্দী করলেন তিনি।

মীরজুমলা ছুটে গেল ঔরঙ্গজেবের কাছে—মুঘল বাদশার সাহায্যের আশায়। শুরু হ'ল জল্পনা কল্পনা, কি ভাবে সাফল্যলাভ করা যায় তাই নিয়ে।

ঔরঙ্গজেব বুঝেছিলেন, তাঁর আগামী আক্রমণের সম্ভাব্য সফলতার জন্য এই অসন্তুষ্ট এবং প্রায়-স্বাধীন রাজকর্মচারীটির সাহায্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। তিনি মীরজুমলাকে আশ্বাস দিলেন।

ঔরঙ্গজেব পিতাকে দিয়ে পত্র লিখিয়ে গোলকুণ্ডার সুলতানের কাছে পাঠালেন। তাতে সুলতানকে মীরজুমলার পরিবারবর্গকে ছেড়ে দিতে বলা হল।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব সুলতানকে পত্রোত্তর দেওয়ার সময় না দিয়েই সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন সুলতানের বিরুদ্ধে।

ঔরঙ্গজেবের আদেশমত পুত্র মহম্মদ হায়দ্রাবাদ আক্রমণ এবং লুণ্ঠন করল।

৬ই ফেব্রুয়ারী ১৬৫৬ সালে ঔরঙ্গজেব নিজে সেখানে পৌছলেন এবং পরদিন গোলকুণ্ডা অবরোধ করলেন। মীরজুমলার জন্যই এ যুদ্ধ ঔরঙ্গজেব করেন নি। তাঁর ইচ্ছা ছিল, গোলকুণ্ডা রাজ্যকে মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযোজন।

কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ইচ্ছায় বাদ সাধলেন শাজাহান। তিনি জানতে পারলেন, এর পেছনে দারা এবং জাহানারার হাত আছে।

শাজাহানের আদেশে তিরিশে মার্চ সমস্ত অবরোধ ঔরঙ্গজেবকে তুলে নিতে হল।

নিষ্কৃতি পাওয়ার বিনিময়ে মুঘল বাদশাকে সুলতানের দিতে হ'ল দশ লক্ষ টাকার ভবিষ্যৎ ক্ষতিপুরণের অঙ্গীকার পত্র, আর উপঢৌকনস্বরূপ রঙ্গীর জেলা।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব গোপনে পুত্র মহম্মদের সঙ্গে সুলতানের কন্যার শাদির বন্দোবস্ত করলেন। শুধু তাই নয়, ঔরঙ্গজেব সুলতানকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে সুলতানের পর তাঁর উত্তরাধিকারী হবে মহম্মদই।

আর মীরজুমলা খাঁ মুখ্যমন্ত্রী থেকে এবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল।

সেই মীরজুমলার কাছে ঔরঙ্গজেব সুলতান মজুমকে পাঠিয়ে ছিলেন। মহম্মদের দৌত্যে মীরজুমলা রাজী হয় নি, কিন্তু মজুমের কথাবার্তায় সে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হ'ল।

ডুজনের সাক্ষাৎ হ'ল দৌলতাবাদে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বাতিদান-ঝালরের আলো জেলে

দেওয়া হয়েছে। ধীর পদক্ষেপে মীরজুমলা সুলতান মজুমের প্রদর্শিত পথে ঔরঙ্গজেবের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

মীরজুমলাকে দেখে ঔরঙ্গজেবের চোখে খুশীর ঝলক দেখা দিল। তিনি দু'হাত বাড়িয়ে মীরজুমলার হাত দুটি ধরে সাদরে তাকে আসনে বসিয়ে বললেন, 'বাবাজী, তুমি এসেছ? আমি যে কত খুশী হয়েছি কি বলব।'

'সুলতান মজুমের কথায় আসতে বাধ্য হ'লাম। কিন্তু—' মৃদু হাসি হেসে মীরজুমলা বলল।

ঔরঙ্গজেব বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'তার আগে একটু কিছু খেয়ে নাও। তারপর কথা হবে।'

'না, না, তার কোন প্রয়োজন হবে না।' মীরজুমলা আপত্তি জানালে। তারপর বললে, 'আমি সুলতান মহম্মদের সঙ্গে আসি নি বলে কিছু মনে করেন নি ত?'

'না বাবাজী, আমি কিছু মনে করি নি।' ঔরঙ্গজেব বললেন।

মীরজুমলা একটু ভেবে নিয়ে বললে, 'সুলতান মহম্মদের কাছ থেকে আমাকে ডাকার কারণ সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পেয়েছি। সেইজন্য ওই কথাটা বলে পাঠিয়েছিলাম, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন?'

'হ্যাঁ। খুব ভালোভাবেই বুঝেছি। তোমার পরিবারের সকলে দারার হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। সেইজন্যই তোমার আপত্তি, এ আমি বুঝেছি বাবাজী।' ঔরঙ্গজেব পায়চারী করতে করতে বললেন।

মীরজুমলা বললে, 'তাহলে আমার আর বলার কিছু নেই।'

ঔরঙ্গজেব পায়চারী থামিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝক্‌ঝকে

দৃষ্টি মীরজুমলার উপর নিক্ষেপ করে বললেন, 'আমি যদি তোমার পরিবারবর্গের গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগতে না দিই, তাহলে?'

'কিন্তু—' মীরজুমলা কিছু বলতে যাচ্ছিল।

ঔরঙ্গজেব একটা হাত তুলে মীরজুমলাকে নিরস্ত করে বললেন, 'কোন কিন্তু নেই বাবাজী। একদিন তোমার উপকার করেছিলাম। তুমি সেদিন বলেছিলে, যদি কোন দিন আমার তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহলে তোমাকে বললেই হবে। আজ সাহায্যের প্রয়োজন। বল বাবাজী, তুমি কি মুখ ফিরিয়ে নেবে?'

ঔরঙ্গজেবের কথায় মীরজুমলা একটু ইতঃস্তত করে বললে, 'কিন্তু বাদশা শাজাহান যে এখনও জীবিত আছেন। আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন। আমি ভালোমতই জানি, তিনি এখনও জীবিত। কিন্তু শয্যাশায়ী।'

ঔরঙ্গজেব জানতেন, বিবাদ শুরুর খবরেই আগ্রা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে। সেই অবস্থার কথাই কাজে লাগিয়ে বললেন, 'তাই যদি হয়, আমি খবর পেয়েছি, আগ্রার অবস্থা ভাল নয়। বাদশার অসুস্থতায় দারা সেখানে কি রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। এটাও ত ভাবা যায় না। উপরন্তু দারাই আমার লক্ষ্য—বাদশার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ উপলক্ষ্য মাত্র।'

মীরজুমলা একটু নড়েচড়ে বসে। ভাববার চেষ্টা করে বলে মনে হয়।

ঔরঙ্গজেব আস্তে আস্তে বললেন আবার, 'ভেবে দেখ গোলকুণ্ডার কথা—আমার ইচ্ছা ছিল সুলতানের হাত থেকে রাজ্যটা কেড়ে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেব। কিন্তু দারা বাদশাকে দিয়ে সে ইচ্ছা পূরণ হতে দেয় নি। নইলে তুমি ত আজ

গোলকুণ্ডার মালিক হতে। সে কথা থাক। আজ আমার ইচ্ছা শুধু সেই দারার বিরুদ্ধে।'

'কিন্তু যদি হেরে যাই?' মীরজুমলা বললে।

'বাবাজী, আমিও হেরেছি কম? লড়াই-এর অভিজ্ঞতা আমার আছে। তাছাড়া তোমার মত কাউকে পাশে পেলে শক্তি আরও বাড়বে। তাহ'লেই হারব না।' একটু থেমে আবার মীরজুমলার দিকে আড়চোখে চেয়ে বললেন, 'একা হ'লে হারবার সম্ভাবনা বেশী। তাছাড়া এই মৃত্যু সংবাদ রটানর মূলে কারা, সেটাও বেরিয়ে পড়া বিচিত্র নয়। কারণ, আমার অনেক লোকই তা জানে, তারা বলে দিতে পারে। তাহ'লে প্রথম বলবে তারা তোমারই বেটা আমিন খাঁর নাম। ষড়যন্ত্র করার কথাও ফাঁস হতে পারে।'

মীরজুমলা চকিতে মুখ তুলে চাইল। তারপর আবার মাথা নীচু করে কি যেন ভাবতে লাগল।

ঔরঙ্গজেব আবার বললেন, 'তুমি সাহায্য না করলে আমার অভিযান দুর্বল হয়ে পড়বে। তাছাড়া এমনিতেই খবর ছড়িয়ে যেতে পারে—আমিন খাঁ মৃত্যু সংবাদ রটিয়েছে, আর তোমার সঙ্গে আমার দরে বনে নি বলে তুমি সরে গেছ। তার ফলও ভাল হবে না। তাতে আমার কোন হাত থাকবে কি? অবশ্য তুমি যোগ দিলে না বলে আমি তোমার ক্ষতি করার কোন রকম চেষ্টাই করব না। ফকির মানুষ, বেশী গণ্ডোগোল ভাল লাগে না।'

'কিন্তু আপনাকে আমার পরিবারবর্গের নিরাপত্তার ভার নিতে হবে।' মীরজুমলা ঔরঙ্গজেবের পক্ষে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বোঝা গেল। ঔরঙ্গজেবের ইঙ্গিত সে বুঝেছে।

'বলেছি ত সে ভার আমার।' ঔরঙ্গজেব আশ্বস্ত করে বললেন।

'তাহ'লে আমি আপনাকে সাহায্য করতে রাজী।'

'সাবাস।' ঔরঙ্গজেব মীরজুমলার কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'কিন্তু তোমাকেও একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে।'

'কি ?'

'বাদশা জীবিত আছেন এবং তোমার সঙ্গে আমার আজকের কোন কথাই তুমি প্রকাশ করবে না।'

'বেশ, প্রতিজ্ঞা করলাম।'

মীরজুমলাকে ঔরঙ্গজেব পেয়ে গেলেন। একটা কাজ তার সমাধা হ'ল। মীরজুমলার বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। এখন বাকী রইল মুরাদ। তাহ'লেই পরিকল্পনার প্রাথমিক কাজ শেষ। তারপর আসল কাজ।

ঔরঙ্গজেবের একটা কাজ সফল হয়েছে। মীরজুমলা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বাকী শুধু মুরাদ।

ঔরঙ্গজেব অধীর আগ্রহে মুরাদের খবরের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। এবার প্রতীক্ষার অবসান হল। দূত মারফৎ সংবাদ এল—মুরাদ ঔরঙ্গজেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়।

তাহ'লে মুরাদকেও পাওয়া যাবে। মুরাদ তাঁর টোপ গিলেছে।

ঔরঙ্গজেব আর দেরী করলেন না। নিজেকে প্রস্তুত করে তিনি যাত্রা করলেন।

মুরাদ সিরাজীর বান ডাকিয়ে বসেছিলেন। ঔরঙ্গজেবকে দেখে বলে উঠলেন, 'এস, এস, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে একপাত্র সিরাজী ঢেলে ঔরঙ্গজেবের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

ঔরঙ্গজেব মৃদু হেসে নরম সুরে প্রত্যাখান করে বললেন, 'না ভাই, আমি ফকির মানুষ। ও সব আমার আদৌ চলে না।'

'ও, তুমি ত এ সব খাও না। তবে চলবেটা কি? এ ছাড়া অন্য কিছু?' ইঙ্গিতবহ চোখে মুরাদ চাইলেন ঔরঙ্গজেবের দিকে। আমেজে ঢুলুঢুলু চোখ, রঙেও রঙীন।

মুরাদের দিকে দৃষ্টি ফেললেন ঔরঙ্গজেব। ভাল করে দেখলেন তাকে।

না, মুরাদ সেই একই রকম আছে। সুরা আর নারীর প্রতি লালসাপূর্ণ টান। কিন্তু সে কথা এখন থাক। একটু শব্দ করে হেসে ঔরঙ্গজেব বললেন, 'তুমি ব্যস্ত হয়ো না মুরাদ, আমার কিছুরই দরকার নেই।'

'বেশ।' মুরাদ সিরাজীর পাত্রে চুমুক দিতে থাকেন। আর কোন কথা বলেন না।

ঔরঙ্গজেবই প্রথম নৈঃশব্দ ভাঙ্গলেন। 'তাহ'লে তুমি প্রস্তুত আছ দারার বিরুদ্ধে লড়াই করতে?' সরাসরি বক্তব্যে নেমে পড়লেন তিনি।

'হ্যাঁ প্রস্তুত।' মুরাদ মাথা ঝাঁকিয়ে জানালেন।

'মনে রেখ, দারাই মসনদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ সুজা হেরে গিয়ে পালিয়েছে। সুতরাং দারার বিরুদ্ধেই তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আর আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি ত পত্রে আমার মনের কথা সবই তোমায় জানিয়ে দিয়েছি।' ঔরঙ্গজেব আস্তে আস্তে বললেন কথাগুলো।

'বুঝলাম। তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস করার কিছুই নেই।

কারণ তা না হলে তুমি আমার দলে যোগ দিতে না।' জড়িত স্বরে মুরাদ বললেন।

'ঠিকই ধরেছ।' ঔরঙ্গজেব মৃদু হেসে বললেন।

মুরাদ তার মাথাটাকে অসমর্থ ঘাড়ে সামলাতে সামলাতে পাত্রে আরো সিরাজী ঢেলে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি ভাবছি কি জান, দারা এরকম করতে পারে? বাদশাকে মেরে ফেলে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পর্যন্ত গোপন রেখেছিল! কিন্তু শেষ পর্যন্ত—'

হেঁচকি উঠে মুরাদের কথার স্রোত শেষ পর্যন্ত থামিয়ে দেয়।

ঔরঙ্গজেব দীর্ঘশ্বাস মোচন করে বললেন, 'সবই সম্ভব ভাই। হয়ত তাই হয়েছে। সেইজন্যেই দারা আগ্রা ছেড়ে কোথাও যায় নি? আর গেলেও দু-একবার, খুবই কম সময়ের জন্য। আমাদের দেখ, কোথায় সুদূরে—সুবা শাসনভার নিতে হয়েছে। আমাকে ত ক্রমাগত চাপের মধ্যেই রেখে দেওয়া হয়েছে। যাতে অন্য কোন দিকে চোখ না দিতে পারি। আমাকে হেয় করার চেষ্টাও কি সে কম করছে?

মুরাদ নিজের মনে শুধু টলমলে মাথাটা নাড়লেন যেন।

ঔরঙ্গজেব একবার মুরাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন, 'বাদশার মৃত্যুসংবাদ সে নিজের সুযোগমত ঘোষণা করেছে। ওঃ, আমি ভাবতে পারছি না, বাদশা আমাদের কত প্রিয় ছিলেন। আর তিনি শুধু বাদশাই ছিলেন না, তিনি আমাদের আব্বাজান। সেই প্রিয় বাদশাকে কি না—ওঃ, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তাকে কিনা এই ভাবে—। তুমি, তুমি পারতে মুরাদ?'

'কভি নেহি।' লাল চক্ষু তুলে ঔরঙ্গজেবের দিকে তাকিয়ে মুরাদ বললেন।

'আমি জানি তুমি পারতে না। তোমার মন অনেক উঁচু। কিন্তু দারা পেরেছে। এখন তুমিই ভরসা। সারা হিন্দুস্থানে তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। তুমিই পার দারাকে হটাতে।' ঔরঙ্গজেবের গলায় আন্তরিকতার স্বর।

সিরাজীর নেশায় বোজা চোখ নিয়ে ঔরঙ্গজেবের দিকে তাকালেন মুরাদ। তারপর জড়িত কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমি ত রাজী আছি। কিন্তু তোমার সাহায্য পাব ত ?'

'আমি ত জানিয়ে দিয়েছি ভাই। আমার সবরকম সাহায্যই তুমি পাবে। আমার সাহায্যের প্রথম কারণ, ইসলাম রক্ষা। দারা কাফের। সে থাকলে পবিত্র ইসলাম অপবিত্র হবে। দ্বিতীয় কারণ, উপযুক্ত লোক, অর্থাৎ তোমার মত উপযুক্ত লোকের মসনদের দাবিকে সমর্থণ করা।'

ঔরঙ্গজেবের কথা শুনে মুরাদের নিজের মনের সন্দেহও উড়ে যায় যেন। মাথাটার টাল সামলে নিয়ে মুরাদ বললেন, 'খুব ভালো কথা। এখন তাহলে আমাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

'আমি প্রস্তুত আছি।' ঔরঙ্গজেব বললেন।

'আমি ও এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

'তাহ'লে তাই চল।'

'কিন্তু শোন, মসনদ আমার। আমিই সমস্ত হিন্দুস্থানের মালিক।' আবার একটা হেঁচকি উঠে মুরাদের কথা থামিয়ে দেয়।

ঔরঙ্গজেব একটু হেসে বললেন, 'নিশ্চয়। এ মসনদ তোমারই। আগে বলেছি, আবার বলছি, মসনদের উপযুক্ত যদি কেউ থাকে, সে তুমি। আমার লোভ নেই। জান ত আমার কাছে একমাত্র খোদাই সব। খোদার দোয়াই আমার মসনদ।'

কথার শেষের দিকে ঔরঙ্গজেব উদাসী হয়ে যান যেন।

'বহুত আচ্ছা।' মুরাদ ওঠবার চেষ্টা করেন। ঔরঙ্গজেব বলে উঠলেন, 'কিন্তু ভাই, তোমাকে যে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সে কথা আগেই জানিয়েছি। আমার জন্যে একটা আলাদা জায়গা তোমাকে দিতে হবে, যেখানে বসে নির্বিঘ্নে খোদাকে ডাকতে পারব।'

'পাবে, কথা দিলাম।' মুরাদ ঢুলুঢুলু চোখে ঔরঙ্গজেবের দিকে তাকিয়ে বললেন।

'তোমার মহত্ত্বের তুলনা নেই।' ঔরঙ্গজেব আবার বললেন, 'আর একটা কথা ভাই, আমি যে তোমাকে সাহায্য করছি, এ কথা সবাই জানতে পারবে। রাজ্যের ভাগ পাচ্ছি না, এ কথাও জানতে পারবে। তাতে সবাই বলাবলি করবে মুরাদ ভাইকে ঠকিয়েছে। সেটা ঠিক শুনতে ভাল লাগবে না। আমিও সহ্য করতে পারব না। আমি ত জানি, তুমি ঠকাতে পার না। কিন্তু ঐ যে বললাম, লোকে বলবে।'

'কে বলবে? যে বলবে তার শির গর্দান থেকে নামিয়ে দেব।' তরবারিতে হাত রেখে মুারদ কথা বলতে বলতে দাঁড়িয়ে ওঠেন। কিন্তু শরীরের ওজন পা দুটি রাখতে অস্বীকার করায় আবার বসে পড়তে হ'ল।

'উত্তেজিত হয়ো না। লোকে কথা বলবে। আর তরবারিতে শির কাটা যায়, কিন্তু কথা কাটা যাবে না। বরং বেড়েই যাবে। তাই আমার মাথায় এক মতলব এসেছে, সেটা শোন। তাতে লোকের মুখও বন্ধ করা যাবে।' ঔরঙ্গজেব ধীরভাবে মুরাদকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

মুরাদ কি ভেবে নিয়ে বললেন, 'কি মতলব শুনি?'

'হ্যাঁ বলছি, শোন। আমরা খোদাতালাকে সাম্রাজ্য উৎসর্গ করে তারপর দু' ভাগ করে নেব।' ঔরঙ্গজেব জানালেন।

নিরুৎসুক ভাবে যেন মুরাদ বললেন, 'সাম্রাজ্য ভাগ করতে হবে?'

'নামেই ভাগ করা থাকবে, আসলে তুমিই থাকবে আমার ভাগেরও মালিক। তুমি ত জানই, সাম্রাজ্যের চিন্তায় আমি আর জড়াতে চাই না। ভেবে দেখ, এতে তোমার মহত্ত্ব বাড়বে।' ঔরঙ্গজেব মুরাদকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

মুরাদ প্রথমে একটু ইতঃস্তত করলেন। তারপর বললেন, 'আমিই সমস্ত হিন্দুস্থানের আসল মালিক থাকব বলছ?'

'তাই ত ঠিক হ'ল।' ঔরঙ্গজেব বলে চললেন, 'আমি নিজে থেকেই তোমার হাতে তুলে দেব। বলব, আমার আর রাজ্য শাসনের ইচ্ছা নেই।'

'ও।' মুরাদ সিরাজীর পাত্রে আবার সিরাজী পরিপূর্ণ করে নিয়ে চুমুক দিতে দিতে শব্দটা উচ্চারণ করলেন।

'আচ্ছা, এবার শোন। প্রথম দিকে আমি আমার অংশের শাসন চালিয়ে যাব। আর তুমি তোমার অংশের মালিক হয়েই নিজের মুদ্রা চালু করে দেবে এবং নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণাও করবে।'

'বেশ। কয়েক দিন বাদেই কিন্তু তোমার অংশেরও মালিকানা আমাকে দিয়ে দিতে হবে।' মুরাদ দোদুল মস্তকে জড়িত স্বরে বাধ্য হয়েই যেন মেনে নেন।

'সে কথা আর বলতে হবে না ভাই। এখন তুমিই ভাগটা কি রকম হবে তাই বল।' ঔরঙ্গজেব আশ্বস্ত হয়ে যেন বললেন। ভয় হয়েছিল, বুঝিবা মুরাদ গণ্ডোগোল পাকিয়ে বসে।

মুরাদ চুপ করে ভাববার চেষ্টা করেন। রিমিঝিমি নেশা মাথায় শুধু ঝিমিঝিমি বাজনা বাজায়। তবু একটা সিদ্ধান্তে

আমার চেষ্টা করতে থাকেন মুরাদ। তারপর নেশার কাছে অবনমিত মাথা তুলে বললেন, 'বেশ, ভাগই হোক তাহ'লে। লোকগুলোকে বোকা বানাতে হবে ত।' আবার একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'শোন, আমার ভাগে থাকবে, পাঞ্জাব, আফগানিস্থান, কাশ্মীর, আর—আর সিন্ধু। বুঝেছ। বাকীটা তোমাকে দিয়ে দিলাম।'

'ঠিক আছে।' ঔরঙ্গজেব সহাস্যে মেনে নিলেন।

একঢোকে সিরাজীর পাত্রটা নিঃশেষ করে পাত্রটা নামিয়ে রাখলেন মুরাদ। বললেন, 'একেবারেই দিয়ে দিলাম না অবশ্য। তোমার কথামত কিছুদিনের জন্য দিলাম। তাই ত?'

'আমি সেই কথাই বলেছি মুরাদ।' ঔরঙ্গজেব বললেন।

'বেশ। আর শোন, লুঠের জিনিষের ভাগও তুমি পাবে।' মুরাদ জড়িত স্বরে আরো জানালেন, 'অবশ্য সেগুলো আর তোমাকে ফেরৎ দিতে হবে না।'

'তোমার মহানুভবতা মুরাদ।'

মুরাদ একটু ঠেস দিয়ে বসলেন। হাত নেড়ে ঔরঙ্গজেবের স্তুতি যেন উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এবার ভাগটা কি রকম হবে শোন। লুঠের তিন ভাগের এক ভাগ নেব আমি। আর বাকীটা—'

বাকী কথা বলার অক্ষমতায় হাত নেড়ে মুরাদ যা বলতে চাইলেন ঔরঙ্গজেব তা বুঝে নেন। তিনি বললেন, 'তাই হবে। এইজন্যই ত তোমাকে সবাই এত পছন্দ করে। এ দিল্ শুধু বাদশারই হয়। তোমাকে বাদশা বলে কল্পনা করা আমার ভুল হয় নি।' ঔরঙ্গজেব একটু থামলেন। তাঁর স্তুতির কথাগুলো মুরাদের গলাধঃকরণ সিরাজীর সঙ্গে হজম করাতে চাইলেন। কিছু সময় বাদে আবার বললেন, 'তা হ'লে আমাদের যা ঠিক হ'ল

সেটা শুনে নাও—সমস্ত সাম্রাজ্য খোদাতালার নামে উৎসর্গ করা হবে—পাঞ্জাব, কাশ্মীর, আফগানিস্থান আর সিন্ধু তোমার অংশ, আর বাকীটা আমার। আর লুঠের জিনিষের তিন ভাগের এক ভাগ তুমি নেবে বলেছ এবং বাকী দু'ভাগ আমার। অতি সুন্দর ভাবে তুমি সমস্ত কিছু সাজিয়ে ফেলেছ মুরাদ।'

মুরাদ একটু জোরে হেঁচকির শব্দ তুলে টলমলে মাথা নিয়ে চুপ করে থাকেন।

ঔরঙ্গজেব একটা শ্বাস ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তাহ'লে সবই যখন ঠিক হয়ে গেল, এবার আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে মুরাদ।'

'হুঁ।'

'উদ্ধত, দুর্বিনীত কাফের দারাকে তার আচরণের সমুচিত জবাব দিতে হবে।' ঔরঙ্গজেব দৃঢ়স্বরে আবার বললেন।

'হুঁ।'

'মুরাদ, এবার শোন। তুমি তোমার বাহিনী নিয়ে মালোয়ারের দিকে এগোবে। নর্মদা নদীর ধারে তোমার সঙ্গে আমি আমার বাহিনী নিয়ে মিলিত হব।'

'ঠিক আছে।' মুরাদ সম্মতি জানালেন।

'একথা ভুলো না যেন।'

'মুরাদ কথা দিলে ভুলে যায় না।' মুরাদ জোর দিয়ে বললেন, 'তাহ'লে সমস্তই পাকা হয়ে গেল ত?'

'হ্যাঁ।'

হর্ষভরা প্রাণে ঔরঙ্গজেব নিজের মনে বললেন, ঔরঙ্গজেব, তোমার ভাগ্য এখনও সুপ্রসন্ন। ইচ্ছামত সমস্তই এখনও পর্যন্ত রূপ নিচ্ছে। এরপর খোদার দোয়ায় সফল হ'লেই হয়। তারপর—

তারপর? মনে মনে হাসলেন ঔরঙ্গজেব।

দশ

বাহাদুরগড়ে শাহজাদা সুজার বিপক্ষে জয়ের আনন্দে দারার মন তখনও ভরপুর।

দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল খুশীর আবেগে, নিরুদ্বিগ্নতার মাঝে। জাহানারা খুশী। শাজাহানও খুশী।

কিন্তু শাজাহান খুশী হলেও সম্পূর্ণ চিন্তা বিমুক্ত হ'তে পারেন নি। তার কারণ অবশ্য সহজেই অনুমান করা যায়।

এমনি একসময়ে দারা ফিরছিলেন নিজের প্রাসাদের দিকে। একাই বেরিয়ে ছিলেন তিনি। গুলমহম্মদ সঙ্গে থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু দারা আজ রাজী হন নি।

গুলমহম্মদ দারার নিজস্ব প্রাসাদের মহল্লার মধ্যে বহুদিন ডেরা বেধেছে। দারা সানন্দে অনুমতি দিয়েছিলেন স্বল্পবাক বিশ্বাসী গুলমহম্মদকে বসবাসের জন্য।

দারা একাই আসছিলেন। হঠাৎ পথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল হাইবাতের সঙ্গে।

ছিপ্‌ছিপে দোহারা চেহারার এই ভদ্রযুবকটি দারার খুবই প্রিয়। শাহী-বাহিনীতে থাকার সময় থেকেই সে দারার প্রতি অনুগত এবং শ্রদ্ধাশীল।

'তারপর হাইবাত, তোমার খবর ভাল ত?' দারা কুশল জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ শাহজাদা।' সবিনয়ে জবাব দিয়েছিল হাইবাত।

'বাড়ির সবাই ভাল আছে?' দারা আবার প্রশ্ন করেছিলেন।

'সবাই ভাল আছে।' পাশাপাশি ঘোড়াটা চালনা করে নিয়ে আস্তে আস্তে বললে হাইবাত।

'বেশ। শুনলাম, তুমি না কি ফৌজ ছেড়ে চলে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ শাহজাদা। দেহলীতে গিয়ে থাকব।' হাইবাত বিনম্র সুরে বললে।

'কি করবে সেখানে?'

'এখনও কিছু ঠিক করি নি শাহজাদা। তবে অমর সিং, ইউসুফ খাঁ, এদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা কিছু স্থির করব। আপনার মেহেরবানীতে আমার ত বর্তমানে বিশেষ কিছু অসুবিধা হবে না শাহজাদা।' আন্তরিকতার সঙ্গে বললে হাইবাত।

'আমার মেহেরবানীর কি আছে হাইবাত। সে যাই হোক, এই অমর সিং, ইউসুফ খাঁ, এদেরকে আমি চিনি বলে মনে হচ্ছে?' দারা বললেন।

'হ্যাঁ শাহজাদা। আপনি এদের ভাল করেই চেনেন।'

'আচ্ছা, তোমার এই বন্ধুদের মধ্যে ওসমান বলে একজন ছিল না?' দারা একটু পরিচিতদের স্মৃতি ঝালিয়ে নিতে চান যেন।

'এখনও আছে শাহজাদা।'

দারা একটু হাসলেন, বললেন, 'সবাই কি শাহজাদাকে ভুলে গেছে নাকি?'

'আপনাকে ভুলে যাওয়া খুব দুষ্কর শাহজাদা। আমাদের ত কম উপকার করেন নি আপনি। শুধু আমরা কেন, দেহলীর লোকেরাও আপনাকে কেউ ভোলে নি।'

দারার চোখ দুটি একটু খুশীতে চক্‌চক্ করে ওঠে। বললেন, 'যদি আমার দ্বারা তোমাদের কোন উপকার হয়ে থাকে, এ কথায় আমারই সবচেয়ে বেশী আনন্দ হচ্ছে হাইবাত।'

'আপনি মহানুভব শাহজাদা। যদি আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে আপনার কোন উপকারে আমরা লাগি, আমাদের জানাবেন শাহজাদা।' শ্রদ্ধাপূর্ণ স্বরে হাইবাত বললে।

দারা বললেন, 'তোমার কথা আমার মনে থাকবে হাইবাত।'

তাঁদের কথার মাঝে গুলমহম্মদ ঝড়ের মত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে উপস্থিত হ'ল।

দারা এ রকম ভাবে গুলমহম্মদের আগমনে বিস্মিত-কৌতূহলে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার গুলম্মদ? তুমি এ রকম ভাবে এসে উপস্থিত হ'লে?'

'শাহজাদা, বাদশা আপনাকে একটা জরুরী কথা বলার জন্ত আপনার মহলে খবর পাঠিয়ে ছিলেন, কিন্তু আপনি সেখানে না থাকায় আপনাকে যেখানেই হোক খবর দেওয়ার জন্য হুকুম জানিয়েছেন। তাই আমি—' গুলমহম্মদ কথাটা অসম্পূর্ণ রেখে থেমে গেল।

কি কথা? দারা নিজের মনেই যেন প্রশ্ন করলেন। তারপর হাইবাতের দিকে চেয়ে বললেন, 'তাহ'লে হাইবাত, মাঝে মাঝে দেখা কর আমার সঙ্গে, কেমন?'

'নিশ্চয়ই। শাহজাদা, আমি ভদ্রসন্তান। যে অবস্থায় পড়েছিলাম, আপনার মেহেরবানী না হ'লে কোথায় থাকতাম কে জানে! আপনার কাছে সময় পেলেই ছুটে আসব শাহজাদা।' কৃতজ্ঞতাপূর্ণ গলায় হাইবাত বললে।

'আচ্ছা, এবার চল গুলমহম্মদ।'

দারার সাথে গুলমহম্মদ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। হাইবাত কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে অপসৃয়মান দারার মূর্তির দিকে

চেয়ে রইল। তারপর ধীর গতিতে তার গন্তব্যস্থলের দিকে ঘোড়াটা চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

দারা যখন শাজাহানের ঘরে এসে উপস্থিত হ'লেন, তখন তাঁর হাবভাবে তাঁকে বিচলিত মনে হ'ল।

দানিশমন্দ খাঁ শাজাহানের সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও যেন বেশ চিন্তিত।

দারা ঘরে এসে দাঁড়াতে শাজাহান প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কোন খবর শুনেছ কি?'

'কি খবর বাদশা?' দারার একটু অবাক লাগে শাজাহানের প্রশ্নে।

'ঔরঙ্গজেব তার দলবল নিয়ে আগ্রার দিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। উদ্দেশ্য আমার সঙ্গে তার দেখা করা নয়, সেটা স্পষ্টই জানা গেছে।' শাজাহান বললেন।

দারা একটু হকচকিয়ে গেলেন খবরটা শুনে। কি বলবেন, প্রথমে তা ভেবে পান না।

দানিশমন্দ বললেন, 'আমাদের দেরী না করে ফৌজ পাঠান উচিত জাঁহাপনা।'

শাজাহান বললেন, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু কাকে পাঠান যায় তাই ভাবছি। সুলেমান থাকলে অনেক ভাল হ'ত।'

দানিশমন্দ বললেন, 'তাহ'লে কাসিম খাঁকে পাঠান যাক। আপনার কি অভিমত জাঁহাপনা?'

'কাসিম খাঁ? হ্যাঁ, যখন কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তাকেই পাঠাতে হবে। কিন্তু আর কাকে পাঠান যায়?'

দারা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন, 'রাজা যশোবন্ত সিংকেও পাঠান যেতে পারে, বাদশা।'

পরদিন ১৬ই এপ্রিল, তার ফল দেখা দিল প্রতিফলস্বরূপ।

লড়াই শুরুর আগে আরেক সমস্যা দেখা দিল। ধর্মের আর শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই এর সঙ্গে দুই প্রধানের মধ্যে শুরু হল অধিনায়কত্বের লড়াই। মন কষাকষির মাঝে যশোবন্ত সিং নিজেই সৈন্য সাজিয়ে নিলেন।

ঔরঙ্গজেব আর মুরাদের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আত্যাভিমানে দুর্বল—মূলতঃ অধিনায়কহীন বাহিনীর উপর।

প্রথমে তারা কোনমতে বাধা দিল, কিন্তু প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সে-প্রতিরোধ ক্ষমতাও আলগা হয়ে গেল।

কাসিম খাঁ কিছুটা এলোপাথারি লড়াই করে মনে কোন দ্বন্দ্ব না রেখে সেখান থেকে পালানই ভাল মনে করল।

বাকী রইল শুধু রাজপুতরা। সাহস ভরে তারা প্রতিপক্ষের উপর পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু স্তিমিত শক্তি নিয়ে তাদের বেশীক্ষণ লড়াই করার সামর্থ রইল না। মরতে মরতে তারা আট হাজার থেকে মাত্র ছ'শোতে এসে দাঁড়াল। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে অর্ধমৃত সেই দল লড়াই ছেড়ে রাজা যশোবন্তের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করল।

ধর্মাটের পরাজয়, দারারই পরাজয় ঘোষণা করল।

এরজন্য দুই সেনাধ্যক্ষ ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। মত বিরোধ, অধিনায়কত্বের দ্বন্দ্ব, হিন্দু মুসলমানের ঈর্ষা, রাজা যশোবন্তের দুর্বল রণকৌশল এনে দিল পরাজয়ের গ্লানি। অনায়াসসাফল্য এনে দিল ঔরঙ্গজেব আর মুরাদকে।

রাজা যশোবন্ত যোধপুরে ফিরে এলে তাঁর সহধর্মিনী মুখের উপর দুর্গের কপাট বন্ধ করে দিলেন। পরাজিত পলায়িত স্বামীর মুখ দেখতে চাইলেন না সেই গরবিনী।

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

দারা ভগ্নদূতের মুখে সমস্ত কিছু শুনলেন চুপ ক'রে। বিস্তৃত ভাবে সব কিছু জানতে পেরে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন দুই সেনাধ্যক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের খবরে। দুঃখ পেলেন পরাজয়ের সংবাদে। এখন কর্তব্য করণীয় সম্বন্ধে কিছু ভেবে পান না। তবে হ্যাঁ, তাঁকে আবার যুদ্ধযাত্রা করতে হবে।

ভগ্ন মনে তিনি শাজাহানের কাছে পরাজয়ের সংবাদটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য চললেন।

এ যেন আরও বেশী করে দ্বি-জাতি তত্বের অভিমান আর দ্বন্দ্বের ফল, বুঝতে পারছেন দারা। যেন অনুভব করতে থাকেন, তাঁর মনের সেই ইচ্ছার কথা—এমন এক পথ খুঁজে বার করতে হবে যে পরে এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব আর থাকবে না। নতুন আত্মশক্তি জেগে উঠবে। কিন্তু এখন সে ভাবনা বন্ধ রেখে দারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন।

শাজাহান খবরটা শোনার পর বলে উঠলেন, 'এবার আমি নিজে লড়াইএ নামব। আমি যদি এখনও লড়াইএ নামি, ঔরঙ্গজেব আর মুরাদের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে আমাকে হারাতে পারে।

দারার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। শাজাহানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, বাদশা। আপনার শরীরের এ অবস্থায় আপনাকে লড়াইএ যেতে দিতে পারি না। এবার নিজে যাব ঔরঙ্গজেব আর মুরাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে।'

শাজাহান তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'তুমি? না, না, তোমার

'রাজা যশোবন্ত সিং ?' শাজাহান মুখ তুলে চাইলেন দারার দিকে।

'হ্যাঁ, রাজা যশোবন্ত সিং।' দারা আবার বললেন।

'কিন্তু ওদের দুজনের বনি-বনা নেই, সেটা আমি জানি। সেইজন্য একটু ভাববার আছে। কারণ, লড়াই যারা পরিচালনা করবে, তাদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া থাকা দরকার।'

'কিন্তু আর কাউকেই ত দেখতে পাচ্ছি না। দুজনেরই যা একটু লড়াই সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে।' দারা বললেন।

'কিন্তু উপায় নেই যখন, তখন তাই করতে হবে। সুলেমান থাকলে অনেক ভাল হ'ত। এদের মাথার উপর তার থাকা উচিত। তাছাড়া লড়াই পরিচালনার ব্যাপারে যশোবন্ত দুর্বল।

'তাহ'লে আমি যাই।' দারা বললেন।

শাজাহান ইতঃস্তত করে বললেন, 'তুমি! তোমাকে ঠিক প্রয়োজন নেই। মানে, তোমার যাওয়ার প্রয়োজন নেই। ওরাই যাক। দানিশমন্দ, তুমি দুজনকে প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়তে বল।'

'যো হুকুম জাঁহাপনা।' দানিশমন্দ বললেন।

অভিবাদন জানিয়ে দানিশমন্দ চলে যেতে দারা বললেন, 'আবার অশান্তির শুরু হ'ল। শেষে ঔরঙ্গজেবও বিদ্রোহী হ'ল।'

'হুঁ।' আর কিছু বলেন না শাজাহান। শ্বেতসর্প—তার সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে চিন্তার জালে জড়িয়ে যাচ্ছিলেন শাজাহান।

শ্বেতসর্প ঔরঙ্গজেব! সে প্রথমবার একটু অগ্রসর হয়ে পেছিয়ে গেল কেন? আবার যখন অগ্রসর হচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই আঁট-ঘাট বেধেই সে এগুচ্ছে। কিন্তু কি জন্য? তা ভেবে শাজাহান ঠিক করতে পারছিলেন না। বড় চতুর ঔরঙ্গজেব।

এই কারণেই শাজাহান মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

কিন্তু এখন চুপ করে ফলাফলের অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই।

১৪ই এপ্রিল, ১৬৫৮ সাল।

উজ্জয়িনীর চোদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশিমে ধর্ম্মাটে দুই পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখী এসে দাঁড়াল।

ঔরঙ্গজেব, মুরাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইতিমধ্যে নর্মদা নদী পেরিয়ে অপর তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেইখানেই তাঁরা লড়াইএর জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

এদিকে মাড়োয়ার রাজ যশোবন্ত সিংএর কাছে খবর এসে পৌঁছল যে, ঔরঙ্গজেব একা নন, মুরাদও তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। সুতরাং প্রতিপক্ষ একজন নন—দুজন একত্রে।

রাজা যশোবন্ত খবরটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি খুব চিন্তায় পড়লেন। ভাবলেন, একবার কাসিম খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করলে হয়। কিন্তু আত্মগরিমা বাধা দিল।

রাজা যশোবন্ত আর কাশিম খাঁর মধ্যে বোঝাপড়া যে ছিল না, সেটা সত্যি। কিন্তু আগ্রা থেকে যাত্রা করার পর বনিবনাও হ'ল না।

সব থেকে জোরদার হয়ে দেখা দিল, হিন্দু মুসলমানের জাত্যাভিমান, আর মনে মনে ধর্মের বড়াই—ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বড়াইও শুরু হ'ল। দুই দল সেগুলোরই প্রমাণ করতে লেগে গেল নিজেদের মধ্যে। উদ্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের আগেই দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল রাজা যশোবন্ত সিং আর কাসিম খাঁর মধ্যে।

বিধাতা পুরুষ হাসলেন। সে হাসি দুজনের ক্ষতি না করুক, দারার ক্ষতি এনে দিল।

পরদিন ১৬ই এপ্রিল, তার ফল দেখা দিল প্রতিফলস্বরূপ।

লড়াই শুরুর আগে আরেক সমস্যা দেখা দিল। ধর্মের আর শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই এর সঙ্গে দুই প্রধানের মধ্যে শুরু হল অধিনায়কত্বের লড়াই। মন কষাকষির মাঝে যশোবন্ত সিং নিজেই সৈন্য সাজিয়ে নিলেন।

ঔরঙ্গজেব আর মুরাদের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আত্যাভিমানে দুর্বল—মূলতঃ অধিনায়কহীন বাহিনীর উপর।

প্রথমে তারা কোনমতে বাধা দিল, কিন্তু প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সে-প্রতিরোধ ক্ষমতাও আলগা হয়ে গেল।

কাসিম খাঁ কিছুটা এলোপাথারি লড়াই করে মনে কোন দ্বন্দ্ব না রেখে সেখান থেকে পালানই ভাল মনে করল।

বাকী রইল শুধু রাজপুতরা। সাহস ভরে তারা প্রতিপক্ষের উপর পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু স্তিমিত শক্তি নিয়ে তাদের বেশীক্ষণ লড়াই করার সামর্থ রইল না। মরতে মরতে তারা আট হাজার থেকে মাত্র ছ'শোতে এসে দাঁড়াল। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে অর্ধমৃত সেই দল লড়াই ছেড়ে রাজা যশোবন্তের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করল।

ধর্মাটের পরাজয়, দারারই পরাজয় ঘোষণা করল।

এরজন্য দুই সেনাধ্যক্ষ ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়। মত বিরোধ, অধিনায়কত্বের দ্বন্দ্ব, হিন্দু মুসলমানের ঈর্ষা, রাজা যশোবন্তের দুর্বল রণকৌশল এনে দিল পরাজয়ের গ্লানি। অনায়াসসাফল্য এনে দিল ঔরঙ্গজেব আর মুরাদকে।

রাজা যশোবন্ত যোধপুরে ফিরে এলে তাঁর সহধর্মিনী মুখের উপর দুর্গের কপাট বন্ধ করে দিলেন। পরাজিত পলায়িত স্বামীর মুখ দেখতে চাইলেন না সেই গরবিনী।

কিন্তু সে কথা এখন থাক।

দারা ভগ্নদূতের মুখে সমস্ত কিছু শুনলেন চুপ ক'রে। বিস্তৃত ভাবে সব কিছু জানতে পেরে মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন দুই সেনাধ্যক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের খবরে। দুঃখ পেলেন পরাজয়ের সংবাদে। এখন কর্তব্য করণীয় সম্বন্ধে কিছু ভেবে পান না। তবে হ্যাঁ, তাঁকে আবার যুদ্ধযাত্রা করতে হবে।

ভগ্ন মনে তিনি শাজাহানের কাছে পরাজয়ের সংবাদটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য চললেন।

এ যেন আরও বেশী করে দ্বি-জাতি তত্বের অভিমান আর দ্বন্দ্বের ফল, বুঝতে পারছেন দারা। যেন অনুভব করতে থাকেন, তাঁর মনের সেই ইচ্ছার কথা—এমন এক পথ খুঁজে বার করতে হবে যে পরে এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব আর থাকবে না। নতুন আত্মশক্তি জেগে উঠবে। কিন্তু এখন সে ভাবনা বন্ধ রেখে দারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন।

শাজাহান খবরটা শোনার পর বলে উঠলেন, 'এবার আমি নিজে লড়াইএ নামব। আমি যদি এখনও লড়াইএ নামি, ঔরঙ্গজেব আর মুরাদের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে আমাকে হারাতে পারে।

দারার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। শাজাহানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না, বাদশা। আপনার শরীরের এ অবস্থায় আপনাকে লড়াইএ যেতে দিতে পারি না। এবার নিজে যাব ঔরঙ্গজেব আর মুরাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে।'

শাজাহান তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'তুমি? না, না, তোমার

যাবার কোন দরকার নেই। ঔরঙ্গজেব রণকৌশলী। সে তুলনায় তোমার লড়াই সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অনেক কম। তুমি পারবে না ঔরঙ্গজেবের চালের জবাব দিতে। মুরাদ যদিও আছে তার সঙ্গে, কিন্তু লড়াই চালাবে ঔরঙ্গজেবই। না, তুমি থাক। আমিই যাব।'

দারা শাজাহানের কথায় একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। তার উপর বাদশার এতখানি অবিশ্বাস তিনি ভাবতে পারেন নি। তিনি চুপ করে রইলেন।

শাজাহান বললেন, 'তাছাড়া সিপাহীরা আজও আমায় ভালোবাসে।'

দারা অস্ফুটে বললেন, 'আমাকেও সবাই ভালোবাসে বাদশা।'

শাজাহান একটু চুপ করে রইলেন। দারার মনে লেগেছে তাঁর কথাটা, তা তিনি বুঝতে পারেন। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখ দারা, তোমাকে মনে আঘাত দেবার জন্য আমি বলি নি কিছু। তোমাকে আমি স্নেহ করি। তবে কি জান, এ লড়াই ঠিক আমার বিরুদ্ধে নয়—তোমারই বিরুদ্ধে। সেইজন্য তোমাকে জেতাবার চেষ্টাই আমি করছি।'

দারাকে নিরুত্তর দেখে শাজাহান আবার বললেন, 'তুমি খুব মহান, তোমার মন খুবই ভাল। তুমি ভাব, সবাই তোমাকে ভালবাসে। কিন্তু সত্য তোমাকে জানতে হ'লে এই কথাই তোমাকে জানতে হবে—তা নয়। এতে দুঃখ পেও না, তোমাকে ওয়াকিবহাল করিয়ে দিচ্ছি মাত্র।'

একটানা কথা বলার পর শাজাহানের যেন হাঁপ ধরে। তবু তিনি একটু দম নিয়ে আবার বললেন, 'সেইজন্য তোমার পক্ষে যা সম্ভব নয়, আমার পক্ষে তা সম্ভব!'

'কিন্তু আপনার এ শরীরে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া আপনার আমার ওপর এত অবিশ্বাস থাকলে, আমার সে বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। নচেৎ আমাকে অন্য পথ দেখতে হবে। তাতে লড়াই করার আর দরকার হবে না।'

'তুমি কি বলতে চাইছ দারা?' একটু শঙ্কিত হয়ে ওঠেন শাজাহান।

দারা বললেন, 'এ রকম ভাবে আড়াল করে থাকার মধ্যে অপমান আছে বাদশা। আমি তা থেকে মুক্তি নেব।'

জাহানারা এতক্ষণ চুপ করে দুজনের কথাবার্তা শুনছিলেন। এবার বলে উঠলেন, 'দারার ওপর আপনার এতটা অনাস্থা রাখা উচিত হচ্ছে না বাদশা। ও যখন চাইছে, আপনার অনুমতি দেওয়াই উচিত।'

'কিন্তু জাহানারা, দারার যাতে ক্ষতি না হয়, তাই আমি চাইছি। ঔরঙ্গজেব রণকৌশলী। তার বিরুদ্ধে ভালভাবে পাল্টা জবাব তৈরী রাখতে হবে, সে কথা আগেই বললাম।'

'সে কাজ দারাও পারবে। আপনি সে সম্বন্ধে ভাববেন না।' জাহানারা বললেন।

'কিন্তু—' ক্ষীণস্বরে বললেন শাজাহান।

'কোন কিন্তু নেই বাদশা। আপনি দেখবেন, শ্বেতসর্পের ফণা ঠিক গুঁড়িয়ে দিতে পারবে দারা। আপনি দ্বিধা না রেখে দারাকে দায়িত্ব দিয়ে দিন। দারা নিজেই উপযুক্ত জবাব দিক।' জাহানারা দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন।

দারা বললেন, 'এ না হ'লে আমি নিজের কাছে বড় ছোট হয়ে যাব। সেটা সহ্য করা বড় কষ্ট হবে।'

শাজাহান দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে মেনে নিয়ে বললেন, 'বেশ তাই হবে।'

জাহানারা দারাকে বললেন, 'তোমার যশোবন্ত সিং আর কাশিম খাঁকে পাঠাবার আগে ভেবে নিয়ে আরো শক্তিশালী বাহিনী পাঠান উচিত ছিল।'

শাজাহান দারার হয়ে জবাব দিলেন, 'কোন উপায় ছিল না জাহানারা। তাছাড়া মুরাদ যে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, সেটা জানা যায় নি তখন।'

'তাছাড়া নিজেদের মধ্যে বড়াই আর মানসিক লড়াইএ দুর্বল হয়ে পড়েছিল আমাদের সৈন্যবাহিনী।' দারা বললেন।

'সে সব কথা এখন ভেবে লাভ নেই। দানিশমন্দকে আসতে বল আমার কাছে।' শাজাহান বললেন।

দারা বলে উঠলেন, 'আমি তাঁকে খবর পাঠিয়েছি বাদশা।'

'শোন দারা, আগামী লড়াইএ মনে রেখ, প্রতিপক্ষ তোমার চেয়ে শক্তিশালী। যা করবে, খুব ভেবে চিন্তে করবে। আমার শুধু এইটুকু বলার আছে।' শাজাহান বললেন।

দারা নীরবে রইলেন।

শাজাহান একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাজমহলের দিকে চেয়ে রইলেন।

জাহানারা একবার শাজাহানের দিকে চেয়ে নিয়ে দারাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দারা, ঔরঙ্গজেবকে এমন শাস্তি দিও, যেন সে জীবনে আর লড়াই করতে না চায়।'

দারা শুধু মুখ তুলে চাইলেন। কিছু বললেন না।

দানিশমন্দের আসার খবর পেয়ে জাহানারা পর্দার অন্তরালে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন।

দানিশমন্দ একা আসে নি, সঙ্গে ছিল ওমরাহ হাকিম দাউদ খাঁ।

তুজনের অভিবাদনান্তে শাজাহান বললেন, 'দানিশমন্দ, তুমি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছ?

'হ্যাঁ জাঁহাপনা, ধর্মাটের তুঃসংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে। শুনে খুবই তুঃখ বোধ করছি।' দানিশমন্দ আন্তরিকতা নিয়ে কথাগুলো বললেন।

'হ্যাঁ, খুবই তুঃখ পেয়েছি।' বিশেষ কিছু বলার না পেয়ে হাকিম দাউদ সায় দেওয়াই ঠিক মনে করেছিল যেন।

শাজাহান হাকিম দাউদের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দানিশমন্দকে আবার বললেন, 'সুতরাং আর দেরী না করে আবার প্রস্তুত হ'তে হবে। আমি নিজেই লড়াইএ নেমে পড়তাম, কিন্তু আমার এ শরীরে আর সম্ভব নয়। পারলে ভালই হ'ত।'

'সত্যিই জাঁহাপনা, আপনার এ শরীরে সম্ভব নয়। তবে আপনার মত মহান বাদশা লড়াইএ নামলে নিশ্চয়ই ভাল হ'ত, একথা নিশ্চিত বলা যায়।' হাকিম দাউদ যেন প্রাণহীন তোষণ করতে চেষ্টা করে।

দানিশমন্দ সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, 'সমস্ত ব্যবস্থা কি এত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হবে?'

'কিন্তু সময় যে বেশী নেই, দানিশমন্দ।' শাজাহান বললেন।

'তা আমি বুঝতে পারছি জাঁহাপনা। তাড়াতাড়ি শিক্ষিত সিপাহী কি পাওয়া যাবে? তাছাড়া নূতন যাদের নেওয়া হবে, তাদেরও ত শিক্ষার প্রয়োজন জাঁহাপনা।' নম্র সুরে দানিশমন্দ অসুবিধা ব্যক্ত করলেন।

'আমি জানি দানিশমন্দ। কিন্তু উপায় নেই।' শাজাহান বললেন।

'সত্যিই উপায় নেই।' হাকিম দাউদ শাজাহানের কথার ধুয়ো ধরলেন।

দানিশমন্দ একটু বিরক্ত হ'ন যেন হাকিম দাউদের ওপর। তিনি কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন, 'যো হুকুম জঁাহাপনা।'

দারা বললেন, 'দেখবেন, যেন দেরী না হয়।'

'না শাহজাদা, দেরী হবে না। এখুনি তার ব্যবস্থা করছি। সময় পেলে ভাল হ'ত, কিন্তু নেই যখন, কি আর করা যাবে।' দানিশমন্দ বললেন।

'বেশ, তাই করুন।' দারা বললেন।

দানিশমন্দ একটু ইতঃস্তত করে বললেন, জঁাহাপনা, যদি অনুমতি দেন, তাহ'লে একটা কথা নিবেদন করব।'

'বল শুনি।' শাজাহান অনুমতি দিলেন।

'জঁাহাপনা, বাহাদুর গড়ের বিজয়ী দলের জন্য আমাদের অপেক্ষা করলে ভাল হ'ত বলে আমার মনে হয়। সদ্য জয়ে তাদের আত্মশক্তি বেড়েছে। তারা থাকলে দলের শক্তিও বাড়বে।'

দারা একটু রূঢ়ভাবে বলে উঠলেন, 'তা হয় না দানিশমন্দ। আমি সে কথা ভাবি নি বলতে চান? কিন্তু সময় নেই। দেরী না করে আপনার নিজের কাজ ভালভাবে করুন, তাহ'লেই হবে।'

শাজাহান চকিতে দানিশমন্দ এবং দারাকে দেখে নেন। দারার রূঢ়তা তাঁরও ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে দারার এই রূঢ় আচরণই ওমরাহদের অনেক ক্ষেত্রে অসন্তুষ্টির কারণ, শাজাহান তা জানেন। তাছাড়া দানিশমন্দ ভাল কথাই বলেছে, দারার শুভাকাঙ্খী সে। দারা এখনও লোক চিনতে পারে নি।

হাকিম দাউদ বললে, 'সত্যিই ত। শাহজাদা কি সে কথা ভাবেন নি দানিশমন্দ? নিশ্চয় ভেবেছেন। ভেবেই ত বলছেন।'

দানিশমন্দ আবার হাকিম দাউদের দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টি ফেললেন,

তারপর তিনি বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, 'শাহজাদা, আমি যা ভেবেছিলাম তাই বলেছি। আমায় মাফ করবেন।'

দারার কথায় দানিশমন্দ মনে মনে আহত হয়েছিলেন। তাঁর গলার স্বরে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

শাজাহান তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, 'না, না, দানিশমন্দ। তুমি ভাল কথাই বলেছ। যদি অপেক্ষা করা যেত তাহ'লে ভালই হ'ত। কিন্তু তাদের অনিশ্চয়তার ওপর ত ভরসা করা যায় না। দারা বিচলিত হয়ে পড়েছে।'

দানিশমন্দ বললেন, 'তা ঠিক, জাঁহাপনা।'

'শোন, দারার ওপরেই আমি নেতৃত্ব দিয়েছি।' শাজাহান কথাটা জানিয়ে দিলেন।

'শাহজাদার ওপর ভার যখন পড়েছে, তখন জয় সুনিশ্চিত।' হাকিম দাউদ বলে ওঠে।

'তাহ'লে জাঁহাপনা, আমি যাই। ওদিকের ব্যবস্থা করতে হবে।' দানিশমন্দ বললেন।

'হ্যাঁ যাও।' শাজাহান কথাটা বলে প্রস্থানোদ্যত হাকিম দাউদের উদ্দেশ্যে আবার বলে উঠলেন, 'দাউদ, তুমি কি আমায় কিছু বলতে এসেছিলে?'

হাকিম দাউদ আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে বললে, 'হ্যাঁ—মানে, না জাঁহাপনা।'

'অর্থটা পরিস্কার হ'ল না দাউদ।' শাজাহান শয্যায় শুতে শুতে বললেন।

'দানিশমন্দ আপনার কাছে আসছে শুনে আমি বললাম, আমিও যাব। আর এই সুযোগে আপনাকে দর্শনও করতে পারব।' হাকিম দাউদ আরও বললে, 'আপনাকে দর্শন করাও ত কম সৌভাগ্য নয়।'

'তাহ'লে নিছক দর্শন করার উদ্দেশ্যেই এসেছিলে ?' একটু ব্যঙ্গ করে শাজাহান বললেন।

'অনেকটা তাই। মানে, উদ্দশ্যে তাই ছিল।' হাকিম দাউদ বললে।

'উদ্দেশ্য তাই ছিল মানে ?' শাজাহান প্রশ্ন করলেন।

'মানে, আমি জাঁহাপনা—আপনার—' হাকিম দাউদ থই পায় না যেন।

শাজাহান বললেন, 'ঠিক আছে, যাও এবার।'

দারা বলে উঠলেন, হাকিম সাহেব, যা বলবেন তা একটু গুছিয়ে বলুন। চালাকী করার চেষ্টা করবেন না।'

'যো হুকুম শাহজাদা।' হাকিম দাউদ খাঁ বলে ওঠে।

শাজাহান হাসি চেপে বললেন, 'তুমি যাও এবার।'

দানিশমন্দ আর হাকিম দাউদ কুর্নিশ করে চলে যাবার পর জাহানারা পর্দার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করলেন।

শাজাহান সামনের অলিন্দ দিয়ে তাজমহলের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে থাকেন।

তারপর হঠাৎ সেই ঘরের স্তব্ধতা ভেঙ্গে বলে উঠলেন, 'দারা, মনে হচ্ছে একটা পথ পেয়েছি।'

'কিসের বাদশা ?' দারা কৌতূহলী হয়ে ওঠেন।

'এই বিরোধ মীমাংসার পথ আর কি ?'

'কি ক'রে ?' দারা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শাজাহানের দিকে চাইলেন।

'হ্যাঁ, এ পথে আমি ঠিক একটা মীমাংসা করতে পারব।' শাজাহান একটু উৎসাহিত হয়ে ওঠেন যেন

'কিন্তু কি করে করবেন বাদশা ?' দারা আবার প্রশ্ন করলেন।

'শোন, আমি ঔরঙ্গজেবকে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য

বলে পাঠাব। আমার কথা সে ফেলতে পারবে না। তারপর আলোচনা ক'রে একটা পথ বার হবেই।' শাজাহান বললেন।

দারা একটু হতবম্ভ হয়ে গেলেন প্রথমে। তারপর বললেন, 'আপনি ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আলোচনা করে বিরোধ মীমাংসা করতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ। তাতে সমস্ত দ্বন্দ্বের শেষ হবে।' শাজাহান বললেন।

'বাদশা, আমি কি কোন অন্যায় করেছি, অথবা এই বিরোধ নিজে সৃষ্টি করেছি?' দারা প্রশ্ন করলেন।

'না, তা নয়। তুমি কিছু কর নি ঠিক। যদি মিটিয়ে ফেলা যায় তাহ'লে ভালই হয়।' শাজাহান ইতঃস্তত করে বোঝাবার চেষ্টা করেন দারাকে।

'কিন্তু এ ভাবে মেটানোর পথকে আমি সমর্থন করতে পারি না বাদশা।' দারা দৃঢ় স্বরে প্রতিবাদ জানান, 'ঔরঙ্গজেবকে তার হঠকারিতার ফল পেতেই হবে।'

'ঠিক।' জাহানারা বেগম সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে কোন রকম আলোচনাই হতে পারে না। ঔরঙ্গজেবকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে তা হ'লে। আর সে এত ধূর্ত্ত আর নীচ যে তার সঙ্গে মীমাংসা করলে ভবিষ্যতে সে আর কিছু করবে না— তা কি করে বলা যায়? না বাদশা, সে চিন্তা করবেন না।'

'কিন্তু জাহানারা, এ বিরোধ ভাল নয়। মিটিয়ে ফেলা উচিত। নইলে আরো খারাপ কিছু হতে পারে।' শাজাহান বোঝাতে চেষ্টা করেন কন্যাকে।

'না বাদশা। ঔরঙ্গজেব বিদ্রোহী, তাকে দমন করব। তার সঙ্গে মীমাংসা যুদ্ধক্ষেত্রে হবে। শাস্তি যার প্রাপ্য, আপ্যায়ন করে তাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত নয়।' দারা বললেন।

'কিন্তু তুমি ভাবছ না। আবার বলছি একটু ভাব। এতে তোমার ভালই হবে।' শাজাহান বললেন।

'আমি ভেবেছি বাদশা। আমার ভালো হবে যদি আপনি এ ব্যবস্থা না করেন। আমি তার সঙ্গে শুধু আলোচনা করে প্রাণ ভিক্ষা চাই না।'

'দারা যা বলছে শুনুন বাদশা।' জাহানারা বললেন।

'কিন্তু'! শাজাহান দুর্বলভাবে তাঁর কথার যৌক্তিকতা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু জাহানারা বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'শ্বেতসর্পের বিষকুণ্ডলী ভেঙ্গে তাকে নির্জীব করে দেওয়াই উচিত। দারা আপনার উত্তরাধিকারী। সুতরাং তার কথা আপনার শোনা উচিত।'

শাজাহান একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বললেন, 'দারা, ভাবাবেগে কিছু কাজ করা যায় না। আজকের বিরোধে বাদশা শাজাহান গৌণ—এ লড়াই মসনদের, আমি জানি। তাই তোমার ভালর জন্যই বলছিলাম। ধর যদি তোমার ভাগ্যের দোষে অন্য কিছু ফলাফল হয়, তারপরে কি হবে ভেবেছ? সেটা কি আমি সইতে পারব।'

'তবু আমি মানতে পারব না বাদশা।' দারা বললেন।

'আপনাকে আমরা তা করতেও দেব না।' জাহানারা বললেন দারার পক্ষ নিয়ে।

শাজাহান কথাগুলি বলে যেন হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'বেশ, দারার যখন মত নেই, তোমাদের কারো যখন মত নেই, তখন তাই হবে। তুমি জয়লাভ কর, খোদার কাছে এই কামনাই করি।

শাজাহান একটু পরে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কোন্ কোন্ সেনাধ্যক্ষদের সঙ্গে নেবে ভেবেছ ?

দারা একটু চিন্তিত স্বরে বললেন, 'না, এখনও ভাবি নি। কিছুই ঠিক করতে পারছি না বাদশা।'

'মাথা ঠিক রেখে কাজ কর দারা। এ ভাবে বিচলিত হয়ে বুদ্ধি হারিয়ে ফেললে ত চলবে না।' শাজাহান দারার মনের খবর জানেন বলেই বললেন কথাগুলো।

'হ্যাঁ। তবে একজনকে নেব বলে ঠিক করেছি।' দারা নত দৃষ্টিতে চিন্তার কুঞ্চন কপালে নিয়ে বললেন।

'কে সে ?' শাজাহান প্রশ্ন করলেন।

দারা মুখ তুলে একটু বিমর্ষ হাসি হেসে বললেন, 'আমার খুব প্রিয় সে।'

'তোমার খুব প্রিয় ?'

'হ্যাঁ।'

'তার নামটা বল।' জাহানারা কৌতূহলী হ'য়ে বললেন।

'সিপির।' দারা জানালেন।

'সিপির!' জাহানারার দুচোখে বিস্ময় প্রকট হয়ে ওঠে।

শাজাহান নীরবে দারার দিকে দৃষ্টি ফেললেন। ক্রমশঃ বিমর্ষতার ছায়া যেন ছড়িয়ে পড়ে শাজাহানের মুখাবয়বে।

দারা বললেন, 'হ্যাঁ, সিপির আমার সঙ্গে থাকবে।'

'কিন্তু সে যে ছেলেমানুষ। না, সে কি করে হয় ?' জাহানারাও একটু বিচলিত হয়ে ওঠেন ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য।

'বাদশার বংশে লড়াইয়ে না যাবার মত ছেলেমানুষ সে নয়।' দারা বললেন।

'কিন্তু নাদিরা! সে কি ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে? তাছাড়া

আ—আ—মিও ঠিক মত দিতে পারছি না লড়াইয়ে যাবার ।' জাহানারার স্বর একটু কেঁপে ওঠে। আরো বললেন প্রতিবাদ জানানর জন্য, 'সিপির কি জানে লড়াইএর ? না, ও যাবে না।'

'লড়াই জানে না, শিখবে।' একটু হেসে দারা বললেন, 'না, দেখ ও ঠিক পারবে।'

'আর নাদিরা?'

'তার মত আমি করিয়ে নেব। আচ্ছা, আমি এবার যাই বাদশা।' দারা অনুমতি চাইলেন।

শাজাহান কোনমতে ঘাড়টা নেড়ে অনুমতি জানালেন।

শাজাহান সিপিরের নামটা শোনার পর থেকে দারার চলে যাওয়া পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নি। এবার ক্ষীণস্বরে শুধু জাহানারাকে প্রশ্ন করলেন, 'জাহানারা, সিপিরের এখন কত বয়স হ'ল বল ত?'

জাহানারা বিষাদমাখা মুখে বললেন, 'চোদ্দ।'

'হুঁ।' শাজাহান আস্তে আস্তে মাথাটা মমতাজের স্মৃতিমহলের দিকে ঘুরিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, 'জাহানারা, আমার হাতে আপেলের গন্ধটা এখনও আছে কি?'

জাহানারা বললেন, 'আছে বাদশা।'

'থাকলেই ভাল। কিন্তু জাহানারা, আমার মনটা মাঝে মাঝে বড় উতলা হয়ে উঠছে কেন?' শাজাহান বললেন।

জাহানারা কিছু বললেন না। নীরবে মাথাটা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন শায়িত সম্রাটের পাশে। দারার এই সিদ্ধান্ত জাহানারারও ভাল লাগে নি।

'সিপির লড়াইএ যাবে?' বিস্মিত নাদিরা বলে উঠল! নিজের কানকে সে যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

'হ্যাঁ নাদিরা। তোমার কাছে আসার আগে সিপিরকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। সে খুশী মনে মত দিয়েছে।' দারা বললেন।

'কিন্তু আমি মত দিতে পারছি কই ?' নাদিরার চোখে জল জমে ওঠে।

'তুমি ভেব না নাদিরা। আমি ত তার পাশেই থাকব।' দারা সান্ত্বনা দেবার জন্য বললেন।

নাদিরা অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে দারার দিকে চেয়ে বললেন, 'সুলেমান এখনও ফেরে নি। আপনি লড়াইএ যাবেন—সঙ্গে সিপিরও যাবে বলছেন। আমি কাদের নিয়ে থাকব ?'

'কেন, আমলউন্নিসা, পাকনিহাদ বানু—এরা রইল ত। আর তোমার বহিনও রইল।' দারা বললেন।

'কিন্তু বহিনের মনের যত জোর আছে, আমার তা নেই শাহজাদা। আমার ভয় করছে। আমি ভাবতে পারছি না, আমার সিপির লড়াইয়ে যাচ্ছে।' সদা নিজের সংসারের আগল লক্ষ্য করে চলতে চলতে আজ যেন তার আগল ভেঙে পড়বার ভয়ে সন্ত্রস্থ নাদিরার চোখ থেকে শঙ্কায় জল ঝরে পড়ে।

দারা, নাদিরার চোখের জলের ধারা মুছে দিয়ে বললেন, 'সিপিরকে তোমরা যতখানি অক্ষম ভাবছ, সে ততখানি নয়। আমি সেটা ভাল ক'রেই জানি। তাছাড়া আমারও ত একজন খুব কাছের লোক দরকার। সিপির ছাড়া আর কাকে পাব বল ?'

'শুধু সিপির কেন, আপনিও ত না গেলেই পারেন। অন্য কেউ যাক।' নাদিরা করুণ স্বরে আকুতি জানালে।

'তা কি ক'রে হয়। আমি না গেলে ধর্মাটের অবস্থা আবার হ'তে পারে। যেতে আমাকে হবেই নাদিরা।' দারা বললেন।

'কিন্তু আপনার যদি কিছু হয়—সিপিরের যদি কিছু হয়

'নাদিরা, আমার কিছু হ'লে যতটা কষ্ট না হবে, যদি সিপিরের কিছু হয়, আমার দুঃখ শতগুণ বেশি হয়ে উঠবে। আমার কি সন্তানের ওপর মমতা নেই। আমি কি তাদের ভালোবাসি না বলে ভাব?' দারা একটু গম্ভীর ভাবে বললেন কথাগুলো।

না, নাদিরা তেমন কথা বলতে পারবে না। দারার মন সে জানে। আর সে যে কত কোমল তাও জানে।

প্রথমতঃ মনে পড়ে—

মনে পড়ে তাদের সেই সন্তানের কথা। দারা আর নাদিরার সেই ফুটফুটে প্রথম মেয়েটির কথা।

তার জন্মের পর শাজাহান ওমরাহদের সাথে নিয়ে নাতনীর মুখ দেখতে এসেছিলেন দারার প্রাসাদে। খানাপিনাও করেছিলেন। দু'লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন জন্মোৎসব পালনের জন্য।

দারা খুশীতে যেন উপচে পড়ছিল। সেদিন মেয়েকে নিয়ে কি করবেন ভেবে পান নি।

তারপর শাজাহানের সাথে রওনা হয়েছিলেন লাহোরের পথে। সাথে জাহানারাও ছিলেন।

কিন্তু ইদ-উল্-ফিতরের দিন মাত্র দু'মাস বয়সে পিতামাতার স্নেহ কুড়িয়ে বিদায় নিল সে পৃথিবী থেকে।

খবর পৌঁছল দ্রুত বেগে। পথের মাঝে বেটীর মৃত্যু সংবাদের আঘাতে প্রচণ্ড জ্বর আর হৃদয় দৌর্বল্যে অসুস্থ হয়ে পড়লেন দারা।

সেই অসুস্থতা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্রাটের। লাহোর থেকে শাজাহানের জরুরী এত্তেলা পেয়ে হাকিম ওয়াদের খাঁ এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু শাজাহান তাতেও সন্তুষ্ট থাকেন

নি। দারার তাঁবু জাহানারার তাঁবুর কাছে তাঁর হুকুমে রাখা হ'ল। যাতে জাহানারা দারার সেবা শুশ্রূষা করতে পারেন।

দারার রোগমুক্তির জন্য শাজাহান দান করেছিলেন অকাতরে।

নাদিরার মনোকষ্ট আরেকজনের জন্য উদ্বিগ্নতায় পরিণত হয়েছিল।

নাদিরা সে কথা মনে আনে নি। যতটুকু সে বলেছে শুধু সিপিরের জন্য নয়, সকলের জন্য। সে তার মমতা দিয়ে ঘিরে রাখতে চায় প্রিয়জনদের, তার উষ্ণ হৃদয়ের মাঝে।

নাদিরা সজল দুটি চোখ মেলে মৃদুস্বরে বললে, 'শাহজাদা, এ লড়াই কি শেষ হবার নয়?'

'নাদিরা, এ লড়াই এবার শেষ হবে। হয় আমার জিত, আর তা না হ'লে—'

দারার মুখে হাত চাপা দিয়ে নাদিরা বললে, 'না, আপনার জয় হবেই।' তারপর আস্তে আস্তে দারার সামনে বসে তার দিকে চেয়ে অস্ফুটে বলে, 'শাহজাদা, কি লাভ এ লড়াইএ। নাইবা রইল আমাদের মসনদ।'

'নাদিরা।' দারা একটু উষ্ণ হয়েই দাঁড়িয়ে ওঠেন, 'এ লড়াইএ লাভ হচ্ছে আমার সম্মান। সে কথা তুমি ভুলে যেও না যেন।'

তারপর একটু পায়চারী করে নিজেকে একটু শান্ত করে বললেন, 'মাঝে মাঝে আমিও ভাবি নাদিরা, কি লাভ এ মসনদে? আবার ভাবি, আমার অধিকার, আমার সম্মান আমি ছেড়ে দেব কেন? নষ্টই বা করব কেন? আচ্ছা, আমি যাই এবার?'

আর দাঁড়ান নি দারা। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নাদিরা সজল চোখে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বার বার চেষ্টা করে

মনকে বোঝাবার, এত ভয় কেন আমার ? বাদশার ছেলে লড়াইএ যাবে, এতে চিন্তার কি আছে ? আর শাহজাদা—পৃথিবীতে তাঁর থেকে বড় নাদিরার কাছে আর কে ? তাঁর সব কিছু নিয়েই ত সে সার্থক হবে।

কিন্তু মন থেকে যে শঙ্কা মোছে না। মমত্বের সন্ত্রস্থতা বুক থেকে নামতে যেন চায় না যে।

আগামী কাল যাত্রা শুরু হবে। ঔরঙ্গজেব আর মুরাদের সঙ্গে মোকাবিলা হবে যুদ্ধক্ষেত্রে। ফলাফলের দুটি দিক রয়েছে ভবিষ্যতের গর্ভে। কে জানে, দারার ভাগ্যে কোন্‌টা জুটবে ?

চিন্তামগ্ন দারা ইতঃস্তত আগ্রার পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কৃপাপ্রার্থীদের সামান্য কিছু সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তাদের সে বাসনা পুরণ করে সাহায্যও পাঠান হ'য়েছে। শুধু আগামী দিনের চিন্তাই মনে বর্ত্তমান। কিন্তু থই পাচ্ছেন না যেন সেই চিন্তার আবর্তে।

মন্থর বেগে দারার ঘোড়াটা তাঁকে নিয়ে চলছিল। তাঁর পেছনে আরেক সওয়ারী—গুলমহম্মদ চুপ করে অনুসরণ করছিল মনিবকে।

রাত্রি কিছুটা হ'য়েছে। রাত্রির গভীরতার যেন নিঃশব্দ এক ভাষা আছে—স্তব্ধতা যেন বেড়ে চলে সময়ের সাথে। নীরব সওয়ারীদের ঘোড়া দুটির খুরের শব্দ শুধু সেই স্তব্ধতাকে কেটে কেটে দিচ্ছিল যেন।

দূরে—যেদিকে ছাউনি পড়েছে, অনেকগুলি নতুন পুরানো সিপাই রয়েছে তাতে—অবশ্য নতুনের সংখ্যাই সেখানে বেশী। সেই দিকে একবার তাকাল গুলমহম্মদ।

পঞ্চাশ হাজার সওয়ার আর সিপাই কাল রওনা দেবে লড়াই এর উদ্দেশ্যে। দলে ভারী নতুনের দল। সময়ের স্বল্পতায় বিভিন্ন শ্রেণী থেকে তাদের এনে জড় করতে হয়েছে। তারা না শিখল একযোগে, একতালে চলার এবং কাজ করার আদব। না জানল লড়াই করার কায়দা। না বুঝল সামরিক রীতি—না হ'ল সামরিক নীতি শিক্ষা। সময় নেই আজ। তারা শুধু জানে লড়াইকরবার জন্য আমাদের নেওয়া হয়েছে। ব্যস্।

গুলমহম্মদ ছাউনিগুলোর দিক থেকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে দারার দিকে একবার দেখে নিয়ে চলতে শুরু করল।

হঠাৎ সে ঋজু হ'য়ে উঠল। খাপ থেকে তরবারীটা অর্দ্ধেক মুক্ত করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে দারার পাশে পাশে আবার চলতে শুরু করল।

'শাহজাদা।'

দারার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল সেই ডাকে। চমক ভেঙে ঘোড়ার লাগামটা টেনে ধরে চোখ তুলে চাইলেন তিনি। চোখের দৃষ্টিটা একটু জোরালো করেই সম্মুখের সওয়ারী দুজনকে চিনতে পারলেন। রামসিং রাওঠেলা আর ছত্রশাল হাদা।

গুলমহম্মদ কখন যে তাঁর পাশে এসেছে দারা তা টের পান নি। তার দিকে একপলক দৃষ্টি বুলিয়ে নেওয়ার সময় দেখলেন—গুলমহম্মদ অর্দ্ধোন্মুক্ত তলোয়ার আস্তে আস্তে খাপে ঢুকিয়ে দিচ্ছে! দারা সম্মুখের দুজনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমরা কোথায় যাচ্ছ দুজনে?'

ছত্রশাল গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন, 'রামসিংকে নিয়ে আমার বাড়ির দিকে চলেছি শাহজাদা।'

দারা একবার আকাশটার দিকে তাকিয়ে যেন সময়টা বুঝে নিয়ে বললেন, 'এত রাত্রে? কি ব্যাপার?'

ছত্রশাল একটু হাসির শব্দ যোগ করে বললেন, 'ব্যাপার কিছুই নয় শাহজাদা। আমার বাড়িতে পূজার আয়োজন করেছি—সেই জন্যই রামসিংকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'পূজা? আজ কি তোমাদের কোন পূজার দিন আছে?' দারা জানতে চাইলেন।

রামসিং এবার কথা বললেন। তাঁর স্বরে বেশ বোঝা যায়, তিনি কৈশোর থেকে যৌবনে বেশী দিন পা দেন নি। তবু সে স্বরে কিসের যেন একটা শক্তি নিহিত আছে। তিনি ছত্রশালের হয়ে জবাব দিলেন, 'না শাহজাদা, বিশেষ কোন পূজা আজ নেই। আগামী লড়াইএ সফলতার জন্যই এই পূজার আয়োজন।'

দারা কি যেন একটু ভাবলেন। তারপর বলে উঠলেন, 'আমিও যাব। চল।'

ছত্রশাল কথার আকস্মিকতায় একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আপনি যাবেন শাহজাদা?'

'হ্যাঁ। অবশ্য তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি বিনা নিমন্ত্রণেই যাব।'

ছত্রশাল মনে মনে দারাকে যেন বিচার করে হেসে বললেন, 'মাফ করবেন শাহজাদা। প্রথম একটু অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু সে অবাকটুকু হওয়া উচিত ছিল না। আপনাকে ত জানি।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হাসির শব্দ মিশিয়ে বললেন, 'আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি শাহজাদা। যদি—'

দারা এবার নিজেই সজোরে হেসে ছত্রশালের কথা শেষ করতে দিলেন না। রামসিংও সে হাসিতে সাড়া দিলেন।

হাসির মাঝেই ছত্রশাল বললেন, 'চলুন শাহজাদা।'

'চল।'

ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলতে শুরু করলেন দারা। নীরব গুলমহম্মদ তাঁদের অনুসরণ করল।

কিছুটা পথ তাঁরা নীরবে চললেন। শুধু ঘোড়ার খুড়ের শব্দ সেই নীরবতার মাঝে যেন অস্বস্তির নিশানা হয়ে রইল।

দারা সেই ঘোড়ার খুড়ের আওয়াজ মেশান নিঃস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠলেন, 'এ কি হ'ল বল ত? আমি যে অশান্তি পছন্দ করি না, তাই ঘটছে।'

'ভেবে আর কি করবেন শাহজাদা?' ছত্রশাল বললেন।

'না, ভেবে আর কি করব। শুধু একটা কথাই ভাবি, এরা ভাবতে পারল কি ক'রে, বাদশা শাজাহানকে আমি খুন করেছি।' বিষাদের সুর যেন বেজে ওঠে দারার কণ্ঠে।

'সে কথা স্বার্থপর লোক ছাড়া কেউ ভাবতে পারে না।' সহানুভূতির স্বরে বললেন ছত্রশাল।

'হ্যাঁ। তবে ঔরঙ্গজেব আর মুরাদকে উচিত শাস্তি দেবো। তাদের খরগোসের মত ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে, তা তোমাদের বলে রাখছি।' দারা বললেন।

ছত্রশাল একটুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, 'শাহজাদা, এ কথা কি আপনি কারও কাছে বলেছেন?'

'হ্যাঁ, বলেছি। বেশ জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছি বলতে পার।' দারা জবাব দিলেন, তারপর শুধালেন, 'কেন?'

'কথাটা অনেকে ভাল ভাবে নেয় নি। তারা বলছে, আপনার তাদেরকে যখন দরকার নেই, তখন তারাও আর আপনাকে

সাহায্য করবে না। আপনাকে এখন রাজপুতদের ওপর নির্ভর করতে হবে।' শেষের কথাগুলো মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন ছত্রশাল।

'তারা কারা?' দারার স্বর একটু তীক্ষ্ণ হয়ে আসে। ঘোড়ার রাশটা টেনে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি।

'তারা যেই হোক না কেন, আপনার বন্ধু নয় নিশ্চয়ই। তারা হয় ত ছুঁতো খুঁজছিল, এখন আপনার কথায় ছল করে নিজেদের সরিয়ে নিতে চায়।' এবার রাম সিং বলে উঠলেন।

'হু। জান রাম সিং, বাদশা অসুস্থ অবস্থাতেও দুবার দেখা দিয়েছিলেন প্রজাদের সামনে। তবু গুজব রটেছে। কথা উঠেছে, আমিই বাদশাহের ছদ্মবেশে তাঁর পোষাক পড়ে সকলকে ধোঁকা দিয়েছি। ওয়াজের বলেছে, বাদশাহ নিজের হাতে লিখে তাঁর মৃত্যু সংবাদ যদি মিথ্যা বলে জানান, তবুও ওরা বিশ্বাস করবে না। মুরাদ বাদশাহের পত্রটা আমার হাতের লেখা বলে সকলকে জানিয়েছে। অর্থাৎ বাদশাহের ছদ্মবেশের মত সেটাও একটা ধোঁকা। কারণ, আমার আর বাদশাহের হাতের লেখা এক।' ক্ষোভ আর বিষণ্ণতা যেন দারার প্রতিটি কথার সুরে ঝড়ে পড়ে। একটুক্ষণ পরে আবার বললেন, 'আমি জানতাম কি হবে। ওয়াজেরকেও সে কথা বলেছিলাম।' একটু হেসে বললেন, 'আব্দুর বসিদ দাইলেমী সাহেবকেও কি আর বলব। তিনিই ত এই গণ্ডগোলে লেখা শিখিয়েছেন।'

দারার কৌতুকে সকলে একটু হাসে।

'দাঁড়ালেন কেন শাহজাদা, চলুন?' রাম সিং স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁদের নিশ্চলতা।

'হ্যাঁ, চল।'

লাগামের ইঙ্গিতে ঘোড়ার গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করতে করতে

ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন তাঁরা। গুলমহম্মদ কিছু পিছনে নীরব ছায়ার মত তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল।

চলতে চলতে দারা বললেন, 'আমি যা আশঙ্কা করেছিলাম তা দেখছি ঠিকই মিলে যাচ্ছে। যখন শুনলাম, মুরাদ সুরাট সহর লুট করে দেওয়ান আলি নকিকে হত্যা করেছে, তখনই—'

'এসব কথা এখন থাক শাহজাদা।' ছত্রশাল বললেন।

'কি আর করি বল। বিরক্ত হই, মনে অশান্তি আসে—যখন ভাবি, বাদশার উত্তরাধিকারী আমি—আমার বিরুদ্ধে, বাদশার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মিথ্যা একটা গুজব হাতিয়ার করে তারা মসনদ দাবি করছে। এটা কি অন্যায় নয় ছত্রশাল?' দারা যেন ছত্রশালের কাছে এর বিহিত চান।

ছত্রশাল চুপ করে থাকেন। তার কি-ই বা বলার আছে।

রাম সিং বললেন, 'যে কোন অবস্থা আসুক শাহজাদা, আমরা আপনার পাশেই থাকব। উত্তরাধিকার আপনার—কেন না, আপনি শা'-ই-বুলন্দ ইকবাল, একথা সকলেই জানে। উত্তরাধিকারীরই এ খেতাব প্রাপ্য।'

'আমি জানি, তোমরা আমার পাশে থাকবে। আমি জানি, আমিই শা'-ই-বুলন্দ ইকবাল। কিন্তু এ নামের লেখা হয়েছিল নাকি? ছোট বেলা থেকে আমায় ডাকত সবাই গুল-ই-আওয়ালিন-ই-গুলিস্তানী-ই-শাহী। সেইজন্যই ত চিন্তা হয়, খারাপ লাগে সব কিছু। কিন্তু আমি আমার অধিকার ছাড়ব না।'

ছত্রশাল বললেন, 'কেন ছাড়বেন শাহজাদা? আপনি মহানুভব। আপনি মসনদে বসলে ভাল ছাড়া খারাপ হবে না।'

দারাকে যেন কোন ভাব এসে আচ্ছন্ন করল। তিনি স্বপ্নালু চোখে বলতে লাগলেন, 'জান, আমি স্বপ্ন দেখি—স্বপ্ন দেখি,

হিন্দুস্থানের মানুষ সবাই সুখে আছে—হিন্দু মুসলমান সবাই এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মানসিক উন্নতি ঐ আকাশ ছাড়িয়ে চলে গেছে। ধর্ম নিয়ে কোন বিবাদ নেই। শান্তির স্নিগ্ধতা তামাম হিন্দুস্থান জুড়ে। আমার দর্শনের রূপ দিয়েছি 'মজমুয়া-উল-বাহারেণ'—সকলকে জানাতে চেয়েছি, এই কিতাবের মধ্য দিয়ে দুয়ের মিলনের কথা। চেয়েছি দুই মহাসমুদ্রের মিলন। কি বিরাট, কি প্রশস্ত! ভাব ত, ভাব ত একবার।'

'আপনি পণ্ডিত লোক। স্বচ্ছ দৃষ্টি ত সকলের থাকে না। তাহলে ত সব বিভেদেরই শেষ হয়ে যেত শাহজাদা। আপনার মত দৃষ্টি কি সকলের আছে?' মৃদুস্বরে বললেন ছত্রশাল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দারা বললেন, 'না, সবাই দেখে না, বোঝেও না। না বুঝল হিন্দুরা, না বুঝল মুসলমানরা। মুসলমানরা ত আমায় কাফের বলে। বলে, হিন্দুযোগী। হিন্দু পণ্ডিতের সঙ্গে আমার যোগ থাকায়, সকলের কাছেই কিছু না কিছু শিক্ষার বিষয় থাকে। শিক্ষা গ্রহণে অন্যায় কি?'

'সেটা সবাই বোঝে না শাহজাদা।' ছত্রশাল আবার বললেন।

'গোঁড়া ধার্মিকরা বোঝে না। গোঁড়ামীতে কি লাভ বল ত? কিছুই না। ঈশ্বর বল, খোদার দোয়া বল, ওভাবে কি পাওয়া যায়? পাওয়া যায় মনের পবিত্রতা দিয়ে, চাওয়ার আকুতি দিয়ে। মন যখন খোলা থাকবে—পবিত্রতাও আসবে। ক্ষুদ্রতা চলে গেলে সত্যিকারের আকুতি জন্মাবে।' আজ যেন সবকিছু বলে দিতে চান দারা, 'মনে শান্তি না থাকলে, বাইরে শান্তি কি করে আসবে? ঈশ্বর বা খোদা তোমার কান্না শুনে নিশ্চয়ই আসবেন। বিড়ালের বাচ্চা দেখেছ ত, মিঁউমিঁউ করে কাঁদে। তখন ওর মা এসে দুধ খাওয়ায়। এও ঠিক সেই রকম।'

'সাধারণ লোক ত এসব বুঝবে না।' ছত্রশালের কথা ভেসে আসে।

'বোঝাতে হবে, শেখাতে হবে, চিন্তা আর অনুভূতির স্তরে আঘাত হানতে হবে।' দারা একটু জোরের সঙ্গেই বললেন যেন। তারপর একটা হাসির তরঙ্গ তুলে বললেন, 'দেখ ত অনেকক্ষণ ধরে কি সব বলে গেলাম। তোমাদের বোধহয় অস্বস্তি হচ্ছে, তাই না?'

'না শাহজাদা, বোঝবার চেষ্টা করছি?' গম্ভীর গলায় ছত্রশাল জবাব দিলেন, 'আপনাকে জানতাম। আজ আরও ভাল করে জানতে পারলাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন শাহজাদা।'

'আমি জানি, আমার বিশ্বাস আছে তোমাদের ওপর। তোমাদের ভালোবাসায়···'দারা যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

রাম সিং বললেন, 'আপনি আমাদের কাছে শা'-ই-বুলন্দ-ইকবাল বা গুল-ই-আওয়ালিন-ই-গুলিস্তানী-শাহী নন, আপনি আমাদের শাহজাদা দারাশিকো—মহৎ পণ্ডিত। যাঁর মাঝে আমরা বাদশা আকবরের ছায়া দেখতে পাই।'

রাম সিংয়ের কথায় দারার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমি সেই মহান বাদশার মত হতে চাই। আমার মত কি জান? হিন্দুস্থানের মসনদে সেই মহান বাদশার গুণের অধিকারী হয়ে তবে মসনদে বসা উচিত। আমি সে চেষ্টাই করেছি—আমি তাঁরই মত সবার সাথে চাই শান্তির বাঁধন।'

দারার সেই স্বর যেন বাতাসে ভাসতে থাকে। ছত্রশাল আর রাম সিং দারার দিকে একবার তাকালেন—ভালো করে দেখতে চাইলেন তাঁকে।

মানুষটা বড় জ্ঞানপিপাসু। হিন্দুদের কাছে তিনি ছুটে গেছেন কিছু জানবার লোভে। হিন্দুস্থানের মানুষকে তিনি ভালোবাসেন। তাই বুঝি তাদের মাঝে সম্প্রীতির বাঁধন দিয়ে এক যায়গায় দাঁড় করাবার স্বপ্ন দেখেন। গীতা আর যোগবশিষ্ঠ পুঁথির অনুবাদ করে সকলের সামনে বিচার করার জন্য উপস্থিত করেন। উপনিষদের অনুবাদ মির-উল-আকবর বুঝি সেই প্রচেষ্টারই ইঙ্গিত। তরবারি রর থেকে জ্ঞানের শিখাই তাই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ কাম্য। 'মজমুয়া-উল-বাহারেণ, দুই মহাসমুদ্রের মিলনের সঙ্গমে একাত্মতা দেখিয়ে, সম্মিলিত শক্তির বিশালতা—বিপুল সৌন্দর্য এবং মহাশক্তির উৎপত্তির ইঙ্গিত বুঝি তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এ কিতাবে।

ছত্রশাল হয় ত এতখানি ভাবেন নি। কিন্তু তাঁর চিন্তাধারা কিছুটা এ সমস্ত ছুঁয়েই কিছুক্ষণ বুঝি চলেছিল। কিছু পরে তিনি বললেন, 'শাহজাদা কি লালদাস বাবার কাছে গিয়েছিলেন?'

'না। লালদাস বাবা গতকাল তাঁর ডেরা—কোটাল মেহরানে চলে গেছেন।' দারা জানালেন।

'কোটাল মেহরান!

'হ্যাঁ। লাহোরের সহরতলীর একটা জায়গার নাম কোটাল মেহরান।'

'ও। কিন্তু শাহজাদা, এ সময় আপনার একা একা ঘুরে বেড়ানো উচিত নয়।' ছত্রশাল আবার বললেন।

'কেন?'

'হয় ত শত্রুপক্ষ আপনার ক্ষতি করতে পারে।'

দারা লাগামের ইঙ্গিতে ঘোড়াটাকে চালনা করতে করতে কি যেন ভেবে নিলেন। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বিষণ্ণ সুরে বললেন, 'আমার

মনের যে ক্ষতি ওরা করেছে, সেটাই যথেষ্ট। শারীরিক ক্ষতি ওরা করবার সাহস পাবে না। তাছাড়া যা ঘটবার তা ত ঘটবেই। লড়াইকে ত এতদিন এড়িয়ে এসেছি, কিন্তু এখন—'

'তবু—'

'না, না। সে রকম ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া গুলমহম্মদ ত সঙ্গে আছে। একা আর কোথায়?' দারা একটু হেসে গুলমহম্মদের দিকে ফিরে বললেন, 'গুলমহম্মদ থাকতে ভাবনা কিসের?'

গুলমহম্মদ যেন কিছুই শোনে নি। ভাবান্তরহীন মুখে সে তার শাহজাদাকে অনুসরণ করে চলে।

মন্থর গতিতে ঘোড়া চালিয়ে দারা ফিরে আসছিলেন নিজের মহলের দিকে। ছত্রশাল, রামসিং, তাঁর সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দারা রাজী হন নি। তিনি বেরিয়ে পড়েছেন—গুলমহম্মদ তাঁকে ছায়ার মত চুপ করে অনুসরণ করেছে। দারার মনে একটু খুশীর ভাব যেন।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দ পথ পরিক্রমার পর দারা ডাক দিলেন, 'গুলমহম্মদ।'

গুলমহম্মদ উদগ্রীব হয়ে সাড়া দিল, 'শাহজাদা।'

'চল, আমরা ছাউনির পাশ দিয়ে ঘুরে যাই।' দারা বললেন।

'বহুত আচ্ছা শাহজাদা।'

কিছুটা পথ নীরবে চলার পর দারা আবার ডাকলেন, 'গুলমহম্মদ।'

গুলমহম্মদ ত্রস্তে সেই উদগ্রীব কণ্ঠেই সাড়া দেয়, 'শাহজাদা।'

'গুলমহম্মদ, তুমি এতদিন শাদি কর নি কেন?'

প্রশ্নের আকস্মিকতায় গুলমহম্মদ হকচকিয়ে যায়। এর কি

জবাব হতে পারে ? মনের মাঝে হাতড়ে কিছুই পায় না সে, 'আমি —শাহজাদা—শাদি শাহজাদা—'

'হ্যাঁ।'

গুলমহম্মদ কানটা একটু চুলকে নেয়। অকারণে অন্ধকারে কি যেন খোঁজার চেষ্টা করে। পরক্ষণে তার মনে হয়, নাকটা চুলকান উচিত।

'কি হ'ল ? জবাব দিলে না যে ?' দারা গুলমহম্মদের দিকে ফিরে বললেন।

গুলমহম্মদ আবার কান চুলকায়। মৃদুস্বরে বলে, 'সময় হয় নি, শাহজাদা।'

'কি বললে ?' দারা ঠিক বুঝতে পারেন না গুলমহম্মদের উত্তরটা।

গুলমহম্মদ এরকম ঘোরালো পরিস্থিতির মধ্যে পড়বে ভাবে নি। বললে, 'শাদি করার ইচ্ছে নেই, শাহজাদা।'

'কোয়েল যদি তোমায় শাদি করতে চায়।' সম্মুখের দিকে চেয়ে দারা বললেন।

গুলমহম্মদ বিষম খায় যেন। গলাটা বহু কষ্টে পরিষ্কার করে কোনমতে বলে, 'কোয়েল ?'

'হ্যাঁ। আমি বেগম সাহেবাকে বলে দেব, তোমাদের দুজনের শাদির বন্দোব্যস্ত করতে। আমার চারপাশের লোকগুলো যদি একটু আনন্দ পায়, তাহলে আমিও আনন্দিত হব।' সস্নেহ কণ্ঠে দারা বললেন।

গুলমহম্মদ দারার দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। শাহজাদাকে তার খুবই ভাল লাগে। শাহজাদা গুণীলোক। তাঁর অনেক কথাই সে বুঝতে পারে না, তবু ভালো লাগে। কিন্তু শাহজাদা তাঁর মত

লোকের দিকে তাকাতে পারেন জানতে পেরে শাহজাদার ওপর শ্রদ্ধা যেন আরো বেশী গাঢ় হয়ে ওঠে। কি বলবে ভেবে পায় না গুলমহম্মদ। তাই চুপ করে থাকে।

দারা বললেন, 'আগে লড়াইটার নিষ্পত্তি হোক, তারপর তোমার শাদির ব্যবস্থা করব।'

একটু দূরে ফৌজের ছাউনির আলো। তুজনে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। ব্যস্ততার ভাব সেখানে, প্রস্তুতিপর্ব চলেছে।

স্থির দৃষ্টিতে সেই ব্যস্ততা অবলোকন করে দারা বললেন, 'আচ্ছা ধর, যদি আমি হেরে যাই।'

'আপনি হারবেন না শাহজাদা।' গুলমহম্মদ দৃঢ়স্বরে বললে।

'না, আমি হারব না। আমাকে জিততে—'

দারার কণ্ঠস্বর হঠাৎ থেমে গেল সামনে থেকে ভেসে আসা ঘণ্টার শব্দে। শব্দটা এলোমেলো ভাবে জোরে জোরে বাজতে লাগল। দারা সেইদিকে চেয়ে গুলমহম্মদকে প্রশ্ন করলেন, 'কি হ'ল বল ত গুলমহম্মদ ?'

গুলমহম্মদও সেই শব্দের উৎপত্তিস্থলের দিকে চেয়ে থেকে বললে, 'হাতীতে হাতীতে মারামারি লেগেছে। এখুনি চরকী বাজী ছেড়ে দিলেই থেমে যাবে।'

বলার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অন্ধকারের একটা জায়গায় চরকী বাজী জ্বলে উঠতে দেখা গেল। ছায়া ছায়া ভাবে হাতীদের একটু সন্ত্রস্থ চলন নজরে এল সেই আলোয়। আস্তে আস্তে ঘণ্টার শব্দও স্তিমিত হয়ে এল।

দারা আশ্বস্ত হয়ে হেসে বললেন, 'শান্তি।'

'শান্তি ? না, শান্তি নেই। যতক্ষণ না আমাদের মতলব মত

সমস্ত কাজ শেষ হচ্ছে, ততক্ষণ আমার শান্তি নেই। ঔরঙ্গজেবকে মসনদে বসিয়ে তবেই কাজ শেষ হয়েছে মনে করব। কাফের দারার ঔদ্ধত্যের জবাব দিতেই হবে।' শায়েস্তা খাঁ নিজ কক্ষে পায়চারী করতে করতে বললে।

আমিন খাঁ বললে 'দাউদ খাঁ, এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে ধারণা করি নি।'

'সে কথা ভেবে এখন লাভ নেই।' শায়েস্তা খাঁ বললে।

'আমি ভাবছিলাম একটা কথা, যদি দারার এ লড়াইয়ে জিত হয়।' আমিন খাঁ বললে।

শায়েস্তা খাঁ পায়চারী থামিয়ে বললে, দুর্ভাবনাটা সত্যি হ'লে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিশেষ করে তোমার। কারণ মীরজুমলা ঔরঙ্গজেবের সংগে রয়েছে। কিন্তু সেটা যাতে না হয়, আমাদের সেই ব্যবস্থাই করতে হবে।'

'কিন্তু কি ক'রে?'

'দারার বলের অর্দ্ধেকটা শাহীফৌজ, আর বাকীটা দারার একেবারে নিজের লোক বলেই ধরতে পার। সুতরাং ফৌজদের মধ্যেই—'

'তাহ'লে?'

'ভাবছি, দাউদ খাঁ, ফিরোজ জঙ, আস্কর খাঁ, এদের কাউকেই হাত করা যাবে না। একমাত্র আমাদের ভরসা কলিল-উল্লা খাঁ। তাকে দিয়ে যতখানি সম্ভব কার্য্যোদ্ধার করতে হবে। তাকে আজ রাত্রে এখানে আসতে বলেছি। তবে খুব গোপনে—জানতে পারলে—' ইঙ্গিতে একটা ভঙ্গী করে অসমাপ্ত কথাটার অর্থ বুঝিয়ে দেয় শায়েস্তা খাঁ।

'কিন্তু কলিল-উল্লা খাঁর এখানে আসাটা কি ঠিক হবে?

গোপনে আসলেও, কোন্ কথা কখন বেরিয়ে পড়ে বলা যায় না।' আমিন খাঁর চিন্তিত নিম্নস্বর শোনা যায়।

শায়েস্তা খাঁ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বললে, 'কিন্তু এটাই একটা সুযোগ। ব্যস্ততার মাঝে কেউ খেয়াল করতে নাও পারে। তাছাড়া কলিল-উল্লাকে ছাড়া কাউকে দেখতে পাচ্ছি না ত।'

'কলিল-উল্লা কি রাজী হবে আপনার কথায় ?'

আমিন খাঁর কথায় শায়েস্তা খাঁর মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল, 'ঔরঙ্গজেব একটা কথা প্রায়ই বলতেন, কাকে কি দিতে হবে জানলে কার্যোদ্ধার অনেক সোজা হয়। কলিল-উল্লা যোদ্ধার চেয়েও লোভী। সুতরাং একটু লোভ দেখাব, আর দারার রাজত্বে আসল অবস্থাটা কি হবে বুঝিয়ে দেব। তাহলেই—'

শায়েস্তা খাঁর কথা থেমে গেল একটি মুখ দেখে। তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কলিল-উল্লা খাঁ।

'এস, এস, খাঁ সাহেব। কিন্তু তুমি যে এখানে এসেছ কেউ জানে না ত?' শায়েস্তা খাঁ অভ্যর্থনা এবং প্রশ্ন দুটোই একসঙ্গে সারলে।

'না।'

'বেশ। সাবধানে থাকা ভাল। যাক, সময় নষ্ট না করে আসল কথাটা এবার বলি। খাঁ সাহেব, তোমরা ত আগামী কাল লড়াই করার জন্য বেরুচ্ছ—তাই না?' শায়েস্তা খাঁ প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।' কলিল-উল্লা জবাব দেয়।

কলিল-উল্লা আসন গ্রহণ করতে শায়েস্তা খাঁ আবার বলনে, 'আগামী লড়াইয়ে কোন্ পক্ষের ওপর পক্ষপাতিত্ব তোমার ?'

কলিল-উল্লা প্রথমে প্রশ্নটা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু রহস্যের আঁচ পেয়ে একটু সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। বললে, 'আমি কোন্ পক্ষে, সেটা ত আপনাদের জানাই আছে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানি বই কি?' শায়েস্তা খাঁ একটু থেমে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'তুমি আরও বড় হতে চাও না কলিল-উল্লা?'

'নিশ্চয়ই চাই।'

'শাহজাদা ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জিতলে তুমি অনেক কিছু পাবে বলে আশা কর, তাই না?'

কলিল-উল্লা কোন কথা বলে না। শুধু একবার চোখ মেলে শায়েস্তা খাঁ এবং আমিন খাঁর দিকে তাকাল।

শায়েস্তা খাঁ বললে, 'কি, জবাব দাও?' কিছুক্ষণ উত্তরের অপেক্ষা করে শায়েস্তা খাঁ আবার বললে, 'তোমার হয়ে জবাবটা আমিই দিচ্ছি। তুমি যা আশা করছ, তা পাবে না। ও তরফের কিছু পাবার আশা ছাড়।'

সন্দিগ্ধ দুটি চোখে আবার শায়েস্তা খাঁর দিকে তাকাল কলিল-উল্লা। বললে, 'আশা ছেড়ে দেব! আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তুমি দারার পক্ষে লড়তে যাচ্ছ। কিন্তু দারাকে আমি চিনি। তার সাফল্যে তোমার কিছুই লাভ হবে না। সেটা তোমাকে বলে দিতে পারি। দারার সুনজর লাভ করবে রাজপুতরা। আর তার মতামতের ওপর বাদশাহ শাজাহানও যে কথা বলবে, একথা একবারও আশা কোর না। আমি বুঝতে পারছি, তুমি খুব সংশয়ে পড়েছ। কিন্তু বিশ্বাস করতে পার আমায়, আমি যা বলছি তা সবই ঠিক।'

আমিন খাঁ বললে, 'খাঁ সাহেব, শাহজাদা দারাশিকোর রাজপুতদের ওপর বিশ্বাস বেশী, পক্ষপাতিত্বও বেশী। সুতরাং ছত্রশাল হাদা যতখানি সম্মান পাবে, সে সম্মান খাঁ সাহেব তোমার ভাগ্যে জুটবে না।'

'তাছাড়া, দারা বিধর্মী। সে জিতলে ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়বে।' একটু থেমে শায়েস্তা খাঁ আবার বললে, 'আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি কলিল-উল্লা, তাতে তোমার আশা সফল হবে— ইসলামও রক্ষা পাবে। শুনবে?'

কলিল-উল্লা বললে, 'বলুন।'

'তার আগে তুমি আল্লার নামে শপথ কর, তুমি এ প্রস্তাবে রাজী হও আর না হও, এ কথা গোপন রাখবে।'

কলিল-উল্লা দারার উপর ঠিক প্রসন্ন নয়—দারার রাজপুত পক্ষপাতিত্বের কথা সে জানে। কিন্তু এ স্থলে ক্ষতি নেই প্রস্তাবটা শুনতে। তাই সে বললে, 'বেশ, আমি আল্লার নামে শপথ করছি, এ কথা কাউকে বলব না।'

শায়েস্তা খাঁ কলিল-উল্লার কাছে এগিয়ে এল। নিম্নস্বরে বলল, 'এ প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করলে যা পাবে, সেটা তুমি কাফের দারার কাছে পাবে না। তাছাড়া আরেকজন যদি সাফল্য লাভ করে, তোমার লাভ বাড়বে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। সে কে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এখন? এ যুদ্ধে শাহজাদা ঔরঙ্গজেব তোমার সাহায্য পেলে নিশ্চয়ই সাফল্যলাভ করবে।'

'আমায় কি করতে হবে?'

'এ লড়ায়ে তুমি অংশ গ্রহণ করবে না। আর তোমার ফৌজদেরও সেই মত পরিচালনা করবে।'

'লড়াইয়ের সময় একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।'

একটু বক্রহাসি ঠোঁটে নিয়ে কলিল-উল্লা বললে। মনের মধ্যে রাজপুতদের প্রাধান্য তাকেও জ্বালা ধরিয়েছে।

'তা ঠিক। কিন্তু লড়াইয়ের ভালমন্দ তোমার হাতে।'

'কিন্তু শাহজাদা দারা…'

শায়েস্তা খাঁ তাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমাকে ত আগেই বলেছি, দারার সাফল্যে তোমার কোন লাভ হবে না। আমাদেরও না। আর তার জয়ের অর্থই হচ্ছে আমাদের সর্বনাশ।'

কলিল-উল্লা দেখল, তার বিশেষ ক্ষতি নেই। দারার জয় অথবা ঔরঙ্গজেবের অনায়াসসাফল্য তার কাছে দুই-ই সমান। সে প্রশ্ন করলে, 'কিন্তু এতে আমার কি লাভ হবে, বললেন না ত।'

'বলছি। তোমাকে আমি ঔরঙ্গজেবের সামনে মুখোমুখী কথা বলিয়ে দেব। দেখবে, সে কত মহানুভব। শুধু তাই নয়, তোমার ঔরঙ্গজেবকে সাহায্য করার অর্থ, ইসলামকে রক্ষা করা। হিন্দুস্থানের আগামী অন্ধকারময় ভবিষ্যতকে আলোকিত করা। এটাও ত কম কাজ নয়। তাছাড়া তোমার পুরস্কারও বেশ মোটা রকমই হবে।'

'কিন্তু—'

'শোন, তোমাকে আরো ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।' শায়েস্তা খাঁ কলিল-উল্লার পাশে একটা আসনে বসল। বলল, 'হ্যাঁ, শোন…'

সময় হয়েছে যাত্রার।

নাদিরা আর রাণাদিল চুপ করে বসেছিল। দারা বিদায় নিতে এসেছেন তাঁর দুই বেগমের কাছে।

রাণাদিল নিজের ভাগ্যে আনন্দিত হলেও, সে আনন্দকে একটা আগলের মধ্যে রেখেছে। প্রথমতঃ, তার জীবনের

অভাবনীয় মধুর পরিণতির জন্য। দ্বিতীয়তঃ, সেই সৌভাগ্যের দ্রুততার জন্য এক আশঙ্কা মনে দোলা দেয়—এই সৌভাগ্য কি শুধুই ঝিলিক দিয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। তাই যতটুকু সে পায় তাতেই খুশী। তার বেশী চায় না, আশাও করে না। সে শাহজাদা দারাকে ভালোবাসে—সেইটুকুতেই সে আনন্দে বিভোর। সৌভাগ্যগর্বে অন্ধ সে হয় নি। ভাবাবেগকে সে সংহত করে রাখে। হারেমের অন্যান্য আকর্ষণ—শাহজাদা সে আকর্ষণের তীব্রতায় যদিও গা ভাসাতেন, কিছু মনে করত না রাণাদিল। সে পেয়েছে বহিনের স্নেহ—স্বামীর ভালোবাসা। সে তো হিন্দুর মেয়ে—তার সেই ভাবজগতের পূর্ণতাটা সে ত হারায় নি। স্বামীই তার সব। তার ভালোবাসা জীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার এবং পুরস্কার। সেটাও সে কুড়িয়েছে দু'হাতে।

কিন্তু আজ তাকে বিদায় দিতে গিয়ে বুক কাঁপে। চোদ্দ বছরের ফুটফুটে সিপিরকে তার কাছে বসিয়ে রেখে তার নরম হাতটি চেপে ধরে সে যেন আশঙ্কাভরা বুকটাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। যে বহুবার জীবনের পথ চলার নিঃস্বতাকে জানে—তার পাশের পথচলা মশালধারী যদি কোন কারণে একবারও সরে যায়, সে ত একটু আশঙ্কিত হবেই।

'তাহ'লে এবার আমরা যাই।' সজ্জিত দারা দুজনের কাছে বিদায় চাইলেন।

দারার ভারীস্বরে রাণাদিল এবং নাদিরা দুজনেই চোখ তুলে তাকাল তাঁর দিকে।

নাদিরার দুচোখ জলে ভরা। শুধু অস্ফুটে শেষবারের মত নিজের হৃদয়ের আপন বস্তুগুলিকে আকড়ে ধরার চেষ্টায় যেন বললে, 'শাহজাদা, এ লড়ায়ে আপনাদের না গেলেই নয়?

জাহানারা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি একটি মূল্যবান পোষাক এনে শাজাহানের হাতে দিলেন।

শাজাহান সেটি দারার হাতে তুলে দিলেন। দারাকে অবশ্য তাঁর উপহার দেওয়াটা নতুন কিছু নয়। যখনই হোক, কিছু না কিছু তিনি তার হাতে তুলে দিয়েছেন।

বাদশাহ শাজাহানের মসনদ আরোহণের 'নজর' এবং 'নিমার' করার দিন থেকে আজ পর্যন্ত ছোট ছোট ঘটনাগুলো দারার স্মৃতিতে ভিড় করে আছে—শাজাহানের পিছনে বসে দারা বাদশার মাথার ওপর মুদ্রা ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সেইদিনই দারার উপহার এল দুই লাখ টাকা, আর এক হাজার টাকা তার দৈনিক হাত খরচ। এরপরও তিনি বহু উপহার পেয়েছেন সম্রাটের কাছ থেকে।

কিন্তু সেই অতীত স্বপ্নবিলাস থেকে নিজেকে টেনে বর্তমানে নামিয়ে নিয়ে এলেন শাহজাদা দারাশিকো। অলঙ্কারও তাঁর কাছে নতুন নয়। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

শাজাহান চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা দারাকে নিজের আবেগ দমন করতে করতে আস্তে আস্তে বললেন, 'এবার যাও। আর শোন, তুমি দেওয়ান-ই-আম থেকে রথে চড়ে বেরুবে মাথা উঁচু করে—ফিরেও আসবে মাথা উঁচু করে। আর হ্যাঁ, হাতী ঘোড়া আর আমার নিজস্ব দেহরক্ষী ফৌজ তোমার জন্য দিয়েছি। তারা তোমার হুকুমে চলবে। এবার বাহাদুরের মত সকলকে তা জানিয়ে তুমি তোমার জয়যাত্রায় যাও। তোমার পদক্ষেপ যেন এখান থেকে আমি শুনতে পাই।'

শাজাহান এতগুলো কথা বলে যেন হাঁপাতে থাকেন। তারপর সিপিরকে একটু আদর করে ঠেলে দিলেন দারার পাশে।

দারা বুঝলেন, দেওয়ান-ই-আম থেকে যাত্রা করার অনুমতি

দিয়ে শাজাহান তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনই করেছেন। চোখের মনি দারার জন্য করতে পারেন না, শাজাহানের এমন কি আছে? কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিবাদন জানিয়ে সিপিরকে নিয়ে দারা বেরিয়ে গেলেন।

অপসৃয়মান দারার দিকে বৃদ্ধ শাজাহান চেয়ে রইলেন। জাহানারা এসে তার হাত ধরলেন।

কিছুক্ষণ বাদে নিজের ফৌজ পরিবৃত হয়ে দারা যাত্রা করলেন। তাদের সম্মিলিত পদধ্বনি আর কাড়া-নাকাড়ার শব্দ ভেসে এল শাজাহানের কানে। সেইদিকে তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলেন শাজাহান—তাঁর দারা, মমতাজের দারা, শাহ-ই-বুলন্দ-ইকবাল দারা লড়াই-এ চলেছেন।

কিন্তু সব ভাবনা তাঁর মনে জট পাকায়। এই কয় বছরে প্রিয় উজির, ওমরাহ, বন্ধুরা অনেকে চলে গেছেন—জাফরজঙ্গ, শাদাউল্লা, আলি মরদন, আবুল ফজল সবাই। তারা থাকলে আজ হয়ত একটা পথ বেরুত, ভাবনার জট ছাড়ান যেত, কিন্তু মৃত্যুর পরপারে চলে যাওয়া লোকগুলির আজকে থাকার প্রয়োজনীয়তা ছিল, এই কথা ভাবা ছাড়া আর কি করার আছে তাঁর। হয়ত মমতাজ বেঁচে থাকলেও এতটা হ'ত না। কে জানে, কি হ'ত, না হ'ত? ভাগ্যে যা ঘটবার, তা ঘটতই হয়ত। তবু—।

শাজাহানকে ধরে শয্যার দিকে নিয়ে চললেন জাহানারা বেগম।

একবার মমতাজের স্মৃতির দিকে চোখ তুলে তাকালেন শাজাহান। অভ্যাসবশে হাতটা নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করলেন তিনি।

আপনারা থাকুন, অন্য লোক ত আছে। দাউদ খাঁ আছে, ছত্রশাল আছে, রুস্তম খাঁ আছে। তারাই আপনার হয়ে লড়াই করবে।'

নাদিরার অবুঝ কথাগুলি দারা শুনলেন। নাদিরা যে এত কম বোঝে তা নয়—কিন্তু নরম-মন নাদিরার টানটা যে কোথায়, সেটা বোঝেন দারা। তাই তার সেই অবুঝ কথাগুলির জবাবে বললেন, 'তা হয় না নাদিরা।'

'কেন হয় না?' নাদিরা যেন বুঝতে চায় না। বললে, 'সুলেমান কাছে নেই, সিপিরও লড়াই-এ যাচ্ছে, আপনিও যাবেন। আমি কি নিয়ে থাকব? কি করে এদের সবাইকে ছেড়ে আমি থাকব বলুন?'

'কিন্তু সিপির আর আমি আবার ফিরে আসব। জিতেই ফিরে আসব আমরা। আর তোমার সুলেমানও এর মধ্যেই ফিরে আসবে দেখ।' দারা সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

'সিপির থাক। ও এত ছোট ছেলে, লড়াইয়ের কি জানে? নাদিরা ওকে যেন ধরে রাখতে পারলে বাঁচে। আর সেজন্য এই অবুঝ আব্দার সে দারার কাছে করল।

'না, সিপির যাবে। ও চোদ্দ বছরের ছোট্ট ছেলেটি বলে যে লড়াই জানে না, এ রকম কথা তুমি বলতে পারলে কি করে?' দারা একটু লঘুকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

'আমার বড় ভয় করছে শাহজাদা। আমাকে সেই দুঃস্বপ্ন গুলো বড় ভয় দেখাচ্ছে। আমি—আমি…'কান্নার বেগে নাদিরার কথা থেমে যায়।

দারা আস্তে আস্তে নাদিরার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কোমল স্পর্শে তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'তুমি দুশ্চিন্তা কর বলেই দুঃস্বপ্ন দেখ। ভয় পেয়ো না। একটু সাহস সঞ্চয় কর। আমরা জিতবই। এ রকম ভাবে দুর্বল করে দিও না আমাকে।'

দারা এবার রাণাদিলের দিকে ফিরে তাকালেন। রাণাদিল এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল সিপিরের হাতটা ধরে। নাদিরার মত তারও কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু অনেক কষ্টে সংযত করে রেখেছিল সে নিজেকে। তবু তারও একটা অকারণ আশঙ্কা মনে ঝিলিক দিচ্ছিল। বিপদের মাঝে আপনার জন যদি হারিয়ে যায়, সেটা সহ্য হয় কার? নিজেকে হারিয়ে ফেলা তার থেকে অনেক ভাল।

চোখ তুলে চাইল সে দারার দিকে। প্রথমে মনে হল, সেও বহিনের মত বলে, কি দরকার আপনাদের যুদ্ধে যাওয়ার। কিন্তু সে কথা কতখানি অর্থহীন তখনি মনে হল। একজনকে ত শক্ত থেকে উৎসাহ দিতেই হবে। নইলে তাদের দুজনের চোখের জলে পথটা পিচ্ছিল হয়ে যেতে পারে। অনির্দিষ্ট ভাগ্যের জয় পরাজয়ের দিকে ছুটে চলতে আদরের সিপির আর তাদের শাহজাদার অসুবিধা হতে পারে।

দারা এবার বললেন, 'তুমি কি ভাবছ রাণাদিল? এদিকে সময় যে এগিয়ে আসছে।'

'মনে মনে প্রার্থনা করছিলাম আপনার জন্য।' রাণাদিল মৃদুস্বরে জবাব দিল।

'বেশ। এবার তাহলে আমরা যাই।' দারা সিপিরের দিকে ধীরে ধীরে একটা হাত প্রসারিত করে দিলেন।

'হ্যাঁ। আপনাকে জিততেই হবে মনে রাখবেন। আমরা দু' বহিন অপেক্ষা করে থাকব সেই খবরের আশায়।' রাণাদিল বললে।

'বেশ। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, এ লড়াইয়ে আমি জিতব?'

'জিত—জিত—জিত। শাহজাদা, আপনি হারতে পারেন না।' নিজের স্বর উদ্দীপ্ত করে বলে রাণাদিল।

রাণাদিলের এই উৎসাহব্যঞ্জক কথা, নাদিরার ব্যাকুল আশঙ্কা, স্নেহ-ভালোবাসায় পূর্ণ মনের আকুতি—তুই-ই দারার মনে সম্পূর্ণতা নিয়ে আসে। এরা তুজনই তাঁকে ভালোবাসে। খুশী হয়ে ওঠে দারার মন। সিপিরের দিকে চেয়ে বললেন, 'চল সিপির।'

সিপির নাদিরার দিকে একবার তাকাল, তারপর রাণাদিলের দিকে। কি বলা উচিত ভেবে পায় না সে। কিছুটা তার লড়াইয়ে যাওয়ার গর্ব, আর কিছুটা না দেখা লড়াইয়ে যোগ দেওয়ার অনুভূতি, তাকে একটু অভিভূত করে দিয়েছিল। উপরন্তু সে তার আম্মাজানকে ছেড়ে কোথাও কখনও থেকেছে বলে মনে পড়ে না। আস্তে আস্তে সে উঠে দাঁড়িয়ে আম্মাজানের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দারার দিকে এগিয়ে যায়।

নাদিরা অস্ফুট একটা কান্নার আওয়াজ তুলে সিপিরকে তার তু'হাতের মধ্যে নিয়ে বুকের মাঝে আকড়ে ধরে শুধু বলে, 'সিপির।'

রাণাদিল আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। কান্নার আবেগে তারও চোখ তুটো ভিজে ওঠে। আস্তে আস্তে উঠে সে নিজের ঠিক করে রাখা কাজ সারার জন্য প্রস্তুত হয়।

নাদিরার কান্না দেখে সিপির লজ্জায় একটু অস্বস্তি বোধ করে। আস্তে আস্তে সে ডাকল, 'আম্মাজান।'

ডাকের অর্থটা নাদিরার কাছে স্পষ্ট মনে হ'ল। ধীরে ধীরে সে তাকে ছেড়ে দেয়।

পিতাপুত্র কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়। রাণাদিল মৃতু স্বরে ডাকলে, 'সিপির।'

সিপির রাণাদিলের দিকে তাকাল। রাণাদিল বললে, 'এদিকে একবার এস।'

সিপির এগিয়ে আসতে, রাণাদিল তার কপালে চন্দনের একটা টিপ এঁকে দিয়ে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। বললে, 'এটা জয়ের তিলক এঁকে দিলাম সিপির।' আবার একটু দেখে নিয়ে মৃত্যু হেসে বললে, 'বাঃ, ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে ত। কিন্তু লড়াই থেকে জিতে আসলে পর আরো সুন্দর করে আমার সিপিরকে সাজাব। তারপর····থাক, সেটা এখন বলব না।'

রাণাদিলের মৃদু কৌতুকে সিপির সলজ্জে হাসে। কোন কথা বলে না।

রাণাদিল গভীর স্নেহে সিপিরের কপালে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে দারার দিকে সজল চোখে থরথর ঠোঁটে ডাকলে, 'শাহজাদা।'

দারা সহাস্যে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। রাণাদিল তাঁরও কপালে সযত্নে একটা চন্দনের টিপ এঁকে দিল। তারপর কিসের আশায় জলে ভেজা চোখটা তুলে তাকাল। থরথর করে তার ঠোঁট ফুলে ওঠে—চোখ ছাপিয়ে জলের ধারা নেমে আসতে চায়। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখে সে।

দারা নীরবে তার দুই প্রিয় বেগমের দিকে তাকিয়ে সিপিরের দিকে ইঙ্গিত করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মন্থর পদক্ষেপে। সিপির চকিতে নাদিরার দিকে আরেকবার তাকিয়ে পিতাকে অনুসরণ করল।

রাণাদিল সেইদিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে পালঙ্কে লুণ্ঠিত নাদিরার পাশে এসে বসল। নাদিরার মাথায় সস্নেহে একটা হাত দিয়ে তার চুলের ভিতর আঙুলগুলো ডুবিয়ে দিয়ে ভারী গলায় শুধু বললে, 'বহিন।'

নাদিরা একটা শ্বাস জোরে টেনে নিয়ে একটু উঠে রাণাদিলকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মুখ রেখে আকুলকরা আওয়াজ তুলে দ্বিগুণ বেগে কান্নায় নিজের ব্যথা যেন জানাতে চাইল।

রাণাদিল আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না। চোখে জল ছাপিয়ে এল এবার। গলায় অস্ফুট আর্তনাদে কান্নায় তার ব্যাকুলতা জানিয়ে নাদিরাকে দুহাতে ধরে রাখে।

অজানা ভবিষ্যৎ কি ডেকে আনে, কেউ জানে না। দুটি ব্যথিত বিরহী হিয়া বিচ্ছেদের ব্যথা নিয়ে বসে থাকে। শুধু কি তাই? অজানা আশঙ্কা—তার ফল কি হতে পারে, সেটা ত অজানা নয়।

শাজাহান অর্দ্ধশায়িত হয়ে দারার আসার পথের দিকে চেয়ে ছিলেন। জাহানারা সামনের বাতায়ন দিয়ে নিজের দৃষ্টিটাকে বারিয়ে দিয়েছিলেন কোথায়, কে জানে? দানিশমন্দ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষমান। সবাই নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ।

দারা সিপিরকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে শাজাহান শয্যায় উঠে বসলেন। দানিশমন্দ সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে ছিলেন, কিন্তু শাজাহান তাঁকে হাত নেড়ে নিবৃত্ত করে অনেক কষ্টে অসমর্থ শরীরটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দারা ত্রস্থে তাঁর কাছে এসে বাহুটা ধরলেন। জাহানারা ধীরে ধীরে এসে শাজাহানের পাশে দাঁড়ালেন।

শাজাহান নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি ঠিক দাঁড়াতে পারব।'

দারা তাঁকে ছেড়ে দিলেন। অভিবাদন জানিয়ে নম্রস্বরে বললেন, 'বাদশা, আমরা আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।'

'বেশ, বেশ। জাহানারা—'শাজাহান ইঙ্গিতবহ চোখে কন্যার দিকে তাকালেন।

জাহানারা নীরবে এগিয়ে গিয়ে কতকগুলো অলঙ্কারের বাক্স নিয়ে এসে দাঁড়ালেন আবার পিতার পাশে।

শাজাহান এক একটি বাক্স খুলে মূল্যবান অলঙ্কার দিয়ে দারা-শিকোকে সযত্নে সাজালেন। তারপর স্নেহভরা চোখে দেখলেন। বললেন, 'খুব সুরৎ।' তারপর সিপিরের দিকে চেয়ে তাকেও কয়েক খানা অলঙ্কার পড়ালেন। কিছুক্ষণ তাকেও নিরীক্ষণ করে মৃদু হাসি মুখে নিয়ে শুধালেন, 'তোমার কপালে চন্দনের টিপ কে এঁকে দিল?'

সিপিরের হয়ে দারা নম্রস্বরে জবাব দিলেন, 'রাণাদিল। ওর বিশ্বাস, ওটা নাকি বিজয় তিলক। জয় সুনিশ্চিত করবার আশাতেই এঁকে দিয়েছে সে।'

শাজাহান দারার দিকে তাকালেন পূর্ণ দৃষ্টি মেলে। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'বহুত খুব।'

'বাদশা, এবার তাহলে আমাদের যাবার অনুমতি দিন।' দারা বললেন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' বলে দারাকে দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন শাজাহান। তাঁর প্রিয় পুত্রকে এমনভাবে কোনদিন ছেড়ে দেন নি তিনি। আবেগে অস্থির হয়ে শাজাহান মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন নিজের আকুলতা গোপন করতে।

জাহানারা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা সিপিরকে টেনে নিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করালেন।

'বাদশা, এবার আমরা যাই।' দারা আবার অনুমতি ভিক্ষা করলেন।

'দাঁড়াও।' শাজাহান পবিত্র মক্কা যেদিকে, সেইদিকে মুখ করে দাঁড়ালেন। তারপর ফতিহা থেকে আবৃত্তি করলেন কয়েকটি লাইন—খোদাতালার কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা জানালেন তাঁর পুত্রের সাফল্য কামনা করে। তারপর দারার দিকে ফিরে বললেন, 'আরো একটা জিনিষ নিয়ে যাও।'

সূর্যের তাপ প্রখরতার দিকে চলেছে দিনের পর দিন। পথ চলতে কষ্টও তাই সেই অনুপাতে বাড়ছে।

দারার মনে অবশ্য যাত্রার প্রথমেই স্থলেমানের কথাই মনে হয়েছে। তাই একটু সময় নিয়ে চলছিলেন তিনি। যদি স্থলেমান তার বিজয়ী ফৌজ নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়।

কিন্তু প্রতিপক্ষের ভাদাউর পৌছানর সংবাদ পেয়ে তিনি নিজের হিসাবের ভুল বুঝতে পেরে দোলপুর থেকে সরে এসে উপস্থিত হ'লেন সামুগড়ে। দিনটা ২৩শে মে, ১৬৫৮ সাল।

যমুনার তীর ধরে চার ক্রোশ পথ গিয়ে রাইপুরের ঘাট। তারই অপরদিকের দক্ষিণ তীরে ইমাদপুর। সেখানে শিকারের খোঁজে শাজাহান মাঝে মাঝে আসতেন। তাঁর তৈরী বিশ্রামাগার আর শিকারের সময় থাকার মহলগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানো।

এরই পূবদিকে এক মাইল এগুলে সামুগড় গ্রাম। এখানেও ছড়িয়ে আছে বাদশা জাহাঙ্গীরের শিকার-মহলের জরাজীর্ণ কঙ্কাল গুলি স্মৃতিস্বরূপ হয়ে।

সেই গ্রাম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এগুলে দিগন্ত ছোঁয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর। তারই কাছে এসে দারা তাঁর ফৌজ নিয়ে তাঁবু ফেললেন।

কিছুদিন পরেই—২৮শে মে, ১৬৫৮ সাল—খবর এল ঔরঙ্গজেব অপর প্রান্তের কিছুদূরে এসে পৌচেছেন।

'ছত্রশাল, ফিরোজ জঙ্গ, কলিল-উল্লা এবার তোমরা তৈরী হও।' দারা খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিলেন।

ব্যস্ত হয়ে উঠল সবাই। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় তারা। প্রতিপক্ষ এসে গেছে, সুতরাং আঘাত হানতে হবে। যুদ্ধোপযোগী সেই বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মোকাবিলা হবে এবার।

অস্ত্রের ঝঙ্কার তুলে দারার বাহিনী এগিয়ে গেল। দারার তাঁবু

থেকে কিছুটা দূরে এসে তাঁর হুকুমে আবার তাদের পথচলা থেমে গেল।

সকলেই অপেক্ষা করে রইল নতুন হুকুমের আশায়। কিন্তু সময় বয়ে যায়, কোন হুকুমই আর আসে না। স্থানুবৎ সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে দারার বাহিনী।

ছত্রশাল একটু অবাক হয়ে রাম সিংয়ের দিকে তাকালেন। তারপর যেন একটু অস্থির হয়ে উঠলেন। আক্রমণের কোন নির্দেশ আসছে না কেন? দেখলেন, রাম সিং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে যেন আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে।

রুস্তম খাঁ বা ফিরোজ জঙ্গেরও একটু ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠল এই নীরবতায়। আস্তে আস্তে সে তার ঘোড়ায় চড়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে এসে দাঁড়াল ছত্রশালের হাতীর পাশে। জিজ্ঞেস করলে, 'কি ব্যাপার? এ রকম ভাবে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম কেন?'

'বুঝতে পারছি:না।' চিন্তিত মুখে ছত্রশাল বললেন। তারপর কি ভেবে নিয়ে আবার বললেন, 'শাহজাদা কি বলতে চাইছেন জেনে আসি।'

দারা সুন্দর এক সিংহলী হাতীর হাওদায় বসেছিলেন। থম থম করছে যেন চারিদিক। অপেক্ষমান ফৌজের মাঝে দারার হাতী দাঁড়িয়ে।

ছত্রশাল তাঁর হাতী নিয়ে এসে দারার পাশে দাঁড় করালেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হ'ল শাহজাদা?'

'ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করছি।' দারা জবাব দিলেন।

'আমরা এগিয়ে আক্রমণ করলে ত হয়?' ছত্রশাল বললেন।

'না, আমি চাই, ওরাই আমাদের আক্রমণ করুক।'

'কিন্তু শাহজাদা, আমরা আক্রমণ করলে ক্ষতি কি ?'

'না, অপেক্ষাই করব। মিছিমিছি অতখানি পরিশ্রম করে আক্রমণ করে লাভ নেই।' দারা নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকতে চান।

'শাহজাদা, আমাদের কিন্তু আক্রমণ করার এটাই উপযুক্ত সময়। প্রতিপক্ষ পথ পরিশ্রমে ক্লান্ত। কিন্তু আমরা বিশ্রাম নিয়েছি, তাজা আছি।' ছত্রশাল বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

'না, এটাই ঠিক ছত্রশাল।' দারা অবিচল থাকেন।

'শাহজাদা, আমার মনে হয় সেটা ভুল হবে। চলুন, আমরা এখনই আক্রমণ করি। ক্লান্ত বাহিনীর আমাদেরকে রোখার মত সাধ্য হবে না। আপনি হুকুম দিন শাহজাদা।' ছত্রশাল দারার সিদ্ধান্ত পাল্টাবার জন্য আবার অনুরোধ জানালেন।

দারা সেই অবিচলিত ভাবে বললেন, 'ছত্রশাল, আমরা ভুল করছি না, ঠিকই করছি। আমরা এখানেই অপেক্ষা করব।'

দারার কথায় হতাশ হয়ে ছত্রশাল আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এলেন। কিই বা করার আছে। সর্বাধিনায়কের নির্দেশই মেনে নিতে হবে। নিজের জায়গায় এসে দাঁড়ালেন ছত্রশাল। এই সিদ্ধান্ত তাঁর ভালো লাগে নি। মানতে মনও চাইছে না।

কিন্তু তবু মেনে নিলেন। আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ফৌজ শুধু ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ছিল—নির্দেশ পেলেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু সে রকম কোন নির্দেশই দারার কাছ থেকে এল না।

এদিকে সূর্যের তাপ অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। তাপের প্রচণ্ডতায় চারিদিক হল্কায় অস্থির করে তুলল। মাঝে মাঝে বালিভরা প্রান্তরের মাঝ দিয়ে তপ্ত হাওয়া ছুটে এসে চোখে মুখে আঘাত হানতে লাগল। যুদ্ধের সাজের ভিতর আটকে থাকা

যোদ্ধারা কাতর হয়ে উঠল। ক্রমশঃ যেন দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব মনে হতে লাগল তাদের। শরীরের ভিতরটা যেন শুকিয়ে এসেছে—পা দুটোও যেন অনড়। ছটফট করতে লাগল সকলে। তার উপর তৃষ্ণা। পানীয় জলের অপ্রচুরতায় অসহ্য হয়ে উঠল সময়। কিন্তু সময়ও যেন কাটে না। কেউ কেউ সহ্যের চরম সীমায় পৌঁছে গেল। তাদের শরীর যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। সমগ্র চেতনার দ্বার রুদ্ধ করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে শয্যা নিল তারা। কেউবা চিরতরে চোখ বুজল সেই প্রান্তরেই।

পশুগুলি পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু অপেক্ষার যেন আর শেষ নেই। পশুগুলিরও অবস্থা মানুষগুলোর থেকে বিশেষ হের ফের হ'ল না। তারাও এবার শরীর এলিয়ে দিতে চাইল।

এই রকম এক অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে সময় কেটে চলল। রৌদ্রতেজের আক্রমণে ঝিঁ ঝিঁ করতে লাগল যেন চারিদিক।

এরই মধ্যে সময় কাটল। সেদিনকার মত সূর্য তার যুদ্ধ বিরতি করে পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল।

এবার নির্দেশ এ'ল তাঁবুতে ফেরার। তাজা মানুষগুলো সমস্ত দিনে শারীরিক ধকল আর মানসিক পরিশ্রম নিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরে চলল শ্লথ পায়ে। যুদ্ধ করার শক্তি এবং ইচ্ছা যেন সূর্যের জলকণা শুষে নেওয়ার মত মানুষগুলোর মন থেকে শুষে নিয়ে গেল। অযৌক্তিক দাঁড়িয়ে থেকে, ধ্বসে পড়ার মত শরীর নিয়ে, আর বিরক্তিভরা মন নিয়ে ফৌজ ফিরে এল নিরুৎসাহভাবে নিজেদের ডেরায়। পরাজিত হলেও বোধহয় এমনটি হ'ত না। এক মানসিক পরাজয় নিয়ে সূচিত হল সেদিন ঔরঙ্গজেবের বিজয় পদক্ষেপ—দারার নির্বুদ্ধিতার বিনিময়ে।

ছত্রশাল ঠিকই বলেছিলেন। ওদিকে পথশ্রমে ক্লান্ত ফৌজ নিয়ে ঔরঙ্গজেব তাঁবু ফেললেন। শ্রান্ত ফৌজ বিশ্রামের আশায় গা এলিয়ে দিতে চাইল যেন। ঔরঙ্গজেব একটু আশঙ্কিত মনে অপেক্ষা করে রইলেন সামুগড়ের সেই প্রান্তরের দিকে। যদি দারা আক্রমণ করে, এই শ্রান্ত বাহিনী কি রুখতে পারবে তাদের ? হয় ত না। এখন বিশ্রাম প্রয়োজন তাঁর ফৌজের। সে রকম যদি কিছু ঘটে, হয় ত—

সাহসভরে বসে রইলেন ঔরঙ্গজেব। চিন্তার ভ্রূকুটিতে আচ্ছন্ন মুখ নিয়ে নিজেই বেরুলেন ফৌজদের উৎসাহ দিতে।

২৯শে মে, ১৬৫৮ সাল।

আবার প্রস্তুত হ'ল লড়ায়ের জন্য দারার ফৌজ। ভোর হওয়ার প্রায় কিছু সময় আগে থেকে ব্যূহ সাজান শুরু হয়ে গেল। দারার গোলন্দাজ বাহিনীকে একটি রেখায় সাজান হ'ল। কামানগুলোর পিছনে প্রায় এক হাজার বন্ধুকধারীর দল—তার পিছনে পাঁচশত উটের পিঠে ছোট ছোট কামান-দাগা সৈন্যের সারি—তারও পিছনে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হাতীর দল—তারপরই ঘোড়-সওয়ার। গোলন্দাজ বাহিনীর সঙ্গে রইলেন বিদেশী নিকলো মানুচ্চী সাহেব।

বাম ব্যূহের ভার রইল সিপির আর ফিরোজ জঙ্গের (রুস্তম খাঁন দাঘানী) উপর। সঙ্গে রইল বরহার সৈন্যরা—এরা একগুঁয়ে আর কর্মঠ যোদ্ধা। আর রইল সোঁটা-বরদার ও সিপাই মিলে দশ থেকে পনের হাজার।

এরই মাঝে সাহায্যকারী সংরক্ষিত দল হিসেবে রইল দশ হাজার রাজপুত আর দারার নিজস্ব সিপাই মিলে একটা দল। তারা প্রয়োজন মত ব্যূহের কাজে আসবে। দুজনের উপর তাদের

পরিচালনার ভার পড়ল। একজন জয়পুরের উত্তরাধিকারী, কুমার রাম সিং এবং আরেকজন সৈদ বহির খাঁন।

মধ্যে রইলেন দারা নিজে—সেই উঁচু সিংহলী হাতীটায় চড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রের যে কোন দিক থেকেই তিনি নজরে আসছিলেন এবং তিনিও সমস্ত কিছু নজর রাখছিলেন। তাঁর কাছে রইল তিন হাজার ঘোড়-সওয়ার সিপাই, নিজের দল আর শাহী-ফৌজ মিলে প্রায় বার হাজার। দু বিভাগের ফৌজের পরিচালনার ভার রইল তাঁরই অনুগত জাফর খাঁন এবং ফক্কার খাঁনের উপর।

সমস্ত হাদা, রাঠোর, শিশোদিয়া এবং গৌড়দের পরিচালনার ভার রইল বুন্দীপ্রধান ছত্রশাল হাদার উপর। আফগানদের পিছনে রইলেন দিলীর খাঁ। আর তিন হাজার বাছা বাছা ঘোড়-সওয়ার নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন আস্কর খাঁন।

ডান ব্যূহের ভার পড়ল কলিল-উল্লা খাঁর উপর। বিশেষ মাথা ঘামাবার মত লোক তার সঙ্গে কেউ নেই—রাজপুত সৈন্য দিয়েও তার দিকটা ভারী নয়। কাল রাতের ঘটনার পর রাজপুতদের প্রাধান্য তার পছন্দ নয়।

তাছাড়া এ সৈন্যদলের কোন আসল সংরক্ষিত বাহিনী নেই।

অপর পক্ষে সুসংবদ্ধ ফৌজ নিয়ে ঔরঙ্গজেব প্রস্তুত হ'লেন। গতকালের বিশ্রামের পর আজ তাদের হৃতশক্তি অনেকটা ফিরে এসেছে। সেই শক্তসমর্থ দলের কামানগুলি মীরজুমলার ইউরোপীয় গোলন্দাজের হাতে রইল।

অগ্রণী ব্যূহের ভার পড়ল ঔরঙ্গজেব-পুত্র সুলতান মহম্মদের উপর। তাকে অভিজ্ঞ নজবত খাঁনের পরামর্শ মত কাজ করতে বলে

দেওয়া হ'ল। এর সম্মুখভাগ রক্ষার জন্য দুই বিভাগে গোলন্দাজ সৈন্যদল জুলফিকার খাঁন এবং সযণ্ড শকান খানের অধীনে রইল।

ডান ব্যূহের পরিচালনার ভার রইল ইসলাম খাঁনের উপর। এখানে অন্যান্য মুসলমান অধিনায়কদের সঙ্গে রইল ধামধেরার ইন্দ্রদ্যুম্ন, চম্পত রাও বুন্দেলা, ভগবত সিং হাদা।

মুরাদ তাঁর অধীনস্থ দশ হাজারের মত সৈন্য নিয়ে বামব্যূহ রচনা করলেন।

সংরক্ষিত বাহিনীর পাঁচহাজার শক্তসমর্থ লোক নিয়ে শেখ মীর অপেক্ষা করে রইলেন পিছনে।

চিরাচরিত ভাবে ঔরঙ্গজেব উঁচু একটা হাতীর পিঠে উঠলেন, যাতে চতুর্দ্দিক লক্ষ্য করা যায়। ডান এবং বাম দিকে রইল বাহাদুর খাঁ এবং দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের নায়ক নাসিরি খাঁন।

হাতীগুলি উপযুক্ত সাজ পড়ে তীক্ষ্ণ ফলা বাধা শুঁড় নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সব ঠিক হয়ে গেলে ঔরঙ্গজেব প্রতিপক্ষের দিকে এগুতে শুরু করলেন। ধীরে ধীরে তালে তালে বাহিনী এগিয়ে চলল।

প্রায় মধ্যাহ্নের কাছাকাছি সময়ে সামুগড়ের সেই প্রান্ত সীমানায় চাঁদ অঙ্কিত নিশান দেখা গেল।

দূরে প্রতিপক্ষের অগ্রসর হওয়া দেখেই দারা তাঁর কামান গুলিকে গোলাবর্ষন করতে নির্দেশ দিলেন। কথামত কামানগুলিও গর্জন করে উঠতে লাগল পরপর। আকাশে বাতাসে কামানের আওয়াজ আর তারই সঙ্গে বন্দুকের শব্দ! চারিদিকের বাতাস বারুদের ধোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠল।

কামান, বন্দুক, কাড়া-নাকাড়া আর শিঙার আওয়াজে উত্তেজিত হাতীদের বৃংহণ শব্দ কল্লোলিত করে তুলল প্রান্তর।

অনেকক্ষণ ধরেই এসব চলল। ধোঁয়ায় সবকিছু যেন অস্পষ্ট হয়ে উঠল। তারই মধ্যে এগিয়ে আসতে লাগল প্রতিপক্ষ বাহিনী। দূর থেকে কামান বন্দুকগুলি শুধু শব্দই তুলল মাত্র—পাল্লার বাইরে থাকা ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারল না। তারা শুধু প্রতিপক্ষের কামানের জবাবে মাঝে মাঝে এক আধটা জবাব দিয়ে, গোলা বারুদ বাঁচিয়ে ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হ'তে লাগল। পাল্লার কাছে এলে জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল তারা।

এমনি করে প্রায় মধ্যাহ্নের পরই, দারার বাম পাশ থেকে কলরোল তুলে প্রায় দশ হাজারের মত ঘোড়-সওয়ার তরবারি খুলে ঝড়ের মত বেরিয়ে পড়ল রুস্তম খানের নেতৃত্বে। নিজেদের কামান বন্দুকের পাশ কাটিয়ে বারুদের ধোঁয়ার মাঝ দিয়ে অপর দিকের অগ্রসরমান সওয়ারী ফৌজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। সঙ্গে রইল সিপির।

কিন্তু সযও শকান খানের বাহিনী স্থির থেকে কামান, বন্দুক আর বর্শা—তাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আক্রমণকারীদের গতি রোধ করে দেবার চেষ্টা করল।

বিপক্ষের কামান বন্দুকে ক্ষতিগ্রস্ত রুস্তম খাঁনের গতি অনেকটা শ্লথ হয়ে এল। ক্ষতির পরিমানে আর অগ্রসর হওয়ার অসম্ভাব্যতা দেখে, রুস্তম খাঁন ডান দিকে বাঁক নিয়ে আর একটু সোজা পথের আশায় ঔরঙ্গজেবের ব্যূহের দিকে তার সওয়ারী ফৌজ নিয়ে ঢুকে পড়ল।

কিন্তু ঔরঙ্গজেবের ব্যূহের ডান দিক থেকে বাহাদুর খাঁ তার দল বল নিয়ে গোলন্দাজ বাহিনী আর ঔরঙ্গজেবের ব্যূহের মাঝখানে এসে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল।

ধূলোর ঝড় তুলে রুস্তম খাঁনও সেখানে এসে দাঁড়াল। শুরু করে দিল মুখোমুখী লড়াই। সেই লড়াইয়ের তীব্রতায় বাহাদুর খাঁ আহত হয়ে পড়ে গেল। তার অধীনস্থ অধিনায়ক সৈয়দ দিলওয়ার এবং হাদিদাদ খাঁন তরবারির আঘাতে ছিন্নমূলের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তাদের ফৌজকে প্রায় শেষ করে আনল প্রতিপক্ষ বাহিনী। অপ্রতিরোধ্য মনে হ'ল রুস্তম খাঁনের গতি। অবস্থা দেখে ইসলাম খাঁন ডান ব্যূহ থেকে সে গতি রোখবার জন্য তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। সংরক্ষিত বাহিনী থেকে শেখ মীর তার দলবল নিয়ে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য চলে এল। ডান এবং বাম দিক থেকে রুস্তম খাঁন আর সিপিরের বাহিনীকে ঘিরে চলল গুলির ছড়্রা। কিন্তু তবু যেন শেষ করা যায় না রুস্তম খাঁনের বাহিনী। তারা সমান তালে লড়ে যেতে লাগল।

ভীষণ লড়াই। রুস্তম খাঁন ভাবল, যদি আর একটু সাহায্য পাওয়া যেত, তবে....তবু রুস্তম এগিয়ে যেতে চাইল। ডাইনে বাঁয়ে তার তরবারির ঘায়ে লুটিয়ে পড়তে লাগল প্রতিপক্ষের সৈন্যরা।

হঠাৎ একটা গুলি এসে লাগল রুস্তমের হাতে। হাত থেকে তরবারীখানা খসে পড়ে গেল রুস্তমের। যন্ত্রণায় প্রথমটা একটু অস্থির হয়ে উঠল সে, কিন্তু তা সামলে নিল। নিষ্প্রাণ ডান হাতটা একবার দেখে নিয়ে বাঁ হাতে ছুরিটা টেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে চাইল সম্মুখের দিকে।

রুস্তমকে না শেষ করতে পারলে কি হবে বলা যায় না। অনেকেই তাকে ভালো রকম জানে, একাই একশ' লোকটা। আহত হওয়ার সুযোগ নিয়ে ইসলাম খাঁ এগিয়ে এল রুস্তমের দিকে। ইসলামের হাতের তরবারি মাথার উপর উঠতে দেখে রুস্তম বাঁ হাতে উদ্যত অস্ত্রের তুলনায় ক্ষুদ্র ছুরি দিয়েই সে

আঘাত সামলে নিতে চাইল। বাঁ হাতটা রুস্তম প্রস্তুত করে তুললে একবার। কিন্তু ইসলাম খাঁনের তরবারি তার মাথাটা ধর থেকে আলাদা করে দিল। তারপরই সেই মাথা নিয়ে ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ইসলাম খাঁন, তার কৃতিত্বের নিশানা হিসাবে।

রুস্তম সত্যিই রুস্তম। তারপরই রুস্তমবিহীন ফৌজ। আর কিছুক্ষণ চেষ্টা করল সিপিরও, কিন্তু ব্যর্থ হ'ল। পালিয়ে এল ক্ষীয়মান কয়েকটি সওয়ার নিয়ে।

তখন কিন্তু ঔরঙ্গজেবের বাম দিকে আরও ভীষণ লড়াই বেঁধে গেছে। মুরাদ এগিয়ে আসতে কলিল-উল্লা খাঁ তার উজবেক তীরন্দাজ দিয়ে কয়েক ঝাঁক তীর মুরাদের দিকে ছেড়ে দিয়েছিল। আর ছত্রশাল রাজপুতের দল নিয়ে এবার জুলফিকার খাঁন আর মুরাদের গোলা বর্ষণের ফাঁকে ঢুকে পড়ে প্রচণ্ড শক্তিতে মুরাদের বাহিনীকে আক্রমণ করলেন। ঔরঙ্গজেব থেকে মুরাদকে আলাদাও করে ফেললেন। রাম সিং এসে যোগ দিলেন সে দলে। তীরের জালে যেন আলো ঢেকে গেল। মুরাদের চতুর্দিক তারা ঘিরে ফেলল মার মার শব্দে। তাদের পরণে প্রিয় পীতরঙের পিরান। সেই পীতবর্ণের ঢেউ ফুঁসে উঠে এগিয়ে এল মুরাদের দিকে।

রাম সিং ছুটে এলেন মুরাদের হাতীর কাছে। হাতে তীক্ষ্ণ বর্শা, মুখে কঠিন দৃঢ়তার ছাপ। চেঁচিয়ে উঠে মুরাদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি শাহজাদা দারার কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নেবে। ঠিক আছে, নেমে এস তবে।' মাহুতের উদ্দেশ্যে হেঁকে উঠলেন, 'এই, প্রাণের মায়া থাকে ত হাতীটাকে বসা।'

হাওদায় মুরাদ চুপ করে বসে খালি ঢাল দিয়ে নিজের পুত্র ইজিদকে আড়াল করে রেখেছিলেন। তীর বিঁধে বিঁধে তার হাওদা যেন সজারুর পিঠ হয়েছে।

রাম সিং আর দেরী না করে মুরাদকে লক্ষ্য করে তাঁর হাতের বর্শা ছুঁড়ে দিলেন। কিন্তু অল্পের জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

মুরাদ পিছন থেকে তীর-ধনুক তুলে লক্ষ্য স্থির করে ছেড়ে দিলেন সে তীর। রাম সিংয়ের বুকে এসে লাগল সেই তীর। রাম সিং চিরতরে চোখ বুজলেন।

রাজপুতরা উঁচু হাতীর হাওদায় বসা মুরাদকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসতে লাগল। মরতে লাগল। তবুও ওরা এগিয়ে আসে পতঙ্গের মত। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরাদের উপর। মারতে লাগল, মরতেও লাগল। তাদের মৃতদেহে জমির উপর পীতবর্ণের আস্তরণ যেন তৈরী হয়ে গেল। তবু তারা প্রচণ্ড তেজে আক্রমণ করতে লাগল।

কিন্তু তার পিছনে রয়েছে দাউদ খাঁ। তার দলবল নিয়ে এগিয়ে এল সে। সেই সম্মিলিত আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মুরাদ পিছু হটলেন কিছুটা। তারপরই হাতীটাকে শৃঙ্খলিত করে আবার আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন।

মুরাদের ফৌজের নেতারা একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। ঢলে পড়ল ইয়া ইয়া খান, সরফরাজ খাঁন, রাণাঘরিব দাস এবং আরও অনেকে। তাঁর বাহিনীর সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীয়মান এবং কিছুটা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু মুরাদ লড়ে যেতে লাগলেন সমানে।

ইতিমধ্যে রাজপুতদের একভাগ বিজয়গর্বে মুরাদকে ছেড়ে মধ্যভাগে ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর উপর দুর্বার গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ঔরঙ্গজেব, মুরাদের অবস্থা দেখে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছিলেন তখন।

ঔরঙ্গজেবের বাহিনী এবার রুখে দাঁড়াল। কিন্তু রাজপুতরা ভাবল, যদি ঔরঙ্গজেবকে তার আসন থেকে নামান যায়, তবে জয় সুনিশ্চিত।

ঔরঙ্গজেবের আক্রমণে এক এক করে রাজপুত সৈন্য লুটিয়ে পড়তে লাগল মাটিতে। কিন্তু তারা অভূতপূর্ব প্রাণশক্তি নিয়ে মৃত্যুকে তোয়াক্কা করে: ভীষণ লড়াইয়ে মেতে উঠল। মৃত্যুপণ করে তারা ঔরঙ্গজেবকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগল। পাশে কে রইল, না রইল, কোন ভ্রূক্ষেপই নেই যেন তাদের। ঔরঙ্গজেব হাতীগুলোকে শৃঙ্খলিত করে সে ধাক্কা সামলাতে লাগলেন।

রাজা রূপসিং রাঠোর চরম দুঃসাহসে ঘোড়া থেকে নেবে মুক্ত তরবারি হাতে ছুটে চললেন ঔরঙ্গজেবের দিকে। বাধা দিতে এগিয়ে আসা সৈন্যগুলো তরবারির আঘাতে লুটিয়ে পড়তে লাগল। এবার তিনি তাঁর লক্ষ্য ঔরঙ্গজেবের কাছে পৌঁছে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর হাতীর পাশে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট—কোনমতে ঔরঙ্গজেবের হাওদার বাঁধন কেটে ফেলতে পারলে, তাঁর পতন অনিবার্য।

হাতীটার পায়ে একটা আঘাত হেনে রাজা রূপসিং প্রস্তুত হ'লেন হাওদার বাঁধন কাটতে। ছুটে এল ঔরঙ্গজেবের দেহরক্ষীরা। ঘিরে ফেলল তাকে।

দুর্জয় সাহসে ভরপুর সেই মানুষটাকে লক্ষ্য করছিলেন ঔরঙ্গজেব। মৃত্যুর প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন সেই মানুষটাকে দেখে ঔরঙ্গজেব মনে মনে তার প্রশংসা করলেন। রাজপুতরাই পারে এ ভাবে মনে দাগ কাটতে। নির্ভিক, প্রতীজ্ঞাদৃঢ় পদক্ষেপ—শত্রুনিধনে যেমন মমতাহীন, তেমনি নিজের উপরেও। শুধু এ কেন,

চতুর্দিকের রাজপুতদের দেখে তাঁর তাই মনে হচ্ছে। মরছে, তবু কামড় দিতে ছাড়ছে না।

একটু মুগ্ধ হয়েছিলেন ঔরঙ্গজেব, এই দুঃসাহসী রাজা রূপসিং রাঠোর আর তার সতীর্থদের দেখে। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর রক্ষীদলের উদ্যত তরবারি নেমে এল রাজা রূপসিং রাঠোরের মাথার উপর। লুটিয়ে পড়ল তার ছিন্ন শির মাটির উপর তাজা রক্তের ফিন্‌কি তুলে। হয় ত বাঁচালেও বাঁচিয়ে রাখতে পারতেন তিনি। কিন্তু এ মনোভাবের স্থান এটা নয়।

ওদিকে লড়াই শুরুর পর রুস্তম খাঁন আর ছত্রশাল তার দলের আক্রমণের সময়ে নিজেদের জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বাম দিক দিয়ে এগিয়ে ঔরঙ্গজেবের ডান দিকে গিয়ে পড়লেন। দারা হয় ত ভেবেছিলেন, রুস্তম খাঁন যা করেছে, বাকীটা তাঁর সম্পূর্ণ করা দরকার।

কিন্তু ঔরঙ্গজেবের গোলন্দাজের দল তখন রুস্তমের ধাক্কা সামলে উঠে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা আরো কাছে এগিয়ে আসতে ঘনঘন গোলা গুলি ছুঁড়ে অগ্রসরমান দলটাকে বিধ্বস্ত করে দিতে চাইল। প্রতিপক্ষ এতে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে একটু ছড়িয়ে ছিটকিয়ে পড়ল।

দারা যেন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তখন। ঘনঘন ইঙ্গিত করতে লাগলেন গোলন্দাজ দলের প্রতি, কামানগুলো এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য।

কিন্তু দারা এগিয়ে যাওয়ায় মানুচ্চী সাহেব অসুবিধায় পড়লেন। কোথায় কামান দাগবেন? প্রতিপক্ষ দল আর তার মাঝখানে দারা গোলার গতিপথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই ও পক্ষের কামান বন্দুকের জবাব, এ পক্ষের কামান বন্দুকে দেওয়া

সম্ভব হ'ল না। এখন দারার ইঙ্গিতে কামানগুলি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই—টানবার মত পশুগুলি গতকালের দাবাদহ আর শ্রান্তিতে চোখ বুজেছে, অথবা অক্ষম হয়ে পড়েছে। বান্দাগুলো কামান ফেলে লুঠের উপযুক্ত মাল খুঁজতে বেরিয়েছে। কি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে কামানগুলি? মানুচ্চী সাহেব নিজের মনেই মাথা নাড়লেন। কিছুই করার নেই।

শুধু তা কেন? যেখানে দাঁড়িয়ে সমগ্র দিক লক্ষ্য রেখে প্রয়োজন মত বাহিনীকে পরিচালনা করা দরকার ছিল, সেটা ফাঁকা পড়ে থাকায়, এবং সর্বাধিনায়ক দারা যথাস্থানে উপস্থিত না থাকায়, তাঁর ফৌজের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা ভাব দেখা দিল।

ওদিকে দারা অবস্থা বুঝে বিপক্ষের কামান বন্দুকের হাত এড়াতে ডান দিকে সরে এসে দল বল নিয়ে শেখ মীরের বাহিনীর উপর গিয়ে পড়লেন।

আরেক দিকে দারার স্থানত্যাগে কলিল-উল্লার সুবিধাই হয়েছিল। সে সেই একবার মুরাদের উপর কয়েক ঝাঁক তীর ছেড়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তার আক্রমণে যতটা ফল পাওয়া যেত, তা পাওয়া স্বভাবতই সম্ভব হ'ল না। তার দলে কেউবা নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, কেউবা ভবিষ্যদ্রষ্টা হ'য়ে স্থানত্যাগ করল। অধিকাংশ শাহী-ফৌজের এই একই দশা।

সে যাক। আরেক দিকে দারার স্থানত্যাগের ফলে বিশৃঙ্খলতার ঢেউ এসে ছত্রশালের বাহিনীর কাছে এসে পৌছাল। তারা একটু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ল। এখন তাদেরও স্থানত্যাগ করা উচিত কিনা তারা ভাবতে লাগল।

ছত্রশাল সে মনোভাব বুঝতে পেরে বলে উঠলেন, 'খবরদার!

নিমকহারামি করবে না। যে পালাবার কথা ভাববে, তার অভিশাপ লাগবে।’

তবু দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ল দল। ছত্রশাল আবার বললেন, ‘মার, নইলে মর। না মেরে কেউ যাব না আমরা। জীবন দিতে হয় তাও দেব।’

ছত্রশাল নিজেই এগিয়ে চললেন মুরাদের দিকে। রাম সিংয়ের পতনে মুরাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। আবার উৎসাহ নিয়ে রাজপুতেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল—মার, নয় তো মর। এই পণ।

মুরাদ সহ তাঁর বাহিনীকে রাজপুতেরা মূল বাহিনী থেকে আলাদা করে ফেলেছিল। তার একটা অংশ আবার দলবদ্ধ হতেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুরাদের উপর।

মুরাদ অবিচলিত হয়ে অপেক্ষা করে রইলেন।

ছত্রশাল আর তাঁর দল এগিয়ে চললেন বেগে। ছত্রশালের হাতে উদ্যত বর্শা। কামানের গোলা লেগে তাঁর হাতীটা আহত হয়ে ঘুরে পালিয়ে গেল। কিন্তু হাতী পালিয়ে গেলেও, তার প্রভু পালাবে কেন? ছত্রশাল হাতী থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে সামনের একটা ঘোড়া টেনে নিয়ে সওয়ারী হয়ে এগিয়ে গেলেন মুরাদকে লক্ষ্য করে। কিন্তু একটা গোলা তাঁরও গতি চিরদিনের মত রুদ্ধ করে দিল।

ছত্রশাল, রামসিং যে কথা দিয়েছিলেন দারাকে, তা জীবন দিয়ে রক্ষা করে গেলেন।

রাজপুতেরা দুর্জয়, দুঃসাহসী লড়াই করে হাসতে হাসতে প্রাণ দিল। মৃত্যুটা যেন তাদের কাছে কিছুই নয়। সব চেয়ে বড় কথা, বিশ্বাস তারা জীবন দিয়েও রাখল।

ছত্রশাল গেল। তাঁর ছোট ছেলে ভরত সিং—সেও গেল। আর গেল তাঁর ছোট ভাই মুখরাম এবং আরো অনেকে।

দারার ক্ষতির খাতায় আরো নাম উঠল। তার মধ্যে দেওয়ান মহম্মদ সালী। রুস্তম ত আগেই জীবন দিয়েছে। আর মৃত্যু মুখে ঢলে পড়েছে ভীম সিং গৌর, শিবরাম গৌর।

দারার ওদিকে তখন ঔরঙ্গজেব। রাজপুত, আর রুস্তমের আক্রমণকে জোরদার করার জন্য এত বেশী ফৌজ যোগান দিতে হয়েছে, এবং সে আক্রমণের তীব্রতায় এত বেশী সৈন্য প্রাণ দিয়েছে যে এখন প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছেন ঔরঙ্গজেব। দারা যদি কোনমতে তাঁর কাছে ঠেলে গিয়ে উঠতে পারেন, হয় ত আজকের ফলাফল দারার দিকে যেতে পারে। কিন্তু পারবেন কি তিনি? পারবেন কি বিজয়লক্ষ্মীর তিলক কপালে আঁকতে?

দারা কিছু মুহূর্তের জন্য থামলেন। প্রান্তরের উপরে কিছু বাধা এবং পরিশ্রান্ত হয়ে পরার দরুন শ্লথ হয়ে এল তার গতি। সম্মুখের সাফল্যের হাতছানি বুঝি মিলিয়ে গেল শূন্যে।

কিন্তু এরই মধ্যে ঔরঙ্গজেব প্রস্তুত হয়ে নিয়েছেন। সাজিয়ে নিয়েছেন তাঁর বাহিনী—পেয়েছেন ভাববার সময়।

দারা সম্মুখের দিকে এগিয়ে না এসে, নিজেরই ডান দিকে ছত্রশালের বাহিনীকে সাহায্যের জন্য চললেন।

মাথার উপরে খরতেজী সূর্যতাপ। তাপে চর্ম, চর্মের অন্তরালে দেহে ফোস্কা পড়ছে যেন। জ্বলে যাচ্ছে শরীর। তার উপর তৃষ্ণা —কিন্তু জল কোথায়? দারার বাহিনী মরে বেঁচেছিল। তার উপর গোলন্দাজের গোলাগুলিতে বেশ কিছু প্রাণ গিয়ে দলের সংখ্যা কমিয়ে আনল।

এতক্ষণ সুশৃঙ্খলভাবে অপেক্ষা করছিল ঔরঙ্গজেবের বাহিনী।

সুযোগ বুঝে মহম্মদ সুলতান তার বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন দারার ফৌজকে আক্রমণ করার জন্য। একই সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঔরঙ্গজেবের ডান দিকের বাহিনী। ডান ও বাম প্রান্তরের কামানগুলি নিশ্চিন্তে গর্জন শুরু করে দিল।

এবার শুরু হ'ল দারার নিঃশেষ হবার পালা। দারা সে ভাঙন রোখবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সেই খরস্রোতে তা বিফল হ'ল। তার সামনেই আগুনের হল্কা শুদ্ধ গোলা এসে পড়তে লাগল। সঙ্গে ঘনঘন হাউই। সমস্ত কিছু দারাকে ঘিরে ধরল চতুর্দিকে থেকে। এত কাছে যে তার বাহন হাতীর উপর যে কোন মুহূর্তে গোলা এসে পড়তে পারে। লক্ষ্য তাদের দারাশিকো।

শঙ্কিত হয়ে উঠল বান্দা বসন্ত, গুলমহম্মদ, দাউদ খাঁ। তাদের বাহিনীর একে একে সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। দারার প্রাণ সংশয় হয়ে উঠছে হাউই আর গোলার আক্রমণে। যে কোন একটি গোলা এসে পড়তে পারে দারাকে লক্ষ্য করে—এত কাছে, এত ঘনঘন পড়ছে সেগুলো।

বান্দা বসন্ত আর থাকতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল, 'মালিক, আপনি নেমে আসুন।'

দারার তখন কিছু বোঝার মত মনের অবস্থা নেই। অবস্থার অবনতি এবং ঘটনার গতিতে মন বিভ্রান্ত।

'মালিক, নেমে আসুন।' বান্দা বসন্ত আবার শঙ্কাভরা গলায় চিৎকার করে উঠল।

দারা একবার এদিকে ওদিকে তাকালেন। গোলা-হাউইয়ের মারণ-যজ্ঞের ফল দেখলেন। ছুটে আসছে গর্জন করে আরো—আরো। দারা হাওদাতে জুতো, বর্ম, অস্ত্র সবকিছুই রেখে নেমে পড়লেন তাড়াতাড়ি। উঠলেন একটা ঘোড়ায়। আর

সেটাই হ'ল লড়ায়ের সমাপ্তি ঘোষণা—দারার ভাগ্যাকাশে সূর্য্যাস্ত নেমে এল।

ঔরঙ্গজেব ওদিকে দারার হাওদা শূন্য হতে দেখেই বাজিয়ে দিলেন বিজয় ডঙ্কা।

শাহী-ফৌজের কেউ কেউ যুদ্ধ শুরুর পরই পালিয়ে ছিল। কেউবা গা ঢাকা দিয়ে, কেউবা লড়াই করার ভান করেছিল। যারা ছিল, তারা শুধু পালিয়ে যাবার মত সুযোগের একটা অপেক্ষায় ছিল—যাতে মুখরক্ষা হয়। দারার শূন্য হাওদাই সেই সুযোগ করে দিল। সময় নষ্ট না করে তারা পালিয়ে বাঁচল।

যারা তখনও সেই বিশৃঙ্খল অবস্থার মাঝেও রৌদ্রতাপ শারীরিক কষ্ট, তৃষ্ণা সহ্য করে লড়ছিল, তারাও শূন্য হাওদা দেখে ভাবল, তাদের শাহজাদা দারা পড়ে গেছে যখন, তখন কার জন্য আর যুদ্ধ করা? গরম হাওয়ার ঝাপটা তাদের চোখে মুখে এসে লাগল। শাহী-ফৌজের পৃষ্ঠ প্রদর্শন দেখে তারাও স্থানত্যাগ করতে লাগল দলে দলে।

দারা প্রায় একাই পড়ে রইলেন সেই প্রান্তরে। একটু যেন হতভম্ব তিনি নিজের এই বিপর্যয়ে। এ কি হ'ল? দারা চারিদিকে শূন্য চোখে চেয়ে দেখছিলেন। তখনও অবশ্য তাঁকে ছেড়ে যায় নি গুলমহম্মদ, দাউদ খাঁ, তুলীচাঁদ, বান্দা বসন্ত, মানুচ্চী সাহেব—আরও কিছু লোক। যাঁরা তাঁকে ভালবাসে, যারা তাঁর অনুগত এবং তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা প্রাণের মূল্যেও তারা দিতে প্রস্তুত।

প্রতিপক্ষ আরও এগিয়ে আসছে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক বান্দা বন্দুকের গুলিতে লুটিয়ে পড়ল। সিপির কেঁদে উঠল। সিপিরের কান্নায় দারার সম্বিত ফিরল।

সিপিরের একটা হাত দারা নিজের মুঠোয় ধরে বললেন, 'সিপির, কেঁদ না।'

সিপির দারার স্নেহভরা কণ্ঠ শুনে কান্নার বেগ কমিয়ে ফোঁপাতে লাগল।

শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে আসছে অপর পক্ষ। গোলা, গুলি, তীরের বিরাম নেই তখনও। আর সেখানে থাকা বিপজ্জনক। সকলের চেয়ে শাহজাদা দারাশিকোরই বাঁচার প্রয়োজন বেশী। গুলমহম্মদ এগিয়ে এসে দারাশিকোর ঘোড়াটার লাগাম চেপে ধরল। আর দাউদ খাঁ সিপিরের ঘোড়ার লাগাম—দুজনে দু'টো ঘোড়াকে টেনে ছুটিয়ে নিয়ে চলল আগ্রার দিকে। দারা শুধু নীরবে বসে রইলেন পরাজয়ের গ্লানি পাষাণ বুকে নিয়ে।

ছত্রশাল নেই—রাম সিং নেই—রুস্তম নেই, কেউ নেই—কিছুই নেই আজ তাঁর। সব বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর বিরূপ ভাগ্যের ঝুলিটার মধ্যে।

এইভাবে দারা ঘোড়া ছুটিয়ে দুই থেকে আড়াই ক্রোশ পথ এলেন। কিন্তু শরীর আর চলে না। গত দু'দিনের শ্রান্তি, আর মানসিক অবসন্নতায় শরীর আর চলতে চায় না। তাই একটু বিশ্রাম অপরিহার্য হয়ে উঠল তাঁর।

দারা বলে উঠলেন, 'গুলমহম্মদ, একটু দাঁড়াও এবার। একটু বিশ্রাম নি।'

দাউদ খাঁ পিছনের দিকে একপলক দেখে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু শাহজাদা—'

দারা ঘোড়া থামিয়ে বললেন, 'শরীর আর চলতে চাইছে না দাউদ খাঁ। একটু বিশ্রাম নিতেই হবে।'

অগত্যা থামতেই হ'ল তাঁকে। একটা ছায়ায়ভরা গাছের তলায়

সিপিরকে বসিয়ে শিরস্ত্রাণটা খুলে গত ছুদিনের ধকলে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলেন তিনি। একটা নিঃশ্বাস দীর্ঘ করে নিয়ে চোখটা একটু বুজলেন।

কিন্তু দূর থেকে তখনই ভেসে এল কাড়া-নাকড়ার শব্দ—বিজয়ের সরব ঘোষণা। শঙ্কিত হয়ে উঠল আবার সবাই। এবার প্রাণ নয়—ঔরঙ্গজেবের বাহিনী যদি এসে শাহজাদা দারাকে ধরে ফেলে, বন্দী করে? তাছাড়া তারা হয় ত পিছু ধাওয়া করেছে—সুতরাং মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যায় না।

গুলমহম্মদ দাউদ খাঁর ইঙ্গিতে এগিয়ে এসে বললে, 'শাহজাদা, এবার উঠুন। ওরা বোধকরি এগিয়ে আসছে।'

'আর একটু বসতে দাও গুলমহম্মদ।' দারা ক্লান্ত স্বর টেনে টেনে বললেন।

'কিন্তু শাহজাদা এরপর হয় ত—' গুলমহম্মদ আবার অনুনয় করল।

'না গুলমহম্মদ, এখন আমি একটু বিশ্রাম করব।' দারা আবার চোখ ছুটি বুজতে চাইলেন।

দাউদ খাঁ বলল এবার, 'ওরা এগিয়ে আসছে হয় ত শাহজাদা।'

'আসুক। যা ঘটবার তা ঘটবেই। এর থেকে আর খারাপ কি হবে? ওরা এসে আমায় লজ্জা থেকে মুক্তি দিক।' দারা বললেন।

'কিন্তু শাহজাদা, ওরা যদি আপনাকে বন্দী করে?' ছুনীচাঁদ বলল এবার।

'করুক।' ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে বললেন দারা। সিপির চুপ করে মাথা নীচু করে বসেছিল। তার গালে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি।

'শাহজাদা, এভাবে ধরা দিয়ে কি লাভ? আপনি আবার একটা সুযোগ নিতে পারেন, হৃত সম্মান আবার ফিরিয়ে আনার জন্য। বন্দী হলে ত সে সুযোগটা থাকবে না শাহজাদা।' মানুচ্চী এবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন দারাকে।

'সুযোগ?' দারা সেই দুঃখের মাঝেও হাসতে চেষ্টা করেন।

'হ্যাঁ শাহজাদা। আবার চেষ্টা করে শক্তি সঞ্চয় করে এর মোকাবিলা করতে হবে। সবই ত এখানে শেষ নয়।' দুনীচাঁদ বলল।

বিজয়ীদের কাড়া-নাকড়া আর ভেরীর শব্দ যেন জোরে শোনা যায়। সকলে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ফিরে তাকায় সেইদিকে।

গুলমহম্মদ মিনতিভরা কণ্ঠে বললে, 'শাহজাদা।'

দারা মাথাটা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, চল। আগ্রা পৌঁছেই বিশ্রাম নেব। তারপর জানি না কি ঘটবে।'

দারা উঠে দাঁড়ালেন। চিন্তাভারাক্রান্ত মস্তকে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। আবার ছুটে চলল সবাই আগ্রার দিকে। আগামী ভবিষ্যতের কথা কেউ জানে না। নীরব বিষণ্ণ দল ফিরে চলল দ্রুত বেগে। জানে না তারা, কতদূরে রয়েছে ঔরঙ্গজেবের বিজয়ী দল।

২৯ শে মে, ১৬৫৮ সাল।

আগ্রা।

আগ্রার প্রাসাদে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল সবাই। আগ্রাবাসী এবং দরবারের সকলে। বহু দূরাগত কামানের অস্ফুট শব্দ যেন লড়ায়ের সংবাদটাকে বাতাসে ভাসিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু ফলাফলের খবর বয়ে আনে নি।

সবার মুখ:চিন্তিত।

শাজাহান চোখ দুটি মেলে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে স্তব্ধ হয়ে

বসেছিলেন। বুকের উপর হাত দুটি জড়ো করে, মনে অনিশ্চয়তার ভাব নিয়ে দারার অমঙ্গল আশঙ্কায় থরথর করে কেঁপে উঠছিল বুকটা। তবু সে ভাবনা জোর করে মন থেকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি। জাহানারা দাওয়াই নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, তিনি হাতের ইঙ্গিতে সরিয়ে নিয়ে যেতে বললেন সেই দাওয়াই।

জাহানারা সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাত থেকে নামিয়ে রেখে দিলেন দাওয়াই। আস্তে আস্তে সরে গিয়ে ক্ষীণ কামানের শব্দ ভেসে আসছিল যে দিক থেকে, সেইদিকে চোখ দুটি মেলে যেন জানবার চেষ্টা করলেন—খবর কি ?

রোশেনারা উদগ্রীব হয়ে বসেছিলেন। চোখের দৃষ্টি তার খর, জিজ্ঞাসু হয়ে ঝকঝক করছে। ঔরঙ্গজেব কি জিতবে ? পারবে দারাকে হারাতে ? তাহ'লে দারা, তোমার—। বাঁকা একটা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। কিন্তু কোন খবর নেই। অসহ্য লাগে রোশেনারার। মনে হয়, ছুটে গিয়ে দেখতে যায় সে, লড়াইটা কোন্ পথে চলেছে।

রাণাদিলের ঘরে নাদিরা চুপ করে শুয়েছিল পালঙ্কে। চিন্তাচ্ছন্ন মনের ভিতর ছটফটানি নিয়ে আর যেন পারছিল না সে। মনটা যেন ভার হয়ে উঠেছে। বুকের মধ্যে যেন একটা দমফাটা চাপ। রাণাদিলের একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছিল সে।

রাণাদিল একটু শক্ত হয়েই বসেছিল, নিজের হাতখানা নাদিরার হাতে সঁপে দিয়ে। উপর উপর রাণাদিলকে শান্ত দেখালেও ভিতরে তার আশঙ্কার অস্বস্তি। তবু সে স্থির রেখেছিল নিজেকে। কিন্তু যদি অন্য কিছু ঘটে, যদি·····না, সে চিন্তা করবে না। ভালো

হোক, মন্দ হোক, জিত হোক, হার হোক, সে আর বহিন নাদিরা দারার পাশেই থাকবে সবসময়। কিন্তু কি হ'বে? খবর আসার প্রতীক্ষায় উদ্বেগভরা বুক নিয়ে বসে থাকতে হবে। শাহজাদা কি তাঁর অধিকারের দাবি লড়ায়ে জিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন?

দানিশমন্দ অন্য ওমরাহদের সঙ্গে বসে অপেক্ষা করছিলেন খবরের জন্য। কি ঘটছে সেখানে? সবার চোখ ছটফট করছে ঘোড়ার খুঁড়ের শব্দে। সামান্যতম শব্দে চমকে ওঠে সবাই? হাকিম দাউদ শুধু দেখতে চাইছিল, কোন্ পাল্লাটা ভারী হয়। সে দিকেই চড়ে বসতে হবে তাকে।

দানিশমন্দ ভাবছিলেন, এইখানেই কি এই বিপদের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে?

আগ্রাবাসীরাও এই স্রোতেই ভাসছিল। তবে তারা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল মনে মনে। চিন্তাকুল মুখে ভাবছিল, যদি দারার জয় হয়, তাহলে সব ঠিক থাকবে। কিন্তু যদি অপর পক্ষের জয় হয়, তবে? তবে কি ঔরঙ্গজেব আর মুরাদের বাহিনী বিজয়োল্লাসে এখানে এসে তাদের বিজয় উৎসব পালনের জন্য খুনখারাবি করবে? লুঠ করবে? নারীহরণ করবে? তাদের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে?

কিন্তু খবর কিছুই আসে না। দুপুর গড়িয়ে এল অপরাহ্ন। লড়ায়ের প্রারম্ভে যারা লড়াই ছেড়ে তড়িঘড়ি চলে এসেছিল একে একে, তারা আগ্রায় পৌঁছাতে লাগল।

'কি খবর?'

'শাহজাদা দারাশিকো হেরে গেছেন।' ঘিরে থাকা উদগ্রীব মুখের মানুষগুলোর চাপে জবাব দিল হয় ত কেউ।

'শাহজাদা দারাশিকোর খবর কি ?'

একটু ইতঃস্তত করে জবাব দেয় তারা, 'ঠিক জানি না।'

'কিন্তু তোমরা এত তাড়াতাড়ি পৌঁছালে কি ক'রে ?' লড়াই ত মনে হয় চলছে এখনও !' 'তোমরা লড়াই কর নি ?' 'কি রকম ক্ষয়ক্ষতি হ'ল ?'

প্রশ্নগুলোর উত্তর পাওয়া গেল না। এড়িয়ে গেল হয় ত কেউ। সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে সবাই অপেক্ষা করে রইল। যা বলছে পলাতকেরা, তা ঠিক নয়। সবাই তা বুঝতে পারে। কিন্তু প্রতীক্ষাই উত্তর যুগিয়ে দেবে।

সম্মুখে পালিয়ে যাওয়া প্রতিপক্ষের দলগুলির দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে দারার অন্বেষণে চতুর্দ্দিকে একবার চোখটা ভালো করে ঘুরিয়ে নিতে থাকলেন ঔরঙ্গজেব। অপস্থয়মান কতকগুলো পলায়নপর দল। বলতে গেলে শত্রুপক্ষের একজনও তাঁর সম্মুখে নেই এখন। কিন্তু দারা কোথায় ? দারাকে তাঁর চাই। দারার উপর বহুদিনের প্রতিঘাতের সুযোগ আজকের বিজয়ে আংশিক মিটল যেন। না, দারা নেই। চতুর্দ্দিকে পড়ে থাকা মৃতদেহ—মাঝে মাঝে পিতবর্ণের আস্তরণ—রাজপুতদের মৃতদেহের চিহ্ন তাদের প্রিয় পিরানের রঙ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। মৃত্যুভয়হীন একটা জাত। হাসতে হাসতে যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে এরা পিছপা নয়। বীরের জাত বটে ! কিন্তু না, দারা বোধহয় পালিয়েছে। কিন্তু কতদূরে যাবে ঔরঙ্গজেবের হাত এড়িয়ে ? ঠিকই ধরা পড়বে একদিন। সবই সম্ভব হয়েছে খোদার দোয়ায়। তাঁর সুপ্রসন্নতা ঔরঙ্গজেবের ওপর না থাকলে আজকের সাফল্য অসম্ভব ছিল।

হাতীটা থামাতে বললেন ঔরঙ্গজেব। মাটিতে নেমে সেখানেই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে কৃতজ্ঞচিত্তে খোদাকে স্মরণ করলেন একবার।

আবার হাতীতে উঠে চললেন দারার তাঁবুর দিকে। দারার তাঁবু তখন লুণ্ঠিত, হতশ্রী, এলোমেলো চেহারা নিয়ে শূন্যগর্ভ হয়ে পড়ে রয়েছে সেই প্রান্তরের পাশে। ঔরঙ্গজেব তার মাঝে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন সন্তুষ্টির একটা নিঃশ্বাস ফেলে। একে একে সেনাধ্যক্ষরা এসে ঔরঙ্গজেবকে জানালেন বিজয় অভিনন্দন।

ঔরঙ্গজেব পাল্টা অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, 'পরিশ্রম ও কুশলতার জন্যই এই জয় সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মুরাদ কোথায়? তার ত এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল।'

'তাঁকে এদিকে আসতে দেখেছি।' শেখ মীর জানালেন।

তার কথা শেষ হতে না হতেই এসে উপস্থিত হ'লেন মুরাদ বক্স। অবসন্ন, আহত। তবু জোর করে নিজেকে টেনে নিয়ে এসেছেন তিনি। মুখের আহত জায়গা থেকে অল্প অল্প রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

ঔরঙ্গজেব মুরাদকে দেখতে পেয়ে শশব্যস্তে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, 'এস, ভাই এস।' সম্মিলিত দলটির দিকে এবার চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'তোমরা শুনেছ মুরাদের বীরত্বের কথা। কিন্তু আজ দেখলে ত সে কথা ভুল শোন নি।' আবার মুরাদের দিকে ফিরে বললেন, 'মুরাদ, তোমার জন্য আজ আমাদের জিত হয়েছে। তুমি যদি আমাদের পাশে না দাঁড়াতে, তাহ'লে আজ কিছুতেই আমরা জিততে পারতাম না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভাই, বস।'

ঔরঙ্গজেবের উচ্ছ্বাস প্রকাশে কোন সাড়া না দিয়ে মুরাদ শ্লথ পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন মাঝের দিকে ফেলে যাওয়া শয্যার কাছে। তার উপর বসে দেহরক্ষার বন্ধনীগুলি আস্তে আস্তে খুলে ফেললেন তিনি।

ঔরঙ্গজেব ত্রস্তে এগিয়ে এলেন তার কাছে। পোষাকটা রক্তে ভিজে আটকে রয়েছে দেহের সঙ্গে। ঔরঙ্গজেব একপলক দেখে নিয়ে ইঙ্গিত করলেন মুরাদের পোষাকটা খুলে দিতে। শেখ মীর এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি।

পোষাক খোলা হতে দেখা গেল, আঘাত বেশ ভালোই লেগেছে। ক্ষতমুখ দিয়ে এখনও রক্ত ঝড়ছে। কিন্তু মুরাদ নিজেকে এখনও ঋজু করে রেখেছেন। শরীরটাকে অবসন্নতাসত্বেও এলিয়ে পড়তে দেন নি।

ঔরঙ্গজেব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন মুরাদের কাছে। তাঁর দিকে চেয়েই শেখ মীরকে নির্দেশ দিলেন, 'শীগ্র গিয়ে হাকিমকে খবর দাও। সে যেন এখনই চলে আসে।'

শেখ মীর আদেশ পালন করার জন্য নিজেই বেরিয়ে যায়।

ঔরঙ্গজেব মুরাদের পাশে বসলেন। বললেন, 'মুরাদ, এবার একটু শুয়ে পড়।'

'না, ঠিক আছে।' মুরাদ নিজের কষ্টটা যেন কিছুটা গায়ের জোরে অস্বীকার করতে চান—সেই রকম স্বরই তাঁর গলায় শোনা গেল।

ঔরঙ্গজেব বুঝলেন। একটু হেসে বললেন, 'না নয়। সকলেই ক্লান্ত, তুমিও ক্লান্ত। বিশ্রাম নাও। আর রক্তটা দেহের একটা শক্তি—সেটার ক্ষতি হলে দেহেরও ক্ষতি। তুমি একটু শোও। এখুনি হাকিম এসে পড়বে। তোমার আঘাতের চিকিৎসা হবে। রক্ত অনেকটাই দেহ থেকে বেরিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। নাও, শুয়ে পড়।' তিনি নিজেই মুরাদকে ঠেলে শুইয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

মুরাদ ঔরঙ্গজেবের কথায় আস্তে আস্তে দারার পরিত্যক্ত শয্যায় শুয়ে পড়েম। সত্যিই বড় অবসন্ন বোধ হচ্ছে তাঁর। হাকিমের দাওয়াই, আর একটু বিশ্রাম পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

একজন হাকিম নয়—শেখ মীর বাছাবাছা দু'চার জনকে ধরে নিয়ে এল।

তারা ঘরে ঢুকে মুরাদের ক্ষত পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঔরঙ্গজেব মুরাদের মাথার কাছে বসে তাঁর মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিলেন। আস্তে আস্তে নিজের আস্তিনটা দিয়ে মুখের রক্তটা মুছে দিলেন। তারপর চুঁইয়ে পড়ে ক্রমশঃ জমাট বাধতে থাকা দেহের রক্তও মুছে দিয়ে হাকিমদের পরীক্ষার জন্য শেষপর্যন্ত বসে রইলেন। ইঙ্গিত করলেন আবার শেখ মীরকে, মুরাদের মাথা রাখার জন্য একটা কিছু জোগাড় করে আনতে।

হাকিমরা দেখে বললে, 'কোন ভয়ের কিছু নেই। তারা ক্ষত বেঁধে দিয়েছেন। দাওয়াইয়ের ব্যবস্থাও করছেন। সে দাওয়াই খেলে, আর কিছু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

ঔরঙ্গজেবও জানতেন, ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। বিশেষ করে মুরাদের শারীরিক ক্ষমতা তাঁর ত জানা।

সেখ শিকান খাঁন এসে জানালে, 'ঔরঙ্গজেবের তাঁবু এসে পৌঁচেছে এবং তা এতক্ষণে প্রস্তুত হয়ে গেছে।'

ঔরঙ্গজেব মুরাদের মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'মুরাদ, তুমি এখানে বিশ্রাম নাও। বেশী নড়াচড়া করার কি দরকার।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'আজকের লড়ায়ে দারাকে হারিয়ে দিয়ে, তার ফেলে যাওয়া তাঁবুটা দখল করে—'

ঔরঙ্গজেবের কথা থামিয়ে দিয়ে মুরাদ বলে উঠল, 'আমি এ তাঁবুতেই থাকব। দারাকে হারিয়ে পবিত্র ইসলামকে বাঁচিয়েছি। এখানে থাকলে মনে হবে, দারার রাজ্য কেড়ে নিয়ে তাকে ভিখারীর মত তাড়িয়ে দিয়েছি।'

মুরাদের মুখরতায় ঔরঙ্গজেব একটু হেসে কয়েক মুহূর্ত পর বললেন, 'ঠিক কথা। শোন মুরাদ, আমি ঘোষণা করে দিচ্ছি যে, আজকের দিন থেকে তোমার রাজত্বের শুরু হ'ল। এবার তোমার দলকে আনন্দ করতে বল।'

'বেশ। কিন্তু যেন ভুলে—' মুরাদ বলে উঠল শয্যায় শুয়ে থেকে।

ঔরঙ্গজেব বুঝতে পারলেন, মুরাদ কি বলতে চায়। তিনি মুরাদকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'না, না, ভাই, তুমি সে বিশ্বাস আমার উপর রেখ। আমাদের মধ্যে যা চুক্তি হয়েছে, আমি যা বলেছি, তাই হবে। এখন আর কথা বল না, বিশ্রাম কর। আমি শেখ মীরকে তোমার কাছে রেখে যাচ্ছি। দরকার হলে সে তোমার কাজ করে দেবে।'

ঔরঙ্গজেব কথা শেষ করে আর দাঁড়ালেন না সেখানে। বেরিয়ে এসে প্রান্তরের দিকে আবার তাকালেন তিনি। দারাকে বিধ্বস্ত করে একরকম শেষই হয়েছে তাঁর কাজ। কিন্তু আফশোষ, তাকে জীবন্ত অথবা মৃত অবস্থায় ধরা গেল না। তবে ধরা তকে দিতেই হবে।

নিজের তাঁবুতে ঔরঙ্গজেব সেদিন দরবার বসালেন। যারা এ লড়ায়ে বীরত্ব দেখিয়েছে, তাদের তিনি পুরস্কৃত করলেন। বিশ্বস্ত আজম খাঁনের জন্য শোক প্রকাশ করলেন। আহত বাহাদুর খাঁন ও জুলফিকার খাঁনের ত্বরিত সুস্থতা কামনা করলেন।

এবার আগ্রা। পরিতুষ্ট ঔরঙ্গজেব দেহটা শয্যায় এলিয়ে দিয়ে একটু ভাবলেন। চোখটা বুজলেন ভবিষ্যৎ চিন্তায়।

সারা রাত সেখানে সৈন্যদের হৈ-চৈ চিৎকার। সুরার নেশায় মত্ততা—আমোদ নিয়ে প্রান্তরটা মুখরিত হয়ে উঠল। চতুর্দ্দিকে

জ্বলে থাকা আগুনে রাত্রির অন্ধকার দূর করে এ যেন বিজয় ঘোষণা প্রকাশের প্রয়াস! মুখরিত সামুগড়ের সেই প্রান্তর।

ওদিকে আগ্রায় সন্ধ্যাকে ঠেলে সরিয়ে রাত্রি নেমেছে। নেমে এসেছে নিস্তব্ধতা। উদ্বিগ্ন আগ্রাবাসী চুপ করে সবাই অপেক্ষা করছে। থমথম করছে যেন চারিধার।

হঠাৎ সেই স্তব্ধতা খানখান করে ভেঙে দিল। ছুটে আসা ঘোড়ার খুড়ের শব্দ চকিত করে ছুটে চলল যমুনার দিকে।

রাত্রির আঁধারে আঁচলে মুখ লুকিয়ে দারা আবার ফিরে এলেন আগ্রায় পরাজিতের লজ্জা নিয়ে। দারা সোজা এসে থামলেন নিজের মহলের সামনে। সকলকে বিদায় দিয়ে সিপিরের হাত ধরে মহলে ঢুকবার আগে আগ্রার দুর্গের দিকে একবার তাকালেন। হয় ত এখনও তাঁর অপেক্ষায় বসে আছেন শাজাহান বিনিদ্র চোখে। তাঁর দারার লজ্জার খবর পেয়েছেন কি না, কে জানে? আর অপেক্ষা করে আছেন বহিন জাহানারা বেগম।

কল্পনা করেছিলেন, গর্বিত পদক্ষেপে এসে শাজাহানকে বলবেন, লড়ায়ে তাঁর জিত হয়েছে। ঔরঙ্গজেব আর মুরাদ উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়েছে। কত হাসি—কত গান? কত রোশনাই জ্বালান হ'বে। কিন্তু ভাগ্যের বিরুদ্ধ গতিতে নিজেই পালিয়ে এসেছেন তিনি —অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ঢুকে পড়তে চাইছেন নিজের গহ্বরে।

একটা নিঃশ্বাস দীর্ঘাকারে ফেলে ধীরে ধীরে মহলে ঢুকে বান্দা বসন্তকে বললেন, 'বসন্ত, ফটকটা বন্ধ করে দে।'

'জো হুকুম মালিক।' বসন্ত দারার আদেশ পালন করল।

সিপিরকে সঙ্গে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন শা'ই-বুলন্দ-ইকবাল দারাশিকো নত মস্তকে।

নাদিরা ত্রস্তে ছুটে এল। সিপির আর দারাকে দেখে অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত হ'ল তার মন। কিন্তু ধূলি ধূসরিত পোষাক, ভেঙে পড়া চেহারা, মলিন মুখ আর নত দৃষ্টি দেখে খবরটার আভাস যেন পেল সে। তবু সে দ্বিধা জড়ান স্বরে প্রশ্ন করল, 'শাহজাদা ?'

আস্তে আস্তে চোখ তুললেন দারা। নাদিরাকে দেখলেন। দেখলেন তার পেছনে ছুটে আসা রাণাদিলকে।

রাণাদিল তাকাল দারার অপাঙ্গে। বিপর্যয় যেন এক মুহূর্তেই বোঝা যায়। সুতরাং কি জবাব হবে সে জানে। অবসন্ন মন—সেই সঙ্গে শরীরটাও আর দাঁড়াতে চায় না—চোখ বুজে সে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রাখে।

দারা দুজনকে দেখে নিয়ে আবার চোখ নামালেন। ক্লান্ত স্বরে জবাব দিলেন, 'আমি হেরে গিয়েছি।'

রাণাদিল, নাদিরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। রাণাদিল এতক্ষণ শক্ত থেকেও দারার কণ্ঠে সর্বহারার স্বর শুনে আর থাকতে পারল না। সিপির দৌড়ে এসে তার আম্মাজানের বুকে মুখ লুকাল।

দাসী বাঁদীরাও বাদ গেল না। তাদের প্রিয় শাহজাদার পরাজিত হওয়ার বেদনা তাদেরও অভিভূত করল।

দারা দুই বেগমের দিকে তাকালেন। ভাঙা ভাঙা স্বরকে জমাট বাঁধানোর চেষ্টা করে বললেন, 'কেঁদ না তোমরা।'

কিন্তু মন সে বাধা মানে কই ? দারা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আমি বড় ক্লান্ত। একটু বিশ্রাম নেব।'

দারা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন বিশ্রামের আশায়। তবে বেশীক্ষণ নয়। পিছনেই আছে ঔরঙ্গজেব, মুরাদের দল। আর করণীয় কতকগুলি কাজ—তাড়াতাড়িই সেরে ফেলতে হবে সেগুলো। তারপর ত বেরিয়ে পড়তে হবে এ মহলের মায়া ছেড়ে।

খবর পৌঁছল ছুর্গের অন্দর মহলে। শাজাহান স্তব্ধ হয়ে গেলেন যেন সে সংবাদে। জাহানারা কাঁদলেন। কাঁদল সিতি উন্নিসা, আর হারেমের জেনানারা।

রোশেনারা হাসিতে ভেঙে পড়ে চোখের জল ফেলে ভাবল—এবার দারা। বুকভরা খুশী নিয়ে সুর্যোদয়ের অপেক্ষায় রইল সে।

সূর্যও উঠল ঠিক সময়ে। এবার আলোয় ভরবে চারদিক। দারার মন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেখানে কি আলোর আশা আর আছে? কে জানে? পালঙ্কে শায়িত অবস্থায় একটা হাত চোখের উপর রেখে নিঃসারে পড়েছিলেন তিনি। চিন্তায় আচ্ছন্ন যেন।

নাদিরা ক্লান্ত শরীরে তাঁর পাশে বাম হাতের উপর মাথাটা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। রাণাদিল পালঙ্কের বাজুতে মাথা রেখে শূন্য চোখ মেলে রেখেছিল বাহিরে। দৃষ্টিটা বাতায়ন পেরিয়ে অন্ধকারটা চিরে চলে গেছিল বোধহয় বহুদূরে।

গত ছুদিনের ক্লান্ত দেহটা শয্যায় রেখে কিছুটা ঘুমে কিছুটা চিন্তার ভারে সময় কাটাচ্ছেন দারা।

সম্মুখের এগিয়ে আসা দিনগুলির কথা ভেবে তার স্পষ্ট সমাধান মনে আসতে চাইছে না। শুধু তাঁর বিপর্যয়ের ছবিটা মাঝে মাঝে হানা দিয়ে যাচ্ছে।

কি লাভ হ'ল এই লড়াই ক'রে। নির্বিবাদে মসনদের অধিকার ছেড়ে সরে দাঁড়ালেই ভালো হ'ত। দারার মনে অনুশোচনা, হতাশা। কিন্তু যে তীর হাত থেকে বেরিয়ে গেছে, তা ত আর তূণে ফিরে আসবে না।

বাদশাহ শাজাহান এ বিরোধ নিষ্পত্তির করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজেই তা হ'তে দেন নি। শাজাহানের স্নেহের সুযোগ তিনি নিয়েছেন—শাজাহান তা মেনেও নিয়েছেন। কিন্তু

একটু যদি কঠোর হতেন তাঁর উপর—আব্বাজান তাঁর কথা যদি না শুনতেন, তাহলে···

দারাকে শাজাহান অত্যধিক স্নেহ করেন। দারা সেই স্নেহের সুযোগ নিয়েছেন—ধন-সম্পত্তির অপচয় করেছেন। শক্তির অপব্যবহার করেছেন মসনদ নিয়ে টানাটানি করে। তার ফলাফল আজ কি হয়েছে? দারার অবস্থাই আজ আঙুল তুলে তাঁকে দেখিয়ে দিচ্ছে—দেখ, তোমার যেমন কর্ম তেমনি ফল তুমি পেয়েছ।

মসনদের লড়াই থেকে সরে দাঁড়ালে, আজ আর পেছনে ছুটে আসা ঔরঙ্গজেব আর মুরাদের কথা মনে হ'ত না। বাদশাহের গৌরব-মুকুট মাথায় চাপত না হয় ত, কিন্তু জীবনটা সৌরভে ভরে থাকত। নাদিরা, রাণাদিল, সুলেমান, সিপির, পাকনিহাদ, জাহানজেব আর আমল উন্নিসা, এদের নিয়ে আর লেখাপড়ার মধ্যে জীবনটা শান্তিতেই কেটে যেত। কিন্তু এখন এ মুহূর্তে প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে, এই বুঝি তারা তাকে ধরতে এল। দুশ্চিন্তামিশ্রিত আতঙ্কের তাড়া খেয়ে মনটা যেন অথর্ব হয়ে আসছে।

দারার চিন্তাধারা এরকম ভাবেই মনে ঘুরফির করছিল। লড়াই করে তিনি হেরেছেন, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন অশান্তি। সামনে কেবল পালিয়ে বেড়াবার রাস্তা খুঁজে লুকোচুরি খেলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

সময় থেমে রইল না। প্রহরের পর প্রহর চলে গেল। দারা তাঁর স্তব্ধ মহলে তখনও শুয়েছিলেন। পিয়ারা বাঁদী ঘরে ঢুকে একটু ইতঃস্তত করে নীচুস্বরে ডাকল, 'মালিক।'

দারার চিন্তার স্রোতে বাধা পড়তে চোখ খুলে তাকালেন। নাদিরা তাড়াতাড়ি উঠে বসল। দারা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব'ল?'

'কেল্লা থেকে জাঁহাপনার চিঠি এসেছে।' পিয়ারা চিঠিটা দারার হাতে দিল।

দারা সেটা হাতে নিয়ে একবার দেখে আস্তে আস্তে খুলতে লাগলেন। কি লিখেছেন বাদশাহ ?

শাজাহান সস্নেহ সম্বোধনের পর লিখেছেন ঃ

'....তোমার এ অবস্থা ভাগ্যের খেলা। তবু তুমি আমার সঙ্গে কেল্লায় এসে দেখা কর। আমার যা বলার আছে শোনবার পর, তুমি যেখানে হোক ভাগ্যের স্রোতে ভেসে পড়তে পার। যা ঘটবে বলে ঠিক হয়ে আছে, তা ত ঘটবেই—সে যেখানেই থাক না কেন।...'

না, না, আর বাদশার সম্মুখে দাঁড়াবার মত মুখ দারার আজ নেই। তাঁর স্নেহ আজও যে অক্ষুণ্ণ আছে—তাঁর ব্যথায় ব্যথী হয়েছেন সেটাই যথেষ্ট—সেটুকুই পাথেয় হয়ে থাক। তিনি আজও দারাকে নিজের কাছে রাখতে চান হয় ত, কিন্তু লাভ কি ? তাঁর স্নেহের যথেষ্ট মর্যাদা ত দারা দিয়েছেন—তার প্রমান আজকের অবস্থা। দেখা হলে কি হবে বলা যায় না—হয় ত তাকে আব্বাজান আটকে রাখতে চাইবেন। কিন্তু না, তাঁর স্নেহের সুযোগ আর তিনি নেবেন না। নিজের কর্মের প্রতিফল তিনি নিজেই গ্রহণ করবেন।

দারা নিজের মনেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে অপেক্ষারত পিয়ারার দিকে মুখ তুলে শুধোলেন, 'এ চিঠিটা কে নিয়ে এসেছে ?'

'বাদশাহের এক বান্দা নিয়ে এসেছে মালিক।' পিয়ারা জানাল।

'হু। তাকে একটু অপেক্ষা করতে বল। এর জবাবটা বাদশাহের কাছে নিয়ে যাবে।' দারা বললেন।

পিয়ারা চলে গেল দারার কথাটা জানিয়ে দিতে।

দারা পিয়ারাকে কথাটা বলে কলমদান টেনে নিয়ে জবাব লেখার জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রথামত সম্মান জানিয়ে সম্বোধন করে একটু ভাবলেন, কি লিখবেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে স্নেহময় আব্বাজানের উদ্দেশ্যে লিখলেন ঃ

'আমার দৈন্যদশা নিয়ে মহামান্য বাদশাহের সম্মুখে দাঁড়াবার মত মুখ বর্তমানে আমার নেই। তাছাড়া এখানে যদি বেশীক্ষণ থাকি, মৃত্যুদূতেরা এসে আমায় ঘিরে ধরে শেষ করে ফেলবে। তাই আমার এ মুখ দেখার ইচ্ছা পরিত্যাগ করে স্থানত্যাগের অনুমতি দিন। শুধু বিদায়কালের শুভকামনা—বিভ্রান্ত এবং অর্দ্ধমৃত, সম্মুখের দুস্তর পথের জন্য প্রস্তুত মানুষটার প্রতি জানাবেন—এই কামনা করি।'

একবার ভালো করে পড়ে নিয়ে পিয়ারার হাতে সেটি দেবার জন্য ডাক দিলেন, 'পিয়ারা।'

দরজার ওপারে বিমর্ষ পিয়ারা অপেক্ষা করছিল দারার হুকুমের জন্য। ত্রস্তে ঘরে ঢুকে বলল, 'মালিক।'

'এ চিঠি বান্দাকে বাদশাহের কাছে নিয়ে যেতে বল।' দারা গম্ভীর গলায় চিঠিটা পিয়ারার দিকে এগিয়ে দিলেন।

যাক, একটা কাজ শেষ হ'ল। এখন সুলেমানকে খবর দেওয়া দরকার। সময় বেশী নেই। পালাতে হবে। ভাবতেও কি রকম লাগছে। কিন্তু ভাগ্য যদি পরিহাস করে, এছাড়া আজ আর দারার সামনে অন্য পথ কি আছে?

মন স্থির করে দারা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর দিকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকা রাণাদিল—আর তার পাশে কাতর দৃষ্টি মেলে অনাহারের মত তাকিয়ে থাকা নাদিরার দিকেও একবার দেখলেন। বুকটা তাঁর একটা ব্যথায় যেন মুচড়ে উঠল। কোন্

অনির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে নিজের সঙ্গে এ দুটি প্রিয়তমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন তা দারা নিজেও জানেন না। তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে বিরাট তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের মত ভবিষ্যতের মধ্যে নামতে হবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দারা। এদের রেখে গেলেই ভাল হ'ত। কিন্তু তিনি জানেন, এদের তা বোঝান যাবে না। তাঁর সঙ্গ এরা ছাড়বে না। একটু আভাস দিয়েছিলেন তিদি। নাদিরা অস্ফুটে বলেছিল, 'আমি থাকতে পারব না।' সোজা উত্তর।

রাণাদিল সবই বুঝেছিল, দারার সঙ্কোচ কোথায়। সে শুধু একবার তার চোখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিটা নামিয়ে নিয়েছিল। দারা সেটুকুর মাঝেই যেন তার দৃঢ় জবাবটা পেয়েছিলেন। কোন অবস্থাতেই সে সঙ্গ ছাড়তে রাজী নয়। না, আর সে চেষ্টা দারা করবেন না। সেই ভাল। দুঃখের মাঝে এদের কাছে থাকার সান্ত্বনা ত পাবেন। এরা বড় ভালো, বড় সুন্দর, জীবনের কঠোরতার মাঝে শান্তির বর্ম যেন।

দারা আরেকবার তাদের দিকে তাকিয়ে অবনত মস্তকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে যেতে পিয়ারাকে ডাকলেন, 'পিয়ারা।'

পিয়ারা আসতেই দারা দাউদ খাঁ আর গুলমহম্মদকে ডেকে আনবার জন্য বান্দা মুকুলকে পাঠাতে বললেন।

বান্দা মুকুল হুকুম শুনে সঙ্গে সঙ্গে ছুটল দারার হুকুম তামিল করতে।

গুলমহম্মদ আর দাউদ খাঁ এসে যখন পৌঁছল, দারা তখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মস্তক ডান হাতের করতলের উপর রেখে বসেছিলেন। তারা সেলাম জানাল।

'শাহজাদা।'

দাউদ খাঁর ডাক শুনে ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালেন দারা।

ধীরকণ্ঠে বললেন, 'ও, তোমরা এসেছ। তোমাদের একটা কথা আগে জিজ্ঞাসা করে নি। তোমরা আমার সঙ্গে থাকবে কি এখনও ?'

'শাহজাদা, আপনার অধীনেই থাকব।' দাউদ খাঁ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে উঠল। ক্লান্ত শরীরটাকে টান টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে।

'বেশ। গুলমহম্মদ, তুমি ?'

গুলমহম্মদ একটু কথা কম বলে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আমিও আপনার সঙ্গে থাকতে চাই শাহজাদা।'

'ভালো। যারা আমার সঙ্গে যেতে চায়, আজ শেষ রাতে তাদের যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বল। আমি দিল্লীর দিকে রওনা হব। এখানে আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।' দারা ধীরে ধীরে জানালেন।

দাউদ খাঁ একটু সঙ্কোচভরা গলায় বললে, 'লড়ায়ের ধকলে আর আমাদের হার হওয়ায় অনেকেই একটু ভেঙে পড়েছে। তাছাড়া সামুগড়ে অনেক কিছু ফেলেও আসতে হয়েছে। সুতরাং তারা আপনার সঙ্গে যাতে দু'দিন পর দিল্লীতে মেলে—সে জন্য সবাইকে আমি আর গুলমহম্মদ জানিয়ে দেব।'

'হু। হেরে গিয়ে আমিও ভীষণ লজ্জা পেয়েছি দাউদ খাঁ। ভেঙে আমিও পড়েছি। তবে আমি কাউকে জোর করব না আমার সঙ্গে পথে নামতে। অনিশ্চয়তার দিকে পা বাড়িয়ে ঘর সংসার ছেড়ে ছুটে বেড়াতে হবে আমার সঙ্গে।' ক্ষুব্ধ স্বর শোনা গেল দারার কণ্ঠে, কিছুটা অবুঝ অভিমান মেশান।

দাউদ খাঁ বুঝলেন দারার মনের সূক্ষ্ম অভিমানের রেশটা। তাই সে বললে, 'আমি আর গুলমহম্মদ, আর কয়েকজন সিপাই ত

যাবই আপনার সঙ্গে রক্ষী হিসাবে। ওরাও দেখবেন, দিল্লীতে ঠিক পৌঁছে যাবে যথাসময়ে। আমাদের সঙ্গে যারা যাবে, তাদেরকে রাতের বেলাতেই এখানে উপস্থিত থাকতে বলব।'

'আচ্ছা, তাই হোক। হ্যাঁ, শোন গুলমহম্মদ, তুমি যাবার ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেল। বেগমরা আর আমার ছেলেমেয়েরা সঙ্গে থাকবে। সেই মত বুঝে ব্যবস্থা কর, কেমন।' দারা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে দাউদ খাঁর কথা মেনে নিয়েই যেন জবাব দিলেন।

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন শাহজাদা, আমি সব ব্যবস্থা এখুনি করে ফেলছি।' গুলমহম্মদ সঙ্গে সঙ্গে বলল।

'ঠিক আছে। দাউদ খাঁ, তুমি দু'জন বিশ্বস্ত লোক দিয়ে আমার দুটো চিঠি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর। আমি সুলেমানকে যমুনার পুবদিক দিয়ে দিল্লীতে পৌঁছাতে জানিয়ে দিচ্ছি, যাতে সে ঔরঙ্গজেবের কবলে না পড়ে আমার কাছে পৌঁছতে পারে। আরেকটা লাহোরে সৈয়দ ঘৈরাল খাঁনের কাছে।'

'যো হুকুম শাহজাদা।'

'এখন যা কাজ বাকী আছে, তারাতাড়ি শেষ করে ফেল।' দারা বললেন। দারাকে সেলাম জানিয়ে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দারা পিয়ারাকে ডেকে কলমদান আর লেখার কাগজ আনতে বললেন। এরপর আছে যাত্রার প্রস্তুতির জন্য গোছগাছ করা। নিজে দাঁড়িয়ে তা দেখেশুনে নিতে হবে। বিশ্রামটা এখন যেন বিলাসিতা। সময় তাড়া করে চলেছে তাঁকে। সেই তাড়িয়ে বেড়ান সময়টার মাঝেই সব কিছু সেরে নিতে হবে।

সময় হ'ল। দুয়ারে প্রস্তুত যাত্রার বাহনগুলি। হাতীগুলোর

পিঠে উঠল দারার দুই বেগম, ছেলেমেয়েরা আর পিয়ারা সহ কয়েকজন বাছাবাছা বাঁদীর দল। আর যতখানি সম্ভব সোনা-মোহর, মনি-মুক্তা, ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ খচ্চরগুলোর পিঠে তুলে দেওয়া হয়েছে। পথের আনুষাঙ্গিক প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ত আছেই। আর সঙ্গে রইল বান্দা বসন্ত আর মুকুল সহ জনা বারো বান্দা।

গুলমহম্মদ আর দাউদ খাঁ রইল সঙ্গে—কিছু রক্ষীদল নিয়ে।

দারা শেষবারের মত আগ্রার দুর্গের দিকে তাকালেন—যেখানে রেখে গেলেন স্নেহময় আব্বাজানকে আর বহিন জাহানারা বেগমকে —যাঁরা চিরদিন তার ব্যথার ব্যথী হয়ে এসেছেন—তার আনন্দে পুলকিত হয়েছেন। মনে হয়, একবার ছুটে গিয়ে দেখা দিয়ে আসেন তাঁদের। কিন্তু না, সে আবেগ সংবরণ করতেই হ'ল। এই ভাল—অন্ধকারের মাঝে মুখ লুকিয়ে চলে গিয়ে লজ্জাটাকে সেই অন্ধকারে লুকোন যাবে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রস্তুত হ'য়ে থাকা অপেক্ষমান দলটিকে চলার জন্য ইঙ্গিত করলেন। তারা চলল অজানা ভবিষ্যতের দিকে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল দলটি নিজেদের ভাগ্যের তরী অবলম্বন করে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি অপেক্ষা করে আছে কেউ জানে না। আলোয় ভরা আশার হাতছানি আর ভবিষ্যতকে দেখতে পাওয়ার বাসনা তাদের মনে হয় ত উঁকি দিল।

নাদিরা, রাণাদিল, উভয়েই কোন এক অজানা টানে একসঙ্গে তাকাল নিঃঝুম ফেলে আসা মহলটার দিকে। যেন বিদায়ের কাতরতার ছাপ সেই মহলটার দেহে। দুচোখের উপছে পড়া জলে ঝাপ্সা হয়ে মিলিয়ে গেল যেন সেই মহল। মন বলে, জানি না আরও কি ফেলে রেখে এলাম? কিছু সুখ, কিছু মান, অভিমান বা আরও অনেক কিছু—নিয়ে গেলাম শুধু বেদনা।

ধীরে ধীরে সম্মুখের অন্ধকার যেন অপস্য়মান দলটিকে নিজের গহ্বরে গ্রাস করে নিল। নিঃস্তব্ধতা যেন আরো চেপে বসল চারিদিকে। নীরব তারাগুলি পিটপিট করে চেয়ে রইল তাদের পানে।

শাজাহান দারার চিঠি পেয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারা যেন তাঁর প্রাণটা নিয়ে চলে গেল। বেদনা যেন বুকটায় অসহ্য চাপের সৃষ্টি করে। কিন্তু কি ক'রবেন তিনি, তাঁর এই দুর্বল শরীরটা নিয়ে। তাছাড়া এ রকম লড়ায়ের ফ'ল কি, নিজেরও তা জানা ছিল।

দারা বিদায় চাওয়ায় একটু যেন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন শাজাহান। এখন কি ভাবে দারাকে সাহায্য করা যায়। কেল্লার খাজাঞ্চিখানা থেকে সোনার মোহর খচ্চরের পিঠে পাঠিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। পাথেয়র যেন কোন অসুবিধা না হয়। দিল্লীতে খবর পাঠিয়েছেন, যেন কেল্লার দুয়ার খোলা থাকে—দারার প্রয়োজন যেন কোনমতে বাধা না পায়। আর কি করা যায়, শাজাহান অস্থির হয়ে ওঠেন।

হ্যাঁ। একটা চেষ্টা তিনি করবেন, যাতে সব গোলমালের অবসান হয়। দারা উপস্থিত দূরেই থাকুক। তাঁর চেষ্টা সফল হ'লে খবর পাঠিয়ে দারাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই ক'রবেন শাজাহান।

সামুগড়ের লড়ায়ের পরদিনই ঔরঙ্গজেব তাঁকে লিখেছিল, তার আসল কথা হ'ল যে সে শত্রুদের জন্য বাধ্য হয়েই সম্রাটের প্রতি একটু উদ্ধত্য প্রকাশ করে ফেলেছে। তার কোন দোষ নেই। শত্রুটা যে কে, তা বুঝিয়ে বলতে হবে না শাজাহানকে। এটা

আর এক চাল চেলেছে ঔরঙ্গজেব। ধূর্ত ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সতর্ক থাকতে হবে।

এখন থাক সে কথা। ভেবে লাভ নেই। ঔরঙ্গজেব আগ্রাতে আসবেই। তখনই না হয় শাজাহান সমাধানের চেষ্টা করবেন। আগে ঔরঙ্গজেব আসুক। এ খেলার সে-ই প্রধান নায়ক, সেটা শাজাহান বুঝলেন।

কিন্তু এর মধ্যে দারার কোন ক্ষতি হবে না ত? শাজাহান একটু অস্বস্তি বোধ করলেন কথাটা মনে পড়তেই। কিন্তু ভাগ্যে যদি থাকে, কিছু করার ত নেই।

দু' ভাই তাদের বিজয়ী দল নিয়ে আগ্রায় পৌছলেন অবশেষে। শহরে ঔরঙ্গজেব আর মুরাদ ঢুকলেন না। শহরের বাইরে নূর মঞ্জিলে আস্তানা গাড়লেন তাঁরা।

নূর মঞ্জিলে পৌছতেই খবর এলো, বাদশাহ শাজাহানের চিঠি নিয়ে প্রধান শাহী কোষাধ্যক্ষ বৃদ্ধ ফজিল খাঁ আর প্রধান কাজী সইদ হেদায়েতউল্লা উপস্থিত।

দু'জনকে তাঁর কাছে আসতে বলে ঔরঙ্গজেবের মুখে চিন্তার ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। কি ব্যাপার? কি চান বাদশাহ শাজাহান? কি লিখেছেন চিঠিতে?

পত্রবাহক দুজন সেলাম এসে জানাল। ফজিল খাঁ বিনীত ভঙ্গীতে শাজাহানের শীলমোহর করা চিঠিটা এগিয়ে ধরে বললে, 'বাদশাহের হুকুম আছে আপনার জবাব নিয়ে যাবার জন্য।'

ঔরঙ্গজেব কোন কথা না বলে চিঠিটা হাতে নিয়ে একপলক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে চিঠিটা খুলে পড়ে নিলেন। 'সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে কিছু কথা বলতে চান।

সুতরাং ঔরঙ্গজেব যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাছাড়াও বৃদ্ধ পিতার বড় ইচ্ছা পুত্রকে দেখবার। বহুদিন দেখেন নি ত।'

ঔরঙ্গজেব চিঠি শেষ করে মুখটা তুলতেই ফজিল খাঁ উদগ্রীব হয়ে বললেন, 'শাহজাদা, বাদশাহ আমাকে নিজমুখে বলেছেন, আপনাকে যেন তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করি। এখন আপনার জবাব নিয়ে আমরা ফিরে যাব।'

ঔরঙ্গজেব চুপ করে রইলেন। হঠাৎ কোন জবাব দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ।

ঔরঙ্গজেবকে নিরুত্তর দেখে হেদায়েতউল্লা বললেন, 'শাহজাদা, বাদশাহ আপনার সঙ্গে দেখা করার আশায় উদগ্রীব হয়ে আছেন।'

'হুঁ।' একটু ভেবে নিয়ে ঔরঙ্গজেব বললেন, 'ঠিক আছে, বাদশাকে জানিয়ে দেবেন, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তবে কবে, সেটা পরে জানিয়ে দেব।'

ফজিল খাঁ আর সৈয়দ হেদায়েতউল্লা খুশী মনে ঔরঙ্গজেবের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল।

ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে বাদশাহ কি কথা বলতে চান? দারার সঙ্গে মিটমাটের কথা কি, না অন্য কিছু? ঔরঙ্গজেব ভাবতে চেষ্টা করলেন, সম্রাটের এই আমন্ত্রনের পেছনে কারণটা কি?

'কে?' চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে কার যেন উপস্থিতিতে সচকিত হয়ে উঠলেন ঔরঙ্গজেব।

আমিন খাঁ অতি বিনীত সেলাম জানাল ঔরঙ্গজেবকে।

একপলক আমিন খাঁকে দেখে নিয়ে ঔরঙ্গজেব বললেন, 'কি খবর আমিন খাঁ? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কিছু বলবে।'

'হ্যাঁ, শাহজাদা।'

'বল।'

'আমিন খাঁ একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'শাহজাদা, ফজিল খাঁ কি আপনার কাছে বাদশাহের আমন্ত্রণ নিয়ে এসেছিল ?'

ভ্রূকুঞ্চিত করে ঔরঙ্গজেব আমিন খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'প্রশ্নটা কেন করছ ?'

'গেস্তাগী মাফ করবেন শাহজাদা। কথাটা জানার প্রয়োজন আছে।' আমিন খাঁ তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

'হ্যাঁ। বাদশাহের আমন্ত্রনের চিঠি নিয়েই ফজিল খাঁ এসেছিল। তুমি জানলে কি করে সে কথা ?' ঔরঙ্গজেব ভিতরে ভিতরে কিছু আঁচ করতে থাকেন।

'শয়েস্তা খাঁ সাহেব আমাকে জানিয়েছেন।' আবার থেমে যায় আমিন খাঁ।

'তারপর—'

'শায়েস্তা খাঁ সাহেব ঘটনাটা জানেন বলেই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন না, শাহজাদা।'

'কেন ?'

'শাহজাদা, আপনার উপরে আমাদের অনেক আশা। তাই আপনার কোন ক্ষতি আমরা জানতে পারলে তা হতে দিতে পারি না।' আমিন খাঁ বললে।

'ক্ষতি ? আমার ? সব যে বলছ ?' একটু গম্ভীর গলায় প্রশ্নগুলি করলেন ঔরঙ্গজেব।

'বাদশাহ আপনার চেয়ে শাহজাদা দারাশিকোকে বেশী ভালোবাসেন—আপনি নিজেও তা জানেন। শাহজাদা দারাশিকোর সুবিধার জন্য আপনাকে ঐ আমন্ত্রনের টোপ বাদশাহ পাঠিয়েছেন।'

'টোপ ?'

'হ্যাঁ। আপনি আগ্রার কেল্লায় পা দেওয়া মাত্রই আপনাকে কয়েদ করবে বাদশা।' আমিন খাঁ বলল।

'গ্রেপ্তার করা হবে আমাকে ?' ধীরে ধীরে রহস্যটা পরিষ্কার হতে থাকে ঔরঙ্গজেবের কাছে।

'হ্যাঁ শাহজাদা, আপনি গ্রেপ্তার হ'লেই শাহজাদা দারাশিকোর পথ সুগম হবে।' আমিন খাঁ বললে, 'বাদশাহ সেইজন্যেই আমন্ত্রনের ইচ্ছাটা প্রকাশ করছেন। উদ্দেশ্য ত বুঝতেই পারছেন।'

'হুঁ। দারাশিকো! দারাশিকো!' ঔরঙ্গজেব নামটার উপর যেন আক্রোশে ফুলে ওঠেন। দারার জন্য বাদশাহ সবকিছু করতে পারেন। আমিন খাঁকে বললেন, 'তুমি আমাকে এ কথাটা জানিয়ে ভালই করলে আমিন খাঁ।'

'তাহলে শাহজাদা, বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন ত ?' আমিন খাঁ মনে নিশ্চিন্ততা আনতে চায় যেন।

'না।'

খুশী হয় আমিন খাঁ। বলে, 'নিশ্চিন্ত হলাম শাহজাদা। এবার তাহ'লে আমি যাই শাহজাদা। শায়েস্তা খাঁ সাহেবকে খবরটা দিতে হবে।'

'যাও।'

আমিন খাঁ বেরিয়ে যেতেই ঔরঙ্গজেব পায়চারী শুরু করলেন। সত্যিই তিনি হয় ত যেতেন বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু খবরটা ঠিক সময়ে পেয়ে তিনি কয়েদের হাত থেকে বেঁচেছেন।

দারাশিকোর বহুদিনের ইচ্ছা সম্রাটের মনের তলায় চাপা

ছিল। সামুগড়ে তাঁর সেই ইচ্ছার কিছুটা সমাপ্তি হয়েছে। কিন্তু এখনও বাকী আছে।

পরদিন সকালে আবার ফজিল খাঁ এবং হেদায়েতউল্লা এসে উপস্থিত হ'ল ঔরঙ্গজেবের কাছে। শাজাহানের আবার একটা পত্র আছে।

'কিন্তু শাহজাদা, চিঠি পড়ার আগে বাদশাহের কিছু উপহার আপনার সামনে রাখছি।' ফজিল খাঁ মৃদু হেসে বললে।

ঔরঙ্গজেব কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। মাথাটা ঝাঁকিয়ে সামনে রাখতে অনুমতি দিলেন।

বাদশাহের উপহার—অন্যান্য কিছু জিনিষপত্রের সঙ্গে আছে হীরে, মনি-মুক্তা প্রভৃতি মূল্যবান পাথর এবং গহনাপত্র। আর সামনে রাখা হ'ল বিখ্যাত তরবারি 'আলমগীর', অর্থাৎ বিশ্ববিজয়ী।

ঔরঙ্গজেব হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন সেই তরবারি। 'আলমগীর'। হাত বুলালেন তার খাপটার গায়ে। হাতলটা ধরে আস্তে আস্তে টেনে বার করে নিয়ে তাঁর চোখের সামনে ধরলেন—আলোয় ঝকমক করে উঠল তরবারিটা। 'আলমগীর'। মনে মনে আবার উচ্চারণ করলেন নামটা। তারপর আস্তে আস্তে তরবারিটা খাপে ভরে তাকালেন ফজিল খাঁর দিকে।

ফজিল খাঁ হাসি ভরা মুখে বাদশাহের চিঠিটা এগিয়ে দিলেন ঔরঙ্গজেবের দিকে।

ঔরঙ্গজেব গম্ভীরভাবে চিঠিটা খুললেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব আসছে জেনে খুশী হয়েছেন—ভালোবাসা জানিয়েছেন—আর লিখেছেন, কবে প্রিয়পুত্রের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে সেটা যেন পত্র মায়ফৎ এদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

চিঠি থেকে মুখ তুললেন ঔরঙ্গজেব। হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকা পত্রবাহক দুজনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বাদশাহকে আপনারা জানিয়ে দেবেন, আমি বাদশার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। তিনি যেন মাফ করেন আমাকে।'

ফজিল খাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। একি কথা ঔরঙ্গজেব বলছেন! ফজিল খাঁ বলল, 'সে কি শাহজাদা, আপনি যাবেন না?'

'না।'

'কিন্তু কাল ত আপনি সম্মতি জানিয়েছিলেন শাহজাদা।' ফজিল খাঁ বলল।

ঔরঙ্গজেব গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা আপনারা বাদশাকে জানিয়ে দেবেন।'

ফজিল খাঁ ঔরঙ্গজেবের হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারে না। কোথায় যেন কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই।

হেদায়েতউল্লা বললে এবার, 'কিন্তু শাহজাদার মত পরিবর্তনের কারণ যদি জানান ত ভাল হয়।'

'কারণ জানাতে হবে আমাকে?' ঔরঙ্গজেব একটু থেমে থেমে বললেন কথাটা।

'মাফ করবেন।' হেদায়েতউল্লা বললে, 'বাদশাহ আপনার পথ চেয়ে বসে আছেন। আপনার মত পরিবর্তনের কারণটা তাঁকে জানালে, তিনি হয় ত আপনাকে সে সম্বন্ধে কিছু একটা বলবেন।'

'কারণ আপনারা জানেন না?'

'না, শাহজাদা। বিশ্বাস করুন।' ফজিল খাঁ বলে উঠল।

ঔরঙ্গজেব আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ফজিল খাঁ এবং

হেদায়েতউল্লার কাছ থেকে কিছুটা সরে গিয়ে তাদের দিকে পিছন ফিরে বললেন, 'বেশ, তবে কারণটা জেনে যান। আমার ফাঁদে পড়ার ইচ্ছা নেই।'

'ফাঁদ!' বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে ফজিল খাঁ একবার ঔরঙ্গজেবের দিকে, আরেক বার হেদায়েতউল্লার দিকে তাকাল।

'হ্যাঁ, ফাঁদ। তাই বলছি, সে ফাঁদে পা দিয়ে কয়েদ হয়ে দারার পথটা পরিষ্কার করে দিতে পারব না। বাদশাহের ভালোবাসার জন্য অতখানি ত্যাগ স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' শেষের দিকে ঔরঙ্গজেব একটু শ্লেষের হাসি মুখে নিয়ে বললেন।

বৃদ্ধ ফজিল খাঁ প্রথমটা কি বলবে যেন ভেবে পায় না। তারপর বললে, 'শাহজাদা, আপনি বাদশাহের উপর মিথ্যা সন্দেহ করছেন। তিনি যে কত স্নেহপ্রবণ, সে কথা আশা করি আপনাকে আমার মনে করিয়ে দিতে হবে না। আপনি কেন সে কথা বুঝতে পারছেন না। বাদশাহ এ রকম অভিসন্ধি নিয়ে আপনাকে আমন্ত্রন জানান নি। তিনি—'

ঔরঙ্গজেব হাত তুলে ফজিল খাঁকে থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'আমার কথা জানিয়ে দিয়েছি খাঁ সাহেব। এবার আপনাদের কাজ করুন।'

'শাহজাদা, আপনি আরেকবার ভেবে দেখুন। আপনার এ ধরনের সন্দেহ কিসের থেকে হ'ল জানি না। নিশ্চয় আপনাকে কেউ ভুল বুঝিয়েছে বা নিজের স্বার্থে এ সন্দেহের বীজ আপনার মনে ঢুকিয়েছে। জাহাঁপনা অধীর হয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি নিজে গেলে আপনার সন্দেহ ভেঙে যাবে।' ফজিল খাঁ শেষবারের জন্য চেষ্টা করলেন।

ঔরঙ্গজেব বললেন, 'না তা হয় না, ফজিল খাঁ। এখন আপনারা যান। বাদশাহকে বলবেন, তাঁর ফাঁদে পা দেওয়ার ইচ্ছে নেই বলেই আমি এ সাক্ষাতে অনিচ্ছুক।'

'শাহজাদা, আপনি আরেকবার ভাবুন।' হেদায়েতউল্লা এবার অনুরোধ জানায় শেষ মুহূর্তে।

'আমি আমার কথা জানিয়ে দিয়েছি।' ঔরঙ্গজেব দৃঢ়স্বরে বললেন, 'এবার আপনারা যান, আমার আরও কাজ আছে।'

'বেশ, আমরা বাদশাকে আপনার কথাই জানাব।' বিমর্ষভাবে বললে ফজিল-খাঁ। সমস্ত অনুরোধ আর উপরোধ বিফল হল তাদের। ঔরঙ্গজেবের মত পরিবর্তনের কোন আশাই নেই। তাই অভিবাদন জানিয়ে ব্যর্থ দৌত্যের সংবাদ নিয়ে ফজিল খাঁ আর হেদায়েতউল্লা আগ্রার দুর্গে ফিরে গেল।

তারা বেরিয়ে গেলে ঔরঙ্গজেব একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। একটা বিষয় চুকল। এবার অরেকটা।

ওদিকে আগ্রাবাসীরা সন্ত্রস্থ। তার কারণ, মুরাদের সেনারা আর নীচু শ্রেণীর বদমাসরা যেন তাণ্ডব চালাচ্ছিল সারা আগ্রা শহর জুড়ে। চতুর্দিকে আর্তনাদের গুঞ্জনে ঔরঙ্গজেব বিচলিত হয়ে উঠলেন।

পরদিনই ঔরঙ্গজেব অত্যাচারে অস্থির মানুষগুলোকে রক্ষা করে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য স্বীয় পুত্র সুলতান মহম্মদকে পাঠালেন।

ঔরঙ্গজেবের আদেশ মত কতোয়াল সিদ্দি মামুদের প্রাণদণ্ড হল। তার জায়গায় একজন তাতার নিয়োজিত হল। শহরবাসী স্বস্তি পেল।

ঔরঙ্গজেব সমস্ত শহরটাকে কুক্ষিগত করে নিলেন। এবার

আগ্রার কেল্লা। সেটা এখনও বৃদ্ধ বাদশাহ শাজাহানের হাতেই রয়েছে। সেটি নিতে পারলেই কাজ শেষ।

ফজিল খাঁ আবার এল। এবার সঙ্গে কলিলউল্লা খাঁ। হাতে শাজাহানের চিঠি।

ঔরঙ্গজেব শেখ মীরের কাছে তাদের আসার কারণ শুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কর্তব্যও ভেবে নিলেন। কলিলউল্লা খাঁ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য উদগ্রীব। পুরস্কার লাভ করা যায় বিশ্বাসঘাতকতার জন্য—তারই লোভে সে উন্মুখ। অবশ্য শায়েস্তা খাঁ এরকম কথাই তাঁকে জানিয়েছে। সুতরাং বৃদ্ধ ফজিল খাঁর থেকে বর্তমানে প্রয়োজন কলিলউল্লাকে। তাকে কাজে লাগান যাবে। চিঠিটাও দেখা যাবে সেই সঙ্গে। এই কথা ভেবে নিয়ে ঔরঙ্গজেব শেখ মীরকে বললেন, 'শেখ মীর, তুমি বাইরে গিয়ে ফজিল খাঁর কাছ থেকে বাদশাহের চিঠিটা নিয়ে এস। আর কলিলউল্লাকে বল, তার সঙ্গে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আর হ্যাঁ, শোন, ফজিল খাঁকে অপেক্ষা করতে বল।'

ফজিল খাঁকে সে কথা বলতে সে একটু থতমত খেয়ে গেল। কিন্তু নিরুপায় হয়ে শাদা দাড়ীর উপর হাত বোলান ছাড়া কিছু করার নেই ত। পরিবর্তন যে ঔরঙ্গজেবের মধ্যে এসেছে, দ্বিতীয় সাক্ষাতেই তা বুঝতে পেরেছে সে। সুতরাং আশ্চর্য হয়েও স্থির হয়ে বসে রইল ফজিল খাঁ।

কলিলউল্লা প্রকাণ্ড এক সেলাম করে ঔরঙ্গজেবের সামনে এসে দাঁড়াল ঝকঝকে চোখের দৃষ্টি নিয়ে।

ঔরঙ্গজেব একবার দেখে নিয়ে হাতের মোড়া চিঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে সেই দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন, 'কলিলউল্লা, তোমার কাজ সম্বন্ধে সব খবরই পেয়েছি। তুমি সামুগড়ে যে সাহায্য করেছ,

তাতে যে তোমার ইসলামের ওপর শ্রদ্ধা আছে, বুঝতে পেরে আমি খুশী হয়েছি।'

'আমার কর্তব্য আমি করেছি শাহজাদা।' কলিলউল্লা একটু গদগদ স্বরে বলার চেষ্টা করে।

'কর্তব্য?' ঔরঙ্গজেবের মুখে একটু বক্রহাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়। বললেন, 'হ্যাঁ, কর্তব্যই করেছ। কিন্তু তোমাকে যে আমার আরও দরকার আছে।'

'আপনি যে রকম হুকুম করবেন—'একটু থেমে কি ভেবে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে ঔরঙ্গজেবকে কলিলউল্লা বললে, 'জাহাঁপনা।'

'জাহাঁপনা এখনও হই নি কলিলউল্লা। জানি না খোদার কি মর্জি। তবে এখন আর ও ভাবে সম্বোধন কর না।' ঔরঙ্গজেব বক্রহাসি নিয়ে বললেন, 'এখন ও সব কথা থাক। তোমাদের সকলের জন্যই সামুগড়ের সাফল্য সম্ভব হয়েছে। তোমাকে যথাসময়ে আমি সে জন্য পুরস্কারও দেব।'

সত্যই যদি সেদিন দলে আরও কিছু রাজপুত থাকত কলিলউল্লার বদলে, তাহ'লে ফল যে কি হ'ত খোদাই জানে। মরতে একদিন হবেই—এ কথা ওদের থেকে ভালভাবে কে জানে। আর ওদের মত কে মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করতে পারে? ঔরঙ্গজেবের মনে ছবিগুলো ভেসে ওঠে।

একটু পরে ঔরঙ্গজেব আবার বললেন, 'তোমাকে আমার আরও কাজে লাগবে। কাফের দারা পলাতক। তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সেখানেও তোমার সাহায্য পাব বলে আমি আশা করি।'

'যো হুকুম শাহজাদা।' মাথাটা নুইয়ে কলিলউল্লা জানালে।

'বেশ, তুমি এখন আমার কাছে এখানেই থাক।' ঔরঙ্গজেব বললেন।

'কিন্তু বাইরে ফজিল খাঁ দাঁড়িয়ে আছে। আমি না গেলে—'

কলিলউল্লাকে থামিয়ে দিয়ে ঔরঙ্গজেব বললেন, 'তোমায় তা নিয়ে ভাবতে হবে না।' ঔরঙ্গজেব বাদশাহের চিঠিটা খুললেন। চিঠিতে বাদশা ফজিল খাঁ এবং হেদায়েতউল্লার মুখে সব শুনে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বলেছেন, ঔরঙ্গজেব যেন নিজে এসে বাদশাহের তার প্রতি ভালবাসা এবং স্নেহের প্রমাণ দেখে যায়। এ সব মিথ্যা সন্দেহের কোন মানেই হয় না, কারণ ঔরঙ্গজেব তাঁরই সন্তান। সুতরাং সমস্ত মিথ্যা সন্দেহ মন থেকে মুছে ফেলে তাকে দেখার জন্য উৎসুক সম্রাটের সঙ্গে সে যেন সাক্ষাৎ করে। এ সন্দেহ বাদশাহের উপর কলঙ্করোপ করা হচ্ছে। স্নেহশীল আব্বাজানের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে। তিনি আশা করে আছেন, ঔরঙ্গজেব আসবে।

চিঠিটা পড়া শেষ করে কলিলউল্লার দিকে তাকালেন ঔরঙ্গজেব। বললেন, 'এ চিঠিতে কি কথা লেখা আছে জান ?'

'হ্যাঁ শাহজাদা, জানি। আর এও জানি, এইভাবে ফাঁদে ফেলে আপনাকে কয়েদ করার চেষ্টা হ'চ্ছে।' কলিলউল্লা বললে।

'হুঁ। কারণটা অবশ্য দারাশিকো।'

'শাহজাদা, আপনি এখনও কেল্লায় ঢুকছেন না কেন?' কলিলউল্লা অভিযোগের সুরে বলল যেন।

'হুঁ, যাব, তবে পথ পরিষ্কার করে।'

'আপনি কেল্লা অধিকার করুন। বৃদ্ধ বাদশাকে কয়েদ করুন। নইলে তিনি সব সময় আপনার ক্ষতির চেষ্টা করে যাবেন। কয়েদ না করলে তাঁকে এ অনিষ্ট চিন্তা থেকে বিরত করা যাবে না।' কলিলউল্লা বললে।

ঔরঙ্গজেব শেখ মীরকে ডাকলেন। তারপর কলিলউল্লাকে

বললেন, 'আমি যা করব তা ভেবে নিয়েছি।' শেখ মীর ঘরে এসে ঢুকলে ঔরঙ্গজেব তাকে উদ্দেশ্য ক'রে বললেন, 'শেখ মীর, ফজিল খাঁকে আমার জবাবটা জানিয়ে বলে দাও যে আমি আবার জানাচ্ছি, আমি বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অপারগ। কেন না, আমি এখনও বুঝতে পারছি না, বাদশা সাক্ষাতের বিনিময়ে আমাকে কি পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে ফেলতে চান। আর কলিলউল্লা খাঁ সম্বন্ধে ফজিল খাঁকে জানাবে, তাকে আমি কয়েদ করেছি।' ঔরঙ্গজেব একটু থেমে আবার গম্ভীর স্বরে বললেন, 'তারপর সকলকে জানিয়ে দাও যে আজ রাতেই আমরা কেল্লা আক্রমণ করব।'

'যো হুকুম শাহজাদা।' শেখ মীর বেরিয়ে যায়।

॥ নয় ॥

বৃদ্ধ ফজিল খাঁ সংবাদটা নিয়ে ফিরে এল আগ্রার দুর্গে। উৎসুক শাজাহানকে ঔরঙ্গজেবের কথা জানাল।

শুনে বাদশাহের মুখে চিন্তার কুঞ্চন দেখা দিল। বললেন, 'কোন উপায়ে সে দেখা করবে না?'

'না, জাহাঁপনা। তাছাড়া এখন সমস্ত ব্যাপারটাই কোনরকম দৌত্যের বাইরে চলে গেছে।'

'হুঁ, ঠিক আছে। শোন, কেল্লার সমস্ত কটা ফটক বন্ধ করে দাও। যাতে ঔরঙ্গজেব আর পা বাড়াতে না পারে। তারপর

দেখি, কি করতে পারি।' শাজাহানের মুখটা থমথম করে।

ফজিল খাঁ হুকুম নিয়ে সেলাম জানিয়ে শাজাহানের কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

জাহানারা পর্দার আড়ালে ছিলেন, 'আমি জানতাম, ঔরঙ্গজেব আসবে না। সন্দিগ্ধ মন। ভালভাবে সবকিছু না জেনে কিছুতেই সে কোথাও পা দেবে না। দারার মহল দেখতে গিয়ে মহলের মাটির নীচের কুঠুরীর মধ্যেও সে পা দেয় নি। সন্দেহ করেছিল দারা যদি তাকে কয়েদ করে। আর এ ক্ষেত্রে সে আসে নি, সে ত তার পক্ষে স্বাভাবিক কাজই হয়েছে।'

শাজাহান তাঁর ভ্রূকুটিপূর্ণ মুখ নিয়ে একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হয়ত কিছু ভাবছিলেন। সেইভাবেই যেন নিজের মনে বললেন, 'ভেবেছিলাম ওকে ডেকে এনে এ বিবাদের একটা মীমাংসা করে ফেলব। দারাকেও আর পালিয়ে বেড়াতে হবে না। কিন্তু তা আর হ'ল না। ঔরঙ্গজেবকে একবার হাজির করতে পারলে সেটা সম্ভব হ'ত। যাক যা হয় নি, তা নিয়ে ভেবে আর কি লাভ। শুধু দারার জন্যই আমার কষ্ট।'

জাহানারা দারার কথায় একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। একটা নিঃশ্বাস বড় ক'রে ছেড়ে একটু বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'তা হ'লে এখন কি করবেন বাদশা?'

'করব না কিছুই।' শাজাহান একটু উচ্চ স্বরে বললেন, 'আমি কেল্লায় বসেই ওদের পথ রোধ করব। ওরা কেল্লা দখলের জন্য অবরোধ করবে, করুক। আমি বৃদ্ধ হয়েছি, শরীরও ঠিক নেই বটে, কিন্তু এখনও আমি মরে যাই নি—

তার প্রমাণ ঔরঙ্গজেবকে দেব। করুক ওরা, কতদিন অবরোধ করবে।'

ঔরঙ্গজেব দুর্গ অবরোধ করলেন তাঁর কথামত সেই রাতেই। দুর্গের পশ্চিম দিকের ফটকের সম্মুখে জামা মসজিদের চত্বরে একটা, আরেকটা যমুনার ধারে দারার মহলে বড় দুটি কামান বসানো হল। অবরোধী ফৌজ দুর্গের কাছের গাছগুলিতে আর বাড়িতে আশ্রয় নিল। কেউবা দুর্গের কাছাকাছি ছোটখাট গাছগুলির মাঝে গা ঢাকা দিয়ে রইল। আর সেনাধ্যক্ষরা রইল দারার মহলের ভিতরে।

প্রথমে গোলাগুলি বর্ষন করে চেষ্টা করা হ'ল। কিন্তু ছোটখাট ভাবে দুর্গের মাঝে মহলের উপরতলার ক্ষতি ছাড়া কিছুই করতে পারল না তারা। জুলফিকার আর বাহাদুর খাঁ দলবল নিয়ে আক্রমণের জন্য গুঁড়ি মেরে দুর্গের উঁচু প্রাচীরের কাছে উপস্থিত হ'ল। কিন্তু নিষ্ফল হ'ল সমস্ত চেষ্টা।

এদিকে দুর্গের উপর থেকে নীচে কারও মাথা দেখা গেলেই তাকে ধরাশায়ী করার জন্য দুর্গ রক্ষীরা জবাব দিতে লাগল। কিন্তু এ পক্ষেরও বিশেষ কোন ক্ষতি হ'ল না। তাদের আশ্রয়স্থলগুলি বাঁচিয়ে দিতে লাগল।

ঔরঙ্গজেবের পক্ষের গোলাগুলি বর্ষণ, সমস্তই যেন ঐ দুর্গের শক্ত প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। আবিসিনিয় আর তুর্কী রক্ষীগুলোও রুখে যেতে লাগল বাহাদুর খাঁ, জুলফিকারের সমস্ত রকম প্রচেষ্টা।

সময় বয়ে যায়। সময় মানেই দারার সুবিধা। দিল্লীতে বসে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ। ঔরঙ্গজেব তাই শীঘ্র দুর্গ দখল করতে চান—দারাকে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে দিতে নারাজ তিনি।

এখানেই যদি সময় চলে যায়—ঔরঙ্গজেবরই বিপদ। এতদিনের কল্পনার সার্থকতার রূপটা মিলিয়ে যাবে।

ঔরঙ্গজেব বাম হাতটা পিছন দিকে রেখে ডান হাতটা চিবুকের দাড়ির উপর নাড়তে নাড়তে চিন্তার ভ্রূকুটি নিয়ে পায়চারী করতে করতে শেখ মীরের উদ্দেশ্যে বললেন, 'শেখ মীর, সময় যদি এখানে আমাদের দিতে হয়, তাহ'লে বিপদ আছে।' একটু বিরক্তি নিয়ে আবার বললেন, 'এখনও আমরা কেল্লাটা দখল করতে পারলাম না। শুধু কয়েকটা লোকের বুদ্ধির জোরে এখনও আমাদের এত বড় শক্তিকে ওরা রুখে যাচ্ছে। তোমরা করছ কি ?'

'আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। কিন্তু এ কেল্লা যে কতখানি দুর্ভেদ্য, সেটা ত আপনি নিজেই জানেন শাহজাদা। গোলাগুলি ছুঁড়ে এর ক্ষতি করা যাবে না। তাছাড়া ওরা উপর থেকে কারও মাথা দেখতে পেলেই গুলি করছে।' শেখ মীর বিনীত স্বরে কথাগুলো বললে।

'সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু কেল্লা খুব শীঘ্রি আমার দখলে আনা চাই। এখনও অনেক কাজ বাকী আছে।'

'কিন্তু এখনও যে কোন পথ দেখছি না শাহজাদা।'

'কিন্তু পথ বার করতেই হবে। একটু ভাবতে দাও।' ঔরঙ্গজেব সেইভাবে পায়চারী করতে করতে বললেন।

তারপর নিজের মনেই যেন বলতে লাগলেন, 'বহুদিন ধরে যদি কেল্লা আটক করে বসে থাকা যেত তাহ'লে হয়ত—কিন্তু তা সম্ভব নয়। কেল্লার ভেতরে নিশ্চয় খাদ্য সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে।'

'হ্যাঁ শাহজাদা। আর পাশেই যমুনা, জলেরও অভাব নেই।' শেখ মীর সায় দিল।

'হুঁ, জলের অভাব।' ঔরঙ্গজেব থেমে গেলেন। আবার

আস্তে আস্তে স্বগত উক্তির মত বললেন, 'জলের অভাব। দাঁড়াও, এতক্ষণ এ কথাটা মনে পড়ে নি কেন?'

শেখ মীর একটু বিস্মিত হয়, 'কি কথা শাহজাদা!'

'এই জলের কথা—তৃষ্ণার কথা।'

শেখ মীরের কাছে ঔরঙ্গজেবের উক্তিগুলো অসংলগ্ন মনে হয়। সে বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে ঔরঙ্গজেবের দিকে।

'পেয়েছি, পথ পেয়েছি শেখ মীর। কেল্লার পথের সঙ্গে যে পথ গিয়ে মিশেছে, সেই পথ আমাদের তার ভেতরে নিয়ে যাবে। জল। জল নেওয়া আটকাতে হবে।' একটু যেন উত্তেজিত মনে হয় ঔরঙ্গজেবকে, 'যমুনা কাছে থাকার জন্য ভেতরে খাবার মত জলের ব্যবস্থা নেই। চারটে কূপ যা আছে, বহুদিন অব্যবহৃত থাকার ফলে জলও নষ্ট হয়ে গেছে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই যমুনা ছাড়া অন্য কোন সূত্রে জল সংগ্রহের ব্যবস্থা হয় নি। উঃ, এ কথাটা আমার মনে পড়ে নি এতক্ষণ।'

'তাহ'লে শাহজাদা, আমাদের ত এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হয়।' শেখ মীর ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

'হ্যাঁ। এই এক উপায়ে যদি তৃষ্ণার কাতরতায় কেল্লার ফটক খোলে। সেই চেষ্টাই এখন করতে হবে।'

'তাহ'লে আমি আপনার কথা জানিয়ে দি।'

'হ্যাঁ। যমুনার দিকের খিজিরি ফটক আটকাবে, যাতে ওরা একবিন্দু জল কেল্লার ভেতর না নিয়ে যেতে পারে। তারপর দেখি, বাদশার মত পরিবর্তন হয় কি না।' ঔরঙ্গজেবের মুখটা ভবিষ্যত সম্ভাবনার আনন্দে ক্রুর হ'য়ে ওঠে যেন।

'তাহ'লে আমি সেই ব্যবস্থাই করি শাহজাদা।' শেখ মীর কথাটা কাজে পরিণত করার জন্য প্রস্তুত হয়।

'হ্যাঁ, যাও।' ঔরঙ্গজেব হাতটা তুলে শেখ মীরকে বিদায় দিলেন।

তারপর কেল্লা যদি তাঁর এই উদ্ভাবিত পথে খোদার দোয়ায় হাতে এসে যায়, তাহ'লে সব দিক থেকে নিশ্চিন্ত। বিশেষ করে দারার শুভাকাঙ্খী আব্বাজানকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা যাবে। তারপর দারা—তোমাকে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে যে কোন উপায় নিয়ে এসে পিষে ফেলতে হবে। তারপর সুজা, তাকেও ছাড়া হবে না। তারপর খোদা তাঁর মর্জি মত যা করাবেন তাই করতে হবে।

তৃষ্ণার্ত্ত শাজাহান জলটা কোন মতে এক ঢোক খেয়ে নিয়ে মুখটা বিকৃত করলেন। দুর্গন্ধ আর কটুস্বাদের জল মুখে দেওয়া যায় না। খেয়ে তৃষ্ণা মেটান যায় না।

এই তিনদিনের মধ্যে যমুনার জল একেবারেই আনা যায় নি। গোলাগুলি ছুঁড়ে ওদের হটান যায় নি। উপরন্তু ফটকের তোরণটা ওদের আড়াল করে রেখেছে। আর জলের অভাবে দুর্গের ভিতর যেন আর্তনাদ উঠেছে।

জাহানারা বেগম দাঁড়িয়ে শাজাহানের মুখবিকৃতি লক্ষ্য করছিলেন। অসুস্থ আব্বাজানের কষ্টে মনটা দুলে উঠল। এভাবে ত চলতে পারে না। জলকষ্টে বাধ্য হয়েই দুর্গের কূপের দুর্গন্ধময় কটু জল খেতে হচ্ছে। কিন্তু সে ত বিষেরই মত। এরপর প্রাণ সংশয় হয়ে উঠবে। না, আর চুপ করে থাকলে চলবে না। এভাবে সকলের প্রাণ দেওয়ার কোন মানে হয় না। উপরন্তু তাঁর আব্বাজান অসুস্থ, এরপর কি হবে বলা যায় না।

তাঁরও কষ্ট হচ্ছে না যে তা নয়। কিন্তু তার থেকে বড় আর সকলের তৃষ্ণায় কষ্টকাতর আব্বাজানের কষ্ট। ঔরঙ্গজেব নিজের কাজ উদ্ধার করতে কি যে না করতে পারে, তারই প্রমাণ এই অমানুষিক কাণ্ড।

জাহানারা আব্বাজানের পাশে এসে দাঁড়ালেন। শাজাহান যেন অনেক কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। হায় রে, ঔরঙ্গজেব শ্বেতসর্পই বটে। ক্রূঢ়তার প্রতিমূর্তি—ছোবল মারতে ফণা যেন মেলে ধরেছে। দারার সঙ্গে কি একটু মিটমাট করে নেওয়া যায় না। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের দারার উপর জাত ক্রোধ আছে যেন। উপরন্তু দারার যে উদারতা আছে, ঔরঙ্গজেব সেখানে খুবই ক্ষুদ্র। কিন্তু সে কথা থাক, এখন অন্য কথা ভাবতে হবে।

মন স্থির করে নিয়ে জাহানারা বেগম শাজাহানের কপালের ঘামটা মুছে দিতে দিতে বললেন, 'বাদশা, আমি একটা কথা বলব?'

প্রিয় কন্যার মুখের দিকে চেয়ে শাজাহান বললেন, 'কি কথা জাহানারা?'

'আপনি এ কেল্লা ঔরঙ্গজেবের হাতে তার কথামত তুলে দিন।'

'জাহানারা, কি বলছিস তুই! কেল্লা ঔরঙ্গজেবের হাতে তুলে দেব!' শাজাহান একটু সোজা হয়ে বসার চেষ্টা করলেন।

'হ্যাঁ। এ রকমভাবে মরে কোন লাভ নেই। লড়াই করে যদি সব শেষ হ'ত, তাহ'লে মনে অনেক সান্ত্বনা থাকত। এভাবে—' জাহানারা বললেন।

'বুঝি বেটী। সবার যে কষ্ট হচ্ছে তাও জানি। কিন্তু—'

'কোন কিন্তু নেই বাদশা। অনেকে জল খুঁজতে যাচ্ছি বলে গেছে। তারা বোধহয় জল পেয়ে কেল্লার কথা ভুলে গেছে।' কথাগুলোর শেষের দিকে একটু হাসতে চেষ্টা করেন জাহানারা,

তারপর বললেন, 'আপনি আর এ নিয়ে ভাববেন না। ঔরঙ্গজেবকে জানিয়ে দিন, এ কেল্লা তারই। অনুরোধ করে, অনুনয় করে ত দেখলেন, ঔরঙ্গজেবের কাছে ওসব করে ফল পাওয়া যাবে না।'

'ভেবেছিলাম ঔরঙ্গজেব এলে চার ভাইয়ের মধ্যে রাজ্যটা ভাগ করে নেওয়ার কথা বলব। সামনা সামনি পেলে কথায় কথায় রাজীও করে ফেলতাম। কিন্তু তা হ'ল না।' শাজাহান যেন আত্মগতভাবে কথাগুলো বললেন, 'তাতে দারা অন্ততঃ শান্তিতে থাকত।'

'এবার আমি নিজে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে দেখা করে আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য অনুরোধ করব। আমার কথা মনে হয় সে ফেলতে পারবে না।' জাহানারা বললেন।

'পারবি। পারবি তাকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে আমার কাছে আনতে?' শাজাহান একটু যেন উৎসাহিত হয়ে ওঠেন।

'চেষ্টা করব বাদশা।' জাহানারা বললেন, 'কিন্তু তার আগে আপনি কেল্লাটা ওর হাতে তুলে দিয়ে এ কষ্ট থেকে উদ্ধার পান।'

শাজাহান তাঁর পালঙ্কের উপর নিজের এবং ঔরঙ্গজেবের চিঠিগুলো তুলে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। জলকষ্টে কাতর হয়ে লিখলেন: ভাগ্যের নির্দয়তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমি করছি না। কারণ আমি জানি, খোদার ইচ্ছা ছাড়া গাছ একটি পাতা ত্যাগ করে না। কাল আমি নয় লক্ষ ফৌজের মালিক ছিলাম, কিন্তু আজ এক কলস জলের প্রত্যাশী। হিন্দুদের প্রশংসা করতে হয়, কারণ তারা মৃতের মুখেও জল দেয়। কিন্তু তুমি সৎ মুসলমান হয়ে আমাকে জলের কষ্ট ভোগ করাচ্ছ। সৌভাগ্যশালী পুত্র, এই অবিশ্বাসী পৃথিবীতে সৌভাগ্যের জন্য গর্বিত হয়ো না। কর্তব্যে বিচ্যুত হয়ো না—গর্বে জ্ঞান বুদ্ধি

হারিয়ো না। মনে রেখো, এই ক্ষয়শীল পৃথিবীতে ক্ষুদ্র পথ অন্ধকারের দিকে গেছে এবং সত্যিকারের সৌভাগ্য আসে মানুষের কথা মনে রেখে এবং দয়ার মধ্য দিয়ে।

চিঠির জবাব অবশ্য ঔরঙ্গজেব মুখে বলে পাঠিয়েছিলেন। সোজা বলে দিয়েছিলেন, শুধু আপনার জন্যই এ অবস্থা হয়েছে।

তবু শাজাহান কষ্ট স্বীকার করেছিলেন তিন দিন ধরে। আজ আবার একখানা চিঠি তিনি পাঠিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, মোগল বাদশাহদের বংশ মর্যাদাকে পিষে ফেলার চেষ্টা করছ তা বুঝেছি। কিন্তু সেটা কর না। কারণ এই শাহীবংশ জাঁকজমকে পৃথিবী বিখ্যাত। সুতরাং বাইরের সবাইকার সামনে, বিশেষ করে পারস্যের শাহের কাছে এ বংশের সম্মান লুটিয়ে দিও না।

ঔরঙ্গজেব এবার তারই জবাব পাঠিয়েছেন। লিখেছেন, যা করেছি আমার শত্রুদের জন্যই করতে বাধ্য হয়েছি। তবে আমি এখনও শাহী মসনদের প্রতি, আপনার প্রতি অনুগত আছি। ইতিমধ্যে কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে সাহস পাই নি। যদি বাদশাহ কেল্লার ফটকগুলি আমার লোকেদের হাতে ছেড়ে দেন এবং তাদের গমনাগমনের অধিকার স্বীকার করে নেন, আমার সন্দেহেরঅবসান হবে। আর তখনি আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আপনি যা বলবেন, তাই শুনব।

শাজাহান ঔরঙ্গজেবের চিঠিটা আরেকবার পড়ে নিলেন। তারপর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা জাহানারার দিকে তাকালেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, 'বেশ, তাই হোক। তুমি ফজিল খাঁকে খবর দাও, আমি তাকে ঔরঙ্গজেবের কাছে পাঠাব। সত্যিই এই অসহ্য অবস্থার শেষ হওয়া দরকার।'

জাহানারা একবার শাজাহানের বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নীচু করে কি ভেবে নিয়ে বাঁদীকে ডেকে ফজিল খাঁকে খবর দিতে বললেন।

গোলাগুলির আঘাতে কেল্লার যে সব ফটক ভাঙা যায় নি, সেই ফটকগুলি খুলে গেল তৃষ্ণার জ্বালায়।

ঔরঙ্গজেবের কাছে বাদশাহ শাজাহানের কেল্লা সমর্পণ তাকে মসনদ অধিকারে আরও উৎসাহিত করল। তাঁর পরিকল্পনা মতই সব কিছু ঘটেছে। কোনটাই আজ বিফল হয় নি। এবার দারা। তারপর—

কাকে যেন দেখে ঔরঙ্গজেবের উৎফুল্ল চিন্তায় ছেদ পড়ল। কোয়েল। কোয়েল এখানে কেন? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার অপাঙ্গ চেয়ে চেয়ে দেখলেন তিনি।

কোয়েল সেলাম জানিয়ে শুধু বলল, 'বেগম সাহেবা এসেছেন।'

জাহানারা বেগম আসছেন ঔরঙ্গজেবের কাছে! কেন? কি বলতে চান তিনি ঔরঙ্গজেবকে? অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আসাটা একটু আকস্মিকই বটে। ঔরঙ্গজেব নিজেও হকচকিয়ে উঠলেন মনে মনে।

ঔরঙ্গজেব নিজেকে সামলে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কোথায় তিনি? তাড়াতাড়ি নিয়ে এস এখানে।'

'যো হুকুম শাহ আলিজা।' কোয়েল চলে যাচ্ছিল।

'দাঁড়াও।' ঔরঙ্গজেব একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'বাহাদুর খাঁ।'

ডাক শুনে বাহাদুর খাঁ কুর্নিশ করে এসে দাঁড়াল। ঔরঙ্গজেব শশব্যস্তে তাকে বললেন, 'বাহাদুর খাঁ, বেগম সাহেবা এসেছেন। তাঁকে আমার কাছে সসম্মানে নিয়ে এস। আর শোন, বেগম

সাহেবা যতক্ষণ এখানে থাকবেন, ততক্ষণ কেউ যেন এখানে না আসে।'

'যো হুকুম।' বাহাদুর খাঁ তাড়াতাড়ি চলে যায়।

কি এমন কথা যে জাহানারা বেগমকে হারেম ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। একটু বাদেই যখন সে কথা জানা যাবে, তখন আর ভেবে লাভ কি? তবে যা কিছু বলুক না কেন, সতর্ক হয়ে সব কিছু শুনতে হবে।

জাহানারা বেগম ঔরঙ্গজেবের সামনে এসে দাঁড়ালেন। এখনও বহিন জাহানারা বেগমকে দেখতে বেশ ভালই লাগে। যদিও সুন্দর ঢলঢলে মুখখানিতে মলিনতা আর কিছুটা রুক্ষতার ছাপ। অবশ্য ঔরঙ্গজেবের জল-অভিযান তার অন্যতম কারণও হতে পারে। তবু তাঁর দেহের বাঁধন কোন অংশেই ক্ষুণ্ণ হয় নি। হাঁটার ভঙ্গিতে ব্যক্তিত্বের ঋজুতা। জাহানারা বেগম প্রথমেই কোয়েলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কোয়েল, তুই একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়া।'

কোয়েল চলে যাবার পর ঔরঙ্গজেব তাড়াতাড়ি জাহানারার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এস বহিন, এস। তুমি যে কষ্ট করে আমার কাছে আসবে, তা আমি ভাবতেই পারি নি। আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। এখন আমি কি করে তোমাকে অভ্যর্থনা জানাই বল ত?'

'ব্যস্ত হয়ো না ঔরঙ্গজেব। শোন, আমার খুব বেশি কথা বলার নেই। যা বলব তুমি সেটুকু মন দিয়ে শুনলেই আমি খুশী হব।' জাহানারা যেন ঔরঙ্গজেবের কথাগুলোর পেছনে কপটতার চিহ্ন দেখতে পান। কিন্তু মুখের ভাবে তা প্রকাশ হতে দেন না।

'নিশ্চয়ই শুনব। তুমি বস, দাঁড়িয়ে রইলে কেন বহিন?'

জাহানারা কথা না বাড়িয়ে ঔরঙ্গজেব নির্দেশিত আসনে বসে

বললেন, 'ঔরঙ্গজেব, আমি আবার তোমাকে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। তুমি বাদশার সঙ্গে দেখা কর।'

ঔরঙ্গজেব একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার পক্ষে বর্তমানে দেখা করা সম্ভব নয়। উপরন্তু দেখা হলে আমাদের মধ্যে আলোচনার বিষয়-বস্তু কি হবে, সে সম্বন্ধেও কোন কিছু ধারণা করতে পারছি না।'

'বেশ, আলোচনার বিষয়-বস্তুটা না হয় আমিই বলে দিচ্ছি। তাহ'লে হবে ত?'

'আগে শুনি, তারপর আমার সিদ্ধান্ত জানাব।' ঔরঙ্গজেব আরেকটা আসনে বসতে বসতে বললেন।

'শোন, আলোচনাটা হবে হিন্দুস্থানের মালিকানা নিয়ে। বাদশা ভেবেছেন, হিন্দুস্থানটা ভাগ করে দিলে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার অবসান হবে। অবশ্য এসব আলোচনা সাপেক্ষ—সেইজন্যই তোমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।' জাহানারা বললেন।

'ভাগটা কি রকম ভাবে হবে?' ঔরঙ্গজেব মৃদু হাসি মুখে নিয়ে বললেন।

'সে সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ভেবে রেখেছেন বাদশা। পাঞ্জাব আর লাগোয়া রাজ্য দারাকে দেওয়া যেতে পারে। মুরাদ গুজরাট, সুজা বাংলা।' একটু থেমে নিয়ে জাহানারা আবার বললেন, 'মহম্মদ সুলতান দাক্ষিণাত্য পাবে, আর বাকীটা সবই তোমার।'

'হুঁ।' ঔরঙ্গজেব এই শব্দটুকু করে অন্যদিকে চেয়ে রইলেন, কোন মন্তব্যই করলেন না।

'আরও একটা ব্যবস্থা নেওয়ার ঠিক হয়েছে।' জাহানারা জানালেন।

'কি?' জাহানারার দিকে মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঔরঙ্গজেব।

জাহানারার কথাটা বলতে যেন কষ্ট হয়, 'আর···আর দারার কাছ থেকে শা-ই-বুলন্দ ইকবাল উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য খেতার নিয়ে নেওয়া হবে এবং সে খেতাব তোমাকে দেওয়া হবে।'

কথাটা শুনে ঔরঙ্গজেব হাসলেন। বললেন, 'তুমি তাতে খুশী হয়েছ বলে ত মনে হচ্ছে না বহিন।'

'হয় ত হচ্ছি না। কিন্তু সে প্রশ্নের সঙ্গে এ প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক নেই।' জাহানারা তীক্ষ্ণ স্বরে এবার বলে উঠলেন।

'তা নেই, খুবই সত্যি কথা।' ঔরঙ্গজেব আবার হাসলেন।

জাহানারা ঔরঙ্গজেবকে একবার দেখে নিয়ে শান্ত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন জানতে পারলে ত তোমাকে আমন্ত্রণ করার কারণ। তাহলে তুমি বাদশার সঙ্গে দেখা করছ নিশ্চয় ?'

'না।'

'না কেন ?' জাহানারা প্রশ্ন করলেন।

'তোমাদের সব ব্যাপারেই দারার স্বার্থের দিকে তাকিয়ে কাজ করা—সেইজন্য। আর সঙ্গে কিছু ভাগ করে নেওয়ার ব্যাপারে কোন আলোচনা করতে আমি রাজী নই।'

'এটা খুব স্বাভাবিক, যাকে ভালবাসা যায় তার স্বার্থ দেখে সবাই। কিন্তু এখানে শুধু তার ব্যাপারটাই জড়িয়ে নেই, চার ভাইয়ের স্বার্থ এখানে জড়িত।' জাহানারা বললেন।

'কিন্তু দারা যে ব্যাপারে জড়িত, সেখানে আপস আমি করব না। শুধু মসনদের জন্য ত তার সঙ্গে আমি লড়াই করি নি।' ঔরঙ্গজেব পায়চারি করতে করতে বললেন।

'থাক, ও কথা বল না। মসনদের জন্য লড়াই করেছ কিনা তা আমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। তোমার মনের খবর আমার

জানা আছে। তুমি ভাগে রাজী নও, কারণ তোমার লক্ষ্য সমস্ত হিন্দুস্থান।' জাহানারার স্বর একটু রুক্ষ শোনায়।

'তুমি কি জান, সে সম্বন্ধে আমি নিজেও ভাবতে চাই না, জানতেও চাই না। খোদার দোয়ায় যদি আমায় মসনদে বসতে হয় বসব। কিন্তু—'

'ঔরঙ্গজেব, খোদার দোহাই দিয়ে নিজের কপটতা ঢেক না। খোদা তাতে খুশী হবে না।' জাহানারা বাধা দিয়ে উঠলেন।

ঔরঙ্গজেব একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ওসব কথা থাক। আমি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে পারব না। দারার সঙ্গে লড়াই মসনদের জন্য নয়। সে ইসলামের কাছে অপরাধী। সেইজন্য সে কাফের। ইসলাম রক্ষার জন্য তাকে দমন করা প্রয়োজন। সে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার আগে আমি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে পারব না।'

'তোমার মুখোসটা খুব সুন্দর হয়েছে ঔরঙ্গজেব, বাহবা দিতে হয়।' তীব্র শ্লেষ নিয়ে জাহানারা বললেন। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে দেখা না করার জন্য তুমি এই কারণটাই খাড়া করেছ?'

'হ্যাঁ।' দৃঢ়স্বরে ঔরঙ্গজেব বললেন।

'তোমাকে ত বলছি ঔরঙ্গজেব, সবই আলোচনা সাপেক্ষ। তাই তোমার দেখা করা একান্ত জরুরী। কথাবার্তা বলতে কোন ক্ষতি নেই। বৃদ্ধ মানুষটা অনেক আশা নিয়ে তোমার পথ চেয়ে আছে।'

'কিন্তু আমি পারছি না। তাছাড়া দারার স্বার্থে তোমরা অনেক কিছুই করতে পার। আমাকে কয়েদ করতে পারলেই সব মিটে যায়।'

'তোমার সন্দেহের কথা শুনেছি ঔরঙ্গজেব। কিন্তু তুমি বিশ্বাস

করতে পার, বাদশা সে রকম কিছু ভাবেন নি।' জাহানারা শান্ত স্বরে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

'কয়েদখানায় বসে আমার সন্দেহটা যে ঠিকই হয়েছিল, সেটা প্রমান করার মত মনের অবস্থা তখন থাকবে না।' ঔরঙ্গজেব একটু বাঁকা হাসি মুখে নিয়ে বললেন।

'কিন্তু কেল্লা ত তোমার অধিকারে। কয়েদ হলে তোমাকে মুক্ত করতে কতক্ষণ? আমাকে তুমি বিশ্বাস কর। বেশ, বাদশা না হয় তোমারই কাছে আসবেন। যদি তুমি তাঁকে সত্যিই অসম্মানের আসনে বসাতে চাও ত তাই হবে। আমি বাদশাকে তোমার কাছেই আসতে বলছি।' জাহানারা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

না, না, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তাতে হয়ত ঔরঙ্গজেবের দুর্নাম হবে। আর সে দুর্নাম হয় ত ক্ষতিকর হবে। তাছাড়া সত্যিই ত কেল্লা ঔরঙ্গজেবেরই দখলে। সকলকে সতর্ক করে দেখা করলেই হবে। আর আলোচনা হলেই যে মানতে হবে এমন কথা নেই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঔরঙ্গজেব বললেন, 'বেশ, তোমার কথার ওপর বিশ্বাস রেখেই আমি বলছি কালই যাব।'

'বেশ, তাই যেও।' দরজার দিকে এগুলেন জাহানারা।

ঔরঙ্গজেব বললেন, 'তুমি একটু দাঁড়াও। তোমাকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করি।'

'না। আমি যে ভাবে এসেছি, সে ভাবেই ফিরে যাব। তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না।' জাহানারা আর দাঁড়ালেন না।

সাজল ঘোড়া, সাজল হাতী। ঔরঙ্গজেব গর্বের সঙ্গে বেরুলেন নিজের ডেরা থেকে সারম্বরে—বাদশাহ শাজাহানের সঙ্গে দেখা করার জন্য দুর্গের পথ ধরলেন।

কিছুটা পথ এগিয়েছেন, তৃপ্তিভরা চোখ নিয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, এমন সময় তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এল শায়েস্তা খাঁ আর শেখ মীর। উত্তেজিত তাদের মুখভাব। ঔরঙ্গজেব তাঁর হাতীটাকে থামাতে বললেন। দেখা দেখি আর সবাই।

শায়েস্তা খাঁ ঘোড়াটাকে সংযত করে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছ?' মাতুল সম্পর্কের জোরেই সে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে দারা, সুজা, ঔরঙ্গজেব—সবাইকে।

সজ্জিত হাওদার উপর থেকে ঔরঙ্গজেব জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

'আমরা তোমাকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছি, তা সত্ত্বেও যাচ্ছ?'

'তা দিয়েছেন সত্যি। কিন্তু আমার এবার কয়েদ হবার ভয় নেই। আমি সে রকম ভাবে প্রস্তুত হয়েই যাচ্ছি।' ঔরঙ্গজেব মুখে একটা মৃদু হাসি টেনে বললেন।

'খুব ভাল কথা। কিন্তু তুমি বাদশাকে এতটা বোকা ভাবলে কি করে?'

'কেন?' ঔরঙ্গজেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে আসে।

'কেন?' যেন দুঃখের মাঝে হাসি পেল শায়েস্তা খাঁর। বললে, 'কয়েদ হওয়ার মত যখন অবস্থা ছিল, বাদশাহ তখন সে কথা ভেবেছেন। এখন সে অবস্থা নেই, মতলবও পাল্টেছেন।'

'মতলব পাল্টেছেন!' ঔরঙ্গজেবের সন্ধিগ্ধ মন নড়ে চড়ে যেন খাড়া হয়ে ওঠে। বিশ্বাস নেই, সবই সম্ভব।

'হ্যাঁ, মতলব পাল্টেছেন। তোমার কেল্লার ভিতরে পা দেওয়া মানেই তুমি বুঝতে পারবে না কোথায় পা দিয়েছ।' শায়েস্তা খাঁ বলল।

'আপনি একটু পরিষ্কার করে কথাগুলো বলুন।' অধৈর্য হয়ে ঔরঙ্গজেব বলে উঠলেন।

'তা হলে শোন, বাদশার অন্দরমহলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাবে, ভীষণ সব তাতার ক্রীতদাসীগুলো তোমাকে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর—' শায়েস্তা খাঁ হাতের এমন একটা ভঙ্গী করলে যার বহু অর্থ হতে পারে।

অসহিষ্ণু ঔরঙ্গজেব বলে উঠলেন, 'আপনি যদি সব কথা খুলে না বলতে পারেন তাহলে মিছিমিছি সময় নষ্ট করবেন না।'

ঔরঙ্গজেব কিন্তু শায়েস্তা খাঁর ইঙ্গিতময় কথাবার্তায় মনে মনে দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর হিন্দুস্থানের মসনদের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কোনমতেই তাতে ছন্দপতন ঘটতে দেওয়া যায় না। সন্দেহজনক গন্ধ পেলেই সতর্ক হয়ে সেই গন্ধ নাশ করতে হবে।

শায়েস্তা খাঁ ঔরঙ্গজেবের কথায় বললে, 'তোমাকে ত আগেই বললাম ঔরঙ্গজেব, কয়েদ করার যখন প্রয়োজন ছিল, তখন বাদশাহ কয়েদ করতেন, কিন্তু এখন কয়েদ করলে কোন ফল হবে না। তাই তোমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'আমাকে মেরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। ঐ তাতার মেয়েগুলো তোমার অপেক্ষায় আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর তোমার ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমায় শেষ করে ফেলবে। আর তুমি সেখানে নিজেকে নিজেই নিয়ে গিয়ে ফেলছ।' শায়েস্তা খাঁ ঔরঙ্গজেবের মুখের ভাব লক্ষ্য করার চেষ্টা করতে করতে বললে।

ঔরঙ্গজেব ভাবতে লাগলেন। শায়েস্তা খাঁ ঔরঙ্গজেবকে নিজের স্বার্থে কাজে লাগাতে চায়, তা জানেন তিনি। সুতরাং মাতুল মিথ্যা বলতেও পারেন। তাছাড়া শাজাহানের প্রস্তাব শায়েস্তা খাঁ শুনেছেন। একছত্র বিরাট সাম্রাজ্যের মালিককেই শায়েস্তা খাঁর

পছন্দ বেশি। সেইজন্য এরকম সন্দেহ সৃষ্টি করে বাধা দিতেও পারেন। আবার ঔরঙ্গজেব থাকতে দারার শান্তি নেই, একথা বাদশাহও জানেন। সুতরাং ঔরঙ্গজেবকে সরানো তাঁর প্রয়োজন হয়ে উঠেছে হয় ত। আর সেটা বাদশার নয়নমণি দারার জন্যই।

সে যাই হোক, সন্দেহের দোলায় চেপে বাদশা দর্শনে যাওয়া যায় না। সুতরাং ফেরাও হাতী আর ঘোড়াগুলোর মুখ। চলো ফিরে।

ঔরঙ্গজেব সোজা এসে ঢুকে পড়লেন দারার মহলে। হাতী থেকে নেমেই তলব করলেন সুলতান মহম্মদকে। তার আসার সময়ের মধ্যেই মন স্থির করে নিলেন তিনি।

মহম্মদ জরুরি তলব পেয়ে হাজির হয়। ঔরঙ্গজেব বললেন, মহম্মদ, তোমাকে একটা গুরুদায়িত্ব দিচ্ছি। তুমি আজ থেকে বাদশার ঘরে সর্বক্ষণের জন্য নজর রাখবে। সাধারণ বন্দীর সঙ্গে তফাৎ এই যে তাঁর জিঞ্জির থাকবে না, কিন্তু তাঁর গতিবিধি থাকবে কড়া নিয়ন্ত্রনের মধ্যে। আমি কি বলতে চাইছি বুঝেছ ত?'

মহম্মদ ঠিকই বুঝেছে। বললে, 'হ্যাঁ, আব্বাজান।'

'তোমার ওপর যে দায়িত্ব দিলাম, আশা করি, আমি তার জন্য নিশ্চিন্ত থাকতে পারব?'

'হ্যাঁ, আব্বাজান।'

'বেশ, যাও। এখনই কেল্লায় চলে যাও। তোমার কাজ শুরু করে দাও।' ঔরঙ্গজেব বেরিয়ে পড়লেন দারার সন্ধানে। প্রধানতম শত্রুটি এখনও ধরা পড়ে নি। সুতরাং আর দেরী নয়। কিন্তু এখনও এক সমস্যা—মুরাদ। কোন চালে তাকে কাত করবেন ঔরঙ্গজেব ঠিক করে রেখেছিলেন। তাই তাকে জীইয়ে রেখে দেবার জন্য আগ্রা ছাড়ার আগে মুরাদকে দুশো তেত্রিশটি

ঘোড়া আর দু'লাখ টাকাও দিয়েছেন। আর সেখান থেকেই এবার সন্দেহের ধোঁয়া, এমন কি অগ্নিকাণ্ডও ঘটে যেতে পারে।

কিন্তু মুরাদ এখন নিজের সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করেছেন। ঔরঙ্গজেবের হুকুমের ওপর হুকুম চালিয়ে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করছেন তিনি। নিজেকে জাহির করে বলতে চাইছেন আমিই সব।

হয় ত কেউ তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে ঔরঙ্গজেবই এখন সর্বেসর্বা। তিনিই সব কিছু ঠিক করছেন —তাঁরই কথামত কাজ হচ্ছে। মুরাদ সেখানে শক্তিহীন। তাঁকে পুতুল করে রাখা হয়েছে মাত্র।

এই জ্ঞানচক্ষু উন্মোচন হওয়ার পরই মুরাদ চুক্তিমত বাদশা হওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়লেন। কথায়, হাবে ভাবে যেন সেই কথারই প্রকাশ। কিন্তু তাতে ঔরঙ্গজেবের পরিকল্পনায় অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।

বাহাদুর খাঁকে সেদিন বললেন মুরাদ, 'নিজে ধার্মিক মুসলমান হয়ে মুসলিম ধর্মের বিকৃতি দেখতে পারি না বলেই দারার সংগে লড়ায়ে নেমেছিলাম। আমার মসনদের ওপর লোভ ছিল না বাহাদুর খাঁ। শুধু ভাইয়ের ডাকে ধর্মরক্ষার জন্যই সাড়া দিয়েছিলাম।'

নেশায় ভরা তাঁর রক্তাভ চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে সায় দেবার জন্য যেন বাহাদুর খাঁ বলেছিল, 'সে কথা আমরা জানি শাহজাদা।'

মাথাটা দুলে উঠেছিল মুরাদের, কথায় না নেশার ঘোরে কে জানে? তারপর জড়িত স্বরে বাহাদুর খাঁকে আবার বলেছিলেন তিনি, 'বুঝেছ বাহাদুর খাঁ, লড়ায়ের সফলতার পর আমাকে হিন্দুস্থানের মসনদ দিয়ে ঔরঙ্গজেব খোদার কাছে চলে যাবে।'

শেষের কথাটা নেশার ঝোঁকে বেরিয়ে গিয়েছিল। নইলে ঔরঙ্গজেবকে অত তাড়াতাড়ি মুরাদ খোদার কাছে পাঠাতেন না।

বাহাদুর খাঁ বুঝতে না পেরে বলেছিল, 'খোদার কাছে চলে যাবেন, সে কি শাহজাদা?

'ধেত, তুমি বড় বোকা বাহাদুর খাঁ। কথাটার মানে, সে ফকির হয়ে যাবে।' মুরাদ জড়িয়ে জড়িয়ে বলেছিলেন কথাগুলো। আর বাহাদুর খাঁর বোকামিতে হেসে যেন গড়িয়ে পড়েছিলেন।

'এইবার বুঝলাম।'

'বেশ।' মুরাদ এবার সমস্ত শরীরটাকে দুলিয়ে হাতের পাত্রটার সব সরাবটুকু খেয়ে মুখটা একটু মুছে নিয়ে বললে, 'আমি এখন বাদশাহ, বুঝেছ।' একটা হিক্কার তীব্র শব্দে শুধু বেরিয়ে এল 'শাহ', আর বলা হল না। কিন্তু বাহাদুর খাঁকে দেখাবার জন্য নিজের বুকে দু'তিনটে জোরে জোরে চড় মেরে ছিলেন।

'শাহজাদা, নিশ্চয়ই আপনি বাদশাহ হবেন।'

'নিশ্চয়ই হব। আমাকে শীঘ্রি বাদশাহ হতে হবে। ঔরঙ্গজেব কবে আমাকে বাদশাহ করবে বল ত। ওর নিজের মসনদে বসার লোভ নেই ত?'

'না, উনি আপনার জন্য পথটা পরিষ্কার করে দিচ্ছেন।' ছেলে ভুলানোর মত বাহাদুর খাঁ বলেছিল মুরাদকে।

'বহুত আচ্ছা। তোমাকে অনেক পুরস্কার দেব। তোমাকে জায়গীরদার করে দেব। খুশী ত?' মুরাদ বলেছিলেন।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব এ সব শুনে খুশী হ'ন নি। বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন মুরাদের কাজে, হাবে-ভাবে। এতে ঔরঙ্গজেবের আশঙ্কাই বেড়েছিল। সব সময়ই মুরাদ যেন ঔরঙ্গজেবের গতিবিধি

কাজকর্ম লক্ষ্য করে। আগ্রা থেকে পিছুপিছু আসছেন, কিন্তু কাছে তাঁবু ফেলেন না। পিছনে একটু দূরে তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করেন। তাতে ঔরঙ্গজেবের বিপদের সম্ভাবনা বাড়বে ছাড়া কমবে না। যে কোন মুহূর্তে ঔরঙ্গজেবের পায়ের তলার মাটি দুলে উঠতে পারে। সুতরাং এখন দূরের দিকে না তাকিয়ে পায়ের কাছের কাঁটা গাছটা উপড়ে ফেলতে হবে। নইলে সে কাঁটা ঔরঙ্গজেবের পায়ে ফুটে রক্ত বিষাক্ত করে তুলতে পারে। অবস্থা ঔরঙ্গজেবের এক্তিয়ারের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই ব্যবস্থা করতে হবে। তাই তিনি ধীরে ধীরে দিল্লীর পথে এগোলেন।

দশ দিন পর মথুরার কাছে রূপনগরে এসে তাঁবু ফেললেন ঔরঙ্গজেব। মুরাদও তাঁর থেকে কিছু দূরে তাঁবু ফেললেন।

ঔরঙ্গজেব মুরাদের সুস্থ হয়ে ওঠার দরুণ খানাপিনার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে তাঁর তাঁবুতে। কিন্তু মুরাদ কারণ দেখিয়ে সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন বিনীতভাবে।

ঔরঙ্গজেব অস্থির হয়ে পড়লেন। এবার তাড়াতাড়ি মুরাদের একটা ব্যবস্থা করে বিপদমুক্ত হ'তে হবে। প্রতিদিনই তিনি নিমন্ত্রণ পাঠান, আর সেই একই অভিনয়—বিনীত প্রত্যাখ্যান।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব এবার উপায় খুঁজে বার করলেন। মুরাদের পরিচারক নরুদ্দীনই ঔরঙ্গজেবের সহায় হ'ল। উৎকোচ—প্রকারভেদ যাই হোক, কার্যসিদ্ধির জন্য ঔরঙ্গজেব সেটা দিতে উদার হস্ত।

ঠিক হয়ে গেল, নরুদ্দীন সন্ধ্যায় শিকার থেকে ফেরার পথে মুরাদকে যে কোন উপায়ে ঔরঙ্গজেবের তাঁবুতে এনে ফেললেই তার কর্তব্য শেষ।

সেই মতই কাজ হ'ল। ঔরঙ্গজেব তাঁবুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন মুরাদকে, 'এস, ভাই এস।'

আহ্বানে ইতঃস্তত করতে থাকা মুরাদের হাতটা ধরে ঔরঙ্গজেব তাঁবুর ভিতর নিয়ে এসে দাঁড় করালেন। হেসে বললেন, 'দাঁড়াও ভাই, একটা কাজ সেরে নি।'

আতরদান এনে মুরাদের গায়ে আতর ছড়িয়ে যেন ভিজিয়ে দিলেন। মুখে একটা স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে রেখেছিলেন, যাতে মুরাদ বুঝতে না পারে কিছু। বললেন, 'তোমার প্রিয় আতর। কত কষ্ট করে জোগাড় করেছি। এবার বস।'

মুরাদ ভিতরে ভিতরে সতর্ক হয়ে ঔরঙ্গজেবকে লক্ষ্য করছিলেন। কোন কথা না বলে সন্দিগ্ধ মনে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ঔরঙ্গজেব যেন কতকটা জোর করেই মুরাদকে বসিয়ে দিলেন। নিজে থেকেই আবার বললেন, 'তুমি আমার খানাপিনার নিমন্ত্রণে আসতে পারছিলে না দেখে খুব দুঃখিত হয়েছি। কিন্তু যখনই মনে হয়েছে, মানুষ বিনা প্রয়োজনে কিছু করে না, তখনই বুঝেছি, তুমি নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে সময় করতে পার নি বলেই আসতে পারছ না। সেটা খুব স্বাভাবিক, নইলে তুমি ঠিক আসতে।'

নির্বাক মুরাদ কি বলবেন ভেবে পান না। সুতরাং চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলেন।

ঔরঙ্গজেব সব বুঝে নিজে থেকেই বলতে লাগলেন, 'তোমার শরীর এখন সুস্থ আছে তো?'

মুরাদ মাথা ঝাঁকিয়ে জানালেন, 'হ্যাঁ।'

ঔরঙ্গজেব হাসলেন আবার। বললেন, 'খোদার দোয়ায় তুমি সেরে উঠেছ দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছে ভাই। সেইজন্যই ত তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম।'

'আমি আসতে পারি নি।' মুরাদ একদমে কথাকটি বলে আবার চুপ করে গেলেন।

'আমি বুঝতে পেরেছি। তাই আগেই সে কথা বলেছি।'

'তাহ'লে এখন আমি যাই।' মুরাদ উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু ঔরঙ্গজেব তার আগেই মুরাদকে ধরে ফেললেন। বললেন, 'সে কি ভাই, আজ যখন এসেইছ, তোমাকে ছাড়তে পারব না ত। এখানেই তোমার খানাপিনা করতে হবে। বস ভাই, বস। শিকার করতে গিয়েছিলে, একটু ক্লান্ত হয়েছ। খানাপিনার পর একটু বিশ্রাম করে নিজের তাঁবুতে ফিরে যেও।'

'কিন্তু—' মুরাদ পালিয়ে যেতে চান। মনে মনে একটা কিছু আঁচ করেন যেন।

'আমি দুঃখ পাব মুরাদ। আর কদিন পর ত তোমায় পাওয়াই ভার হবে। বাদশা হয়ে যাবে যে তখন।'

'বেশ, সেটা তাড়াতাড়ি কর তাহ'লে।'

'তাড়াহুড়োর কিছুই নেই ভাই, ধীরে সুস্থে কাজই ভাল। তাতে হজম হয় ভাল।' ঔরঙ্গজেব বললেন। মুখে হাসিটা যেন বাঁধাই থাকে।

নিমরাজী মুরাদবক্সকে অগত্যা বসে থাকতে হয়। এমনিতে চট করে তাঁর মাথা খেলে না।

ঔরঙ্গজেব হাতে তালি দিলেন। মোগলাই খানা সব নিয়ে এসে সাজিয়ে রাখা হ'ল মুরাদের সামনে।

মুরাদের শরীর যে রকম, শক্তিও সেই রকম। খিদেটাও সেই অনুপাতে সমান। উপরন্তু শিকার করে এসে খালি পেটের তর্জন গর্জন যেন শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। অতএব এক এক করে খানা নিজেই প্রায় শেষ করে আনলেন।

খানা শেষ হ'ল। এবার পিনার আয়োজন। ঔরঙ্গজেব নিজের হাতে সিরাজীর পাত্রটা ভর্তি করে দিলেন।

এক চুমুকে সেটি শেষ করে ফেলার আগেই আবার আর এক সিরাজী। ক্ষমতার একেবারে শেষ সীমায় না যাওয়া পর্যন্ত মুরাদ সিরাজী চালিয়ে যান। আবার ভর্তি হ'ল পাত্র, আবার শেষ হ'ল এক চুমুকে।

ঔরঙ্গজেব আবার পাত্রটা ভরে দিতে দিতে বললেন, 'তোমাকে এ রকমভাবে সিরাজী খেতে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে—খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। বশরত্।'

বান্দা বশরত্ সামনে এসে দাঁড়াল। ঔরঙ্গজেব বললেন, 'তুমি ভাই একটু বস। আমি এখনি আসছি। বশরত্ রইল, ও-ই তোমার সিরাজী ঢেলে দেবে। প্রাণে যত চায়, খাও। কোন সঙ্কোচ কর না। তারপর একটু আরাম করে বিশ্রাম কর। কেমন?'

'আচ্ছা, তুমি যাও। আমি ঠিক আছি।' মুরাদ সিরাজীর মৌজে মশগুল হয়ে চোখে রঙীন দেখতে শুরু করেছেন। কথায়ও তার প্রমাণ দিলেন। 'তবে একটা কথা, আমি যে বাদশা—এই হিন্দুস্থানের মালিক, সেটা তাড়াতাড়ি ঘোষণা করতে ভুল না যেন।'

'না ভাই, সে ভুল হবে না।' ঔরঙ্গজেব তাঁবুর চিক দিয়ে ভাগ করা মাঝের অংশের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

মুরাদের পানের তোড় সেই রকমই চলতে লাগল। তিনি জোরে বশরত্‌কে দিয়ে হাত-পা টেপাতে লাগলেন। ক্লান্ত শরীরটা আস্তে আস্তে শয্যার উপর এলিয়ে দিয়ে তরবারিটা খুলে হাতের পাশে রেখে দিলেন।

কিছুক্ষণ বাদে ঢুকল এক রূপসী বাঁদী। নেশায় ঢুলুঢুলু চোখে তাকালেন মুরাদ তার দিকে। মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বাঁদী হাত নেড়ে বশরত্‌কে ইঙ্গিত করতে সে তাঁবুর বাইরে চলে গেল।

'এই, তুমি কি বেহেস্তের হুরী?' মুরাদ অসংযত টলমল স্বরে প্রশ্ন করলেন।

'আমি আপনার বাঁদী মালিক।' যৌবনোদ্ধত দেহটা দেখিয়ে বাঁদী মুরাদের শয্যার দিকে এগিয়ে আসে।

'কই বাত্ নেহি। তোমাকে আমার হারেমে নিয়ে যাব। বাদশার হারেমে বেশ ভালই থাকবে তুমি। জান ত আমি কে? আমি এই হিন্দুস্থানের মালিক।' মুরাদের মন শয়নে, স্বপনে, জ্ঞানে, অজ্ঞানে বাদশাহী নেশায় ভরপুর।

বাঁদী সবই বোঝে। সে কাছে এগিয়ে এসে মুরাদের পায়ে তার কোমল হাতখানা বোলায়। অনির্বচনীয় এক শিহরণ রক্তের মধ্যে নেচে ওঠে মুরাদের সর্বশরীরে। শরীরটাকে তিনি আরো এলিয়ে দিলেন। চোখ বুজে আসে, তবু জড়িত স্বরে বললেন, 'ওখানে নয় পিয়ারী, আমার পাশে এস। তোমাকে দু'দণ্ড দেখি।'

বাঁদী উঠে আস্তে আস্তে তাঁর পাশে এসে বসল। মুরাদ তার হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে একবার নাড়াচাড়া করলেন। তারপর নিজের কপালের উপর রাখলেন।

একে ত সিরাজীর নেশা, তার ওপর জেনানা আদমি। ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন মুরাদ। বাঁদীর সর্বাঙ্গে একবার দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'বাঃ, তুমি এতক্ষণ আস নি কেন পিয়ারী।' তারপর একটু কাত্ হয়ে বাঁদীর কাঁধে একটা হাত রাখলেন। আরেকটা হাতে চিবুকটা ধরে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন নিজের দিকে।

বাঁদী তার নরম হাতখানা মুরাদের কপালে ও গালে বুলিয়ে দিল। পলক পরশে যেন মুরাদের চোখ দুটো আবার বুজে এল। তৃপ্তির একটা অস্ফুট আওয়াজ তুলে আরো ঘন হ'লেন তিনি, আরও উচ্চ স্পর্শের আশায়।

মুরাদ ঘুমিয়ে পড়েছেন তৃপ্তির একটা ছাপ মুখে নিয়ে। এলায়িত একটা হাত রূপসী বাঁদীর গায়ের উপর পড়েছিল তখনও।

বাঁদী আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে রেখে খুব সন্তর্পণে উঠে পড়ে। মুরাদ তখনও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

ধীরে ধীরে বাঁদী হাত বাড়াল মুরাদের তরবারিটার দিকে। ঘুমের ঘোরে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ তুলে একটু নড়লেন মুরাদ। স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল তাঁর।

বাঁদী হাতটা গুটিয়ে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত সেইভাবে কাটল। আবার সে তরবারিটার দিকে হাত বাড়াল। হাতল ধরে আস্তে আস্তে তুলে নিল সেটা। এবার ছুরিখানা। আবার সন্তর্পণে হাত বাড়াল সে। না, অকাতরে ঘুমুচ্ছেন শাহজাদা। ছুরিখানা তুলে নিয়ে বেশবাসটা ঠিক করে পা টিপেটিপে চলে গেল তাঁবুর মধ্যেকার চিকের আড়ালে।

সবই যেন একই তালে বাঁধা ছিল। বাঁদী বেরিয়ে যেতেই কয়েকজন শক্তসমর্থ বান্দাকে সঙ্গে নিয়ে শেখ মীর তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল। সকলেই প্রস্তুত। তবে যতটা নিঃশব্দে কাজ সমাধা হয়, করতে হবে এখন।

সন্তর্পণে পদক্ষেপ করে তারা এগিয়ে এল মুরাদের দিকে। এক বান্দার পায়ে লেগে সিরাজীর পাত্রাধার এবং পাত্রগুলি পড়ে গেল সশব্দে।

সেই শব্দে মুরাদের ঘুম ভেঙে গেল। তড়াক করে উঠে পড়ে লড়িয়ে সতর্কতা আর স্বভাববুদ্ধিবলে তরবারিটার দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। কিন্তু কিছুই হাতে ঠেকল না। বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

ঔরঙ্গজেব জানতেন, হাতে অস্ত্র থাকলে মুরাদকে কাবু করা খুব শক্ত। সেজন্য আগেভাগে সেদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার ব্যবস্থা বাঁদীকে দিয়ে করে রেখেছিলেন।

মুরাদের নেশার ঘোর অবস্থার গতিকে কেটে গেছে। বিস্মিত মুখভাবে আস্তে আস্তে আশঙ্কা ফুটে উঠল। মুরাদ তবু গলায় জোর এনে বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার, তোমরা কি চাও?'

শেখ মীর এবং অন্যান্যরা জবাব না দিয়ে মুরাদকে ঘিরে ধরল গোল হয়ে।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিলেন মুরাদ। কি ঘটতে যাচ্ছে মুরাদের মোটা বুদ্ধিতেও বুঝতে অসুবিধা হল না। তবু তিনি গলার স্বরে একটু উষ্মা প্রকাশের চেষ্টা করে বললেন, 'এ কি ব্যবহার? আমার সঙ্গে শঠতা করতে এতটুকু বাধল না তোমাদের?'

'শান্ত হও ভাই।' ঔরঙ্গজেবের মন্দ্রস্বর মুরাদের পিছন থেকে ভেসে এল।

'শান্ত হব?' মুরাদ ঔরঙ্গজেবের দিকে ঘুরে বললেন, 'এর পরও শান্ত থাকতে বল না কি?'

'হ্যাঁ বলি।' স্থিরকণ্ঠে ঔরঙ্গজেব বললেন, 'তোমাকে কিছু দিনের জন্য আটক রাখা হ'ল।'

'কেন?'

'তোমার উপস্থিত কার্যকলাপে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তোমার ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতাই তার কারণ।' ঔরঙ্গজেব চিকের আড়াল থেকেই বললেন, 'সেই বুদ্ধিহীন ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতার জন্য তুমি তা বুঝতে পার নি। দেশের এবং দশের ক্ষতি করছ তুমি। রাজ্য চালানোর ব্যাপারেও তুমি একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছ। তাই তোমার এবং সাম্রাজ্যের ভালো করার জন্যই কিছুদিন তোমায়

কয়েদ থাকতে হবে ভাই। আর যাতে আমি তোমাকে চোখে চোখে রাখতে পারি, সে ব্যবস্থাও করব। তোমায় কষ্ট করে আর হুকুম করতে হবে না।'

'তাহলে তুমি আমায় কয়েদ করেছ আমার ক্ষতির জন্য। তুমি সাহায্য করতে বলেছিলে, তাই করেছি। এখন তুমি এই ব্যবহার করছ কেন? তুমি আমায় কয়েদ করে মেরে ফেলতে চাও?'

'তোমার যাতে বিপদ হয়, এমন কাজ আমি কখনই করব না।'

'আমি বুঝতে পেরেছি, তুমি আমায় কয়েদ করে তোমার চুক্তি ভাঙার সুযোগ করে নেবে। কেমন, তাই না? তোমার প্রতিজ্ঞা গুলো মনে করে দেখ।'

'না ভাই, চুক্তির কোন প্রতিজ্ঞাই আমি ভুলি নি। শান্ত স্বরে ঔরঙ্গজেব বলে চললেন, 'কিন্তু ভাইয়ের জীবনটা খোদার আশ্রয়ে ঠিকই থাকবে। এতদিন তোমার পরামর্শদাতাদের কথা শুনে জ্ঞান হারিয়েছিলে। এবার কয়েদখানায় বসে রোজ জ্ঞানের রুটি খেলে দেখবে, এই কয়েদ তোমার ভালোর জন্যেই করা হ'ল।'

'বুঝলাম।' মুরাদ বোঝেন, প্রতিবাদ করে কোন ফল হবে না। তবু বললেন, 'এবার তোমার মসনদ নিষ্কণ্টক হ'ল, তাই না?'

'খোদা আমাকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবেন তা জানি না ভাই।' ঔরঙ্গজেব শান্ত স্বরে কথাগুলো বললেন, 'কিন্তু আমি ত বলেছি, আমি আমার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলি নি।'

'আমার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তুমি যে শঠতা করলে, খোদা তা ক্ষমা করবেন না।' মুরাদ একটুখানি বেপরোয়াভাবে বলে উঠলেন।

হাসির একটা শব্দ তুলে চিকের আড়াল থেকে ঔরঙ্গজেব বললেন, 'আমাকে দিয়ে খোদা যে করিয়ে নিলেন ভাই। আমি

কিছুই করি নি। সুতরাং সে প্রশ্ন ত এখানে ওঠে না। কিন্তু ও সব কথা এখন থাক ভাই। শেখ মীর।'

ঔরঙ্গজেবের ইঙ্গিতপূর্ণ ডাকে শেখ মীর মুরাদের সামনে এগিয়ে এলেন। মুরাদ চুতুর্দ্দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। না, এখানে কোন রকম বাধা দেওয়া মানেই আত্মহত্যা করার সামিল। আর অনুনয় বিনয়েও কোন ফল হবে না সে ত আগেই বুঝে গেছেন তিনি। এখন বুদ্ধিমানের মত চুপ করে সব কিছু মেনে নেওয়াই ভাল। দেখা যাক এরপর কি হয়।

শেখ মীর মুরাদের সম্মুখে এসে সেলাম জানিয়ে সোনার নিগড় দিয়ে পা দুটি পরম যত্নের সঙ্গে আবদ্ধ করে ফেলল।

ঔরঙ্গজেব চিকের আড়াল থেকে বললেন, 'এবার আমার ভাইকে যেখানে নিয়ে যেতে বলেছি, সেখানে নিয়ে যাও। দেখ, ওর বন্ধুরা যেন টের না পায়। সেজন্য যেমন বলে দিয়েছি, তেমন ব্যবস্থা করবে। কেমন ?'

'যো হুকুম।'

ঔরঙ্গজেব এবার নিশ্চিন্ত হলেন। মুরাদ আর কোন রকম বিপদ সৃষ্টি করতে পারবে না। এবার পথ মুক্ত এবং প্রশস্থ। এরপর দারা....দারাশিকো।

মধ্য রাত্রির পর হারেমের মহিলাদের যে রকম হাওদায় নিয়ে যাওয়া হয়, সেই রকম ঘেরা হাওদা সাজিয়ে চারটি হাতী তৈরী ছিল। তারই একটিতে মুরাদকে তোলা হল। দিলীর খাঁ এবং শেখ মীরের অধীনে বিরাট ঘোড়সওয়ার বাহিনী দিল্লীর সালিমগড় দুর্গের দিকে রওনা হল। সেখানকার কয়েদখানায় রাখা হবে মুরাদ বক্সকে। ত্বরিত গতিতে বাহিনী এগিয়ে চলল।

একইভাবে সাজান বাকী তিনটি হাতী—মুরাদের বন্ধুরা যাতে

বুঝতে না পারে, মুরাদকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে—সঙ্গে ঘোড়সওয়ার বাহিনী, পুব, পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকে যাত্রা করল।

মুরাদের বাদশা হবার স্বপ্ন কয়েদখানার দেওয়ালের মাঝে প্রতিফলিত হবার প্রতীক্ষায় রইল।

দারা আগ্রা থেকে দিল্লী পৌঁছলেন ৫ই জুন, ১৬৫৮।

পথের মাঝে একে একে এসে যোগ দিয়েছিল মুস্তাফা খাঁ, মহম্মদ সরিফ কলিচ খাঁ, ফিরুজ মিয়াতি, মানুচ্চী সাহেব এবং আরো অনেকে। সেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত পাঁচহাজারী বাহিনী নিয়ে দারা এসে পৌঁছলেন দিল্লীতে।

পুরানো শহরে বাবরের ভগ্নপ্রায় দুর্গে দারা আশ্রয় নিলেন। কিন্তু বসে থাকলে ত চলবে না। দারাকে এখন বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, তাদের রণসাজে সজ্জিত করতে হবে। সেইজন্য তিনি নেমে পড়লেন কাজে সময় নষ্ট না করে।

কিন্তু নিশ্চিতভাবে কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল না। তাঁকে সেদিন ঠিক করতে হ'ল আবার ছুটতে হবে, যেদিন ওয়াজের হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'লেন তাঁর দিল্লীর আস্তানায়।

দারা যখন দাউদ খাঁ, ফিরুজ মিয়াতির সঙ্গে বসে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে কথা বলছিলেন, সেই সময় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন বন্ধু ওয়াজের আলি।

ওয়াজেরকে দেখে দারা একটু অবাক হয়েছিলেন। বিস্মিত স্বরে বলে উঠলেন, 'ওয়াজের, তুমি হঠাৎ যে?'

ওয়াজের একটু হাসলেন, 'হ্যাঁ, আপনি আগ্রা ছেড়ে চলে আসার পরই মনে হ'ল, আমি আপনার সঙ্গী হই। তাই আপনার টানে চলে এলাম।'

'শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে ভাই। কিন্তু আমি ত বেড়াতে বেরুই নি ওয়াজের। আমি পালিয়ে এসেছি। তুমি আমার জন্য কেন কষ্ট করবে ভাই?' দারা আন্তরিকতার সুরে বললেন কথাগুলো।

'তাতে কি হয়েছে শাহজাদা?'

'তা হয় না ওয়াজের। আমার পথটা বড় পঙ্কিল—সে কথা থাক। এখন খবর যদি কিছু থাকে ত বল?'

'খবর আছে। আগ্রার কেল্লা শাহজাদা ঔরঙ্গজেবের দখলে।'

'সে আমি বুঝতে পেরেছি বাদশার চিঠি এবং সাহায্য হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে।' দারা বললেন।

'সব চেয়ে বড় কথা, বাদশা বন্দী।' ওয়াজের জানালেন।

'বন্দী!' নিজের মনে প্রশ্নটা করে দারা বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'এটা আমি ভাবি নি, তিনি বন্দী হবেন। অবশ্য এ ছাড়া অন্য কিছু ত হওয়ার কথা নয়। ঔরঙ্গজেব আর মুরাদ ত সেই কারণেই কেল্লা অবরোধ করেছে। তবে এ কথা তোমাকে বলে দিচ্ছি ওয়াজের, মুরাদ যে আশা করেছে, সে আশা তার পূর্ণ হবে না। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে ঔরঙ্গজেব মুরাদকেও বন্দী করবে।'

দারা নিজেও জানতেন না, তিনি কত বড় সত্যি কথা বলে ফেললেন।

ওয়াজের বললেন, 'কিন্তু শাহজাদা, আপনার কি এখন এখানে থাকা ঠিক হবে। শাহজাদা ঔরঙ্গজেব আগ্রা থেকে দিল্লীর পথে রওনা হয়েছেন। ওঁরা রওনা হওয়ার পরই আমি বেরিয়ে পড়েছি আপনাকে খবরটা দেবার জন্য। পথে প্রয়োজনে সময়ও নষ্ট করি নি। মনে হয়, শীঘ্রই তিনি এখানে এসে পৌঁছবেন। তাই—'

'তাই আর আমার এখানে থাকা উচিত নয়। বেরিয়ে পড়া উচিত—পালান উচিত, এই ত?' শেষ কথাটা যেন একটু জোর দিয়ে

বলতে চাইলেন দারা। বিষাদের একটা হাসি মুখে টেনে তিনি বললেন, 'তুমি এ খবরটা দিয়ে ভালোই করেছ ভাই। যদিও আমি খবর ঠিকই পেতাম, তবু তুমি উপকার করেছ আগেভাগে খবরটা দিয়ে। এবার প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'কোন্ দিকে যাবেন বলে ঠিক করেছেন শাহজাদা?' দাউদ খাঁ এবার বিনম্র স্বরে প্রশ্ন করল।

'ভাবছি পুবদিকেই যাব। এলাহাবাদের দিকে গিয়ে সুলেমানের সঙ্গে যোগ দিয়ে সেখানকার শক্ত কেল্লাটায় আস্তানা গেড়ে বসব। সুলেমানের বাইশ হাজারী ফৌজের শক্তি নিয়ে সুজাকে পাশে টানার চেষ্টা করব।' দারা বললেন।

'শাহজাদা সুজাকে পাশে পেলে ভালই হবে। কিন্তু শাহজাদা, তাঁকে যদি না পান? তিনি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেন?' ফিরুজ মিয়াতি বলে উঠল, 'তাহলে তু'দিক থেকে আপনাকে বিপদে পড়তে হবে। শাহজাদা ঔরঙ্গজেব পশ্চিম থেকে আর শাহজাদা সুজা পুবদিক থেকে আপনাকে চেপে ধরবে।'

দারা প্রথমে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু একটু ভেবে নিয়ে দেখলেন, ফিরুজ মিয়াতি ভুল বলে নি। যদি সত্যিই এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তু'দিক সামলে ওঠা তখন মুস্কিল হ'য়ে উঠবে। তাছাড়া সুজা সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হবে কি না তাও জানা নেই। পাঞ্জাবের দিকে যদি তিনি এগুবার জন্য মনস্থির করেন, তাহ'লে শীঘ্রই সে পথে বেরিয়ে পড়তে হবে।

ফিরুজ মিয়াতি দারার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করে দিয়ে বলতে থাকে, 'কারণ বর্ষাটা আরও বেশি শুরু হ'লে আমাদের পাঞ্জাবের পথে এগুনো কষ্টকর হয়ে পড়বে। সুতরাং শাহজাদা, আমাদের যদি ও পথে যেতে হয়, তবে এখুনি বেরিয়ে পড়া দরকার।'

হ্যাঁ পাঞ্জাব। পাঞ্জাবের দিকে যাওয়াই ভাল। পাঞ্জাবে তিনি সুবাদার ছিলেন একসময়। কিছুটা জানেন জায়গাটাকে। লড়িয়ে লোক ওখানে ভালই পাওয়া যাবে। তার উপর হাতের কাছেই আফগানিস্থান। শক্তিসমর্থ মানুষ ওখান থেকে সংগ্রহ করা যাবে। তাছাড়া বিশ্বাসী সৈয়দ ঘৈরাল খাঁ রয়েছে। তার উপর নিজস্ব সম্পত্তির অনেকটাই রয়েছে লাহোরের কেল্লায়। এখন সব থেকে প্রয়োজনীয় হচ্ছে অর্থ—সেটাও পাওয়া যাবে সেখানে। তার উপরে গোলাবারুদ ত আছেই। সুতরাং সব দিক থেকে ভেবে দেখলে ও দিকে যাওয়াই ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে।

দারা মন স্থির করে নিয়ে বললেন, 'আমরা পাঞ্জাবের দিকেই যাব। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও। আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়াই ভাল।'

'যো হুকুম শাহজাদা।'

সেলাম জানিয়ে ফিরুজ মিয়াতি আর দাউদ খাঁ চলে গেল।

দারা উঠে দাঁড়ালেন। সামনের জানালাটা দিয়ে দৃষ্টিটাকে বাইরে পাঠিয়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত বাদে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ওয়াজেরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'আমার এসব ভাল লাগছে না ওয়াজের। এই অশান্তি আমার পক্ষে অসহ্য। তুমি হয় ত বলবে, তাহলে লড়াই করার কি প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ওয়াজের, তুমি নিশ্চয়ই জান, লড়াইটা ছিল বিদ্রোহী-দের বিপক্ষে, যারা বাদশা জীবিত থাকাকালেই অন্যায় করতে পিছপা হয় নি। তাছাড়া পিছনে আরও একটা কারণ ছিল, সেটা হচ্ছে তাদের আমার অধিকারকে অস্বীকার করা। না হলে তারাই বা লড়ায়ে নামবে কেন?'

দারা একটু চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলেন, 'তুমি

এখন একটা প্রশ্ন করতে পার, অশান্তি যদি মনে এসে থকে, তবে সরে দাঁড়ালেই হয়। আমি তাহ'লে বলব, সেই অধিকারের কথা, দ্বিতীয়ত, নিজের সম্মানটা ফিরে পাবার চেষ্টা, তৃতীয়ত শুধু পালিয়ে বেড়িয়ে কোন লাভ নেই।'

ওয়াজের চুপ করে শুনে যান। দারার স্বভাব জানেন তিনি, ভাবাবেগকে তাই বাধা দেন না।

দারা বলে চললেন, 'তাছাড়া আমার একটা স্বপ্ন আছে ওয়াজের। সব সময়ই যার কথা তোমাদের বলে এসেছি। সেই হিন্দু আর মুসলমানের মিলনের স্বপ্ন। তুমি দেখ, সৃষ্টিতত্ত্বের কথায় দু'ধর্মেই মিল আছে। ফারাক শুধু, যে শব্দ উচ্চারণ করা হয়েছে, সেটুকুই। লক্ষ্য যখন এক, মূল সত্য কি করে ফারাক থাকে। স্বর্গ মিথ্যা, বেহেস্ত সত্য। এ নিয়ে তর্ক করার কোন যুক্তি আছে? অর্থটা দেখ, স্বর্গও যা, বেহেস্তও তাই। সবাই সেখানে যেতে চায়।'

দারা অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না। ওয়াজেরও কি বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তবু ভারী আবহাওয়াটা কাটাতে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করতে চাইলেন, 'আপনার বেগমরা, ছেলেমেয়েরা কেমন আছেন?'

'ভাল। ওরাই ত আমার একমাত্র সান্ত্বনার কারণ ওয়াজের।'

'বেশ। তাহলে শাহজাদা, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন নিশ্চয়। আমি কিন্তু তাই চাই।' ওয়াজের বলল।

'না ভাই, আমার কষ্টের পথে তোমাকে হাঁটাতে চাই না। অনিশ্চিত ভাগ্যের সঙ্গে তোমাকে জড়াব না। তাছাড়া আমাকে যারা ভালবাসে, তাদের মধ্যে তুমি একজন। সুতরাং...'

'কিন্তু—'

দারা বাধা দিয়ে উঠলেন ওয়াজেরের কথায়, 'তুমি আমার কথা

শোন ওয়াজের। আমায় ভুল বুঝো না। তুমি দু'দিন এখানে থাক। হাইবাতকে আমি বলে দিয়ে যাব, যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়।'

'হাইবাত! সে কোথায়?' ওয়াজের হাইবাতকে চিনতেন।

'দিল্লীতেই আছে। সঙ্গে সেও আসতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকেও নিই নি। হাইবাতের কাছেই তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—পরে তুমি আগ্রায় ফিরে যেও।'

হাততালির ইঙ্গিতে বান্দা বসন্ত এসে সেলাম জানাল, 'মালিক।'

'বসন্ত, তুমি ওয়াজেরকে হাইবাতের কাছে নিয়ে যাও। বলবে, যেন যত্নের ক্রটি না হয়। আর ওকে বলে দিও, আমরা দিল্লী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'যো হুকুম মালিক।'

'যাও ওয়াজের।'

'শাহজাদা, আপনার সঙ্গে থাকলে আমার কষ্ট হত না।'

'জানি। তোমার কষ্ট হলেও তুমি সহ্য করবে; কিন্তু তাতে আমার যে কষ্ট হবে। মন খারাপ কর না ওয়াজের। তোমাদেরকে আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।' মৃদু হাসিমাখা মুখে দারা আবেগভরে বললেন কথাগুলো, 'বিদায় ওয়াজের।'

ওয়াজের একটুক্ষণ মাথা নীচু করে চুপ করে থাকার পর বললেন, 'বিদায় শাহজাদা। খোদা আপনার মঙ্গল করুন।'

বসন্তের সঙ্গে ওয়াজের বেরিয়ে গেলেন। দারা সেই দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। একটা দীর্ঘশ্বাস শুধু বেরিয়ে এল। মাথা নীচু করে চিন্তার রেখা মুখে এঁকে পায়চারী করতে লাগলেন।

দারা পাঁচ থেকে দশ হাজার বাহিনীর শক্তি দিল্লীতেই বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। তাই আর অপেক্ষা করলেন না। সুলেমানকে আগ্রা, দিল্লী এড়িয়ে ঘুরপথে গঙ্গা যমুনা পেরিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলতে নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

তিনি সরহিন্দ পৌঁছে শাহী খাতায় জমা হয়ে থাকা বারো লাখ টাকা নিয়ে আবার এগিয়ে চললেন। শতদ্রু পেরিয়ে হুকুম দিলেন, 'খেয়াঘাটের সমস্ত নৌকাগুলো নষ্ট করে ফেল। ঔরঙ্গজেবের বাহিনী নদী পেরিয়ে আসার সুযোগ যেন না পায়।'

বিয়াস নদীর ধারে সুলতানপুরে এসে দাউদ খাঁ বললে, 'শাহজাদা, আমি এখানেই থেকে যাই।'

'কেন?'

'এখান থেকেই পিছুপিছু আসা ঔরঙ্গজেবের ফৌজকে বিয়াস পেরুতে বাধা দেব। আর যদি ওদের ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারি, আমাদের পথ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

দারা দাউদ খাঁর কথাটা একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছ। বলা যায় না, হয় ত ফলাফল আমাদের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'বেশ, তুমি এখানেই থাক। আমি লাহোরে পৌঁছেই সিপিরকে আরও সেপাই আর রসদ দিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

দাউদ খাঁ সুলতানপুরে রয়ে গেল পশ্চাদধাবিত ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর অপেক্ষায়।

৩রা জুলাই, দারা লাহোরে পৌঁছলেন।

সেখানে সৈয়দ ঘৈরাল খাঁ আর মুসাহিব বেগমকে পাঠালেন রূপারের খেয়া ঘাট পাহারা দেবার জন্য। সুজার কাছে চিঠি

লিখলেন, ঔরঙ্গজেবকে আক্রমণ করতে বলে এবং হিন্দুস্থানে তাঁদের দুজনের মধ্যে অর্দ্ধেক মালিকানার সর্ত নিয়ে।

ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে দারার বাহিনী দশ হাজার থেকে বিশ হাজারে এসে দাঁড়াল।

দারা খুব খুশী হলেন—যখন জম্মুর হিন্দু জমিদার রাজা রাজরূপ আর বেরা এবং খুসবের ফৌজদের খঞ্জর খাঁ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল।

রাজরূপ বলেছিল, 'শাহজাদা, আমি আপনার উপকারে লাগতে চাই। কারণ আপনি আমাদের হিতৈষি, হিন্দুদের যথেষ্ট সুনজরে দেখেন। আমরা, হিন্দুরা আপনাকে ভালোবাসি। তাই যদি আমি আপনার কোন সাহায্যে আসতে পারি, নিজেকে ধন্য মনে করব।'

সেদিন রাজরূপের কথাগুলো দারা অত মেপে দেখেন নি, নজরে আনেন নি রাজরূপ নামের মানুষটাকে। তার কথার আবেগই তাঁকে অভিভূত করেছিল। প্রথমটায় তাই বিশেষ কিছু বলতে পারেন নি, শুধু বলেছিলেন, 'রাজা, আমি কি ভাবে আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাব, ভেবে পাচ্ছি না। আপনিই বলুন, আমাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারেন?'

'আমি আপনার আগামী দিনের প্রয়োজনের জন্য তহবিলে যতখানি সম্ভব টাকা তুলে দেব, আর দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আমার যা করণীয়, সবই আমি করব।' রাজরূপ নিজেই প্রস্তাবটা রেখেছিল।

দারা খুশী মনে বলেছিলেন, 'আপনি আমার পক্ষে যোগ দিয়ে মনের শক্তি অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছেন রাজা। আপনার কথা আমার মনে থাকবে। শুধু আপনার কথামত কাজটুকু করলেই আমার জয়ের পথ অনেকটা সুগম হবে।'

'এ আর এমন কি শাহজাদা।' রাজরূপ বিনীত হয়ে বলেছিল।

'খুব ভাল কথা। আপনি অবশ্যই কাল একবার আসবেন। অপনাকে কিছু উপহার দেব।'

'না, না, তার আর দরকার নেই শাহজাদা।'

'দরকার নিশ্চয়ই আছে। অন্ততঃ আমার কাছে।' দারা বেশ জোরের সঙ্গে আবেগভরা গলায় বলেছিলেন।

'বেশ, তবে কাল আবার দেখা হবে।' রাজা রাজরূপ বিদায় নিয়েছিলেন।

দারার মনে এখন বেশ একটু খুশীর হাওয়া। সমস্ত লক্ষণই তাঁর কাছে শুভ বলে মনে হচ্ছিল। রাণাদিলের দেখতে বেশ ভাল লাগছিল দারাকে। বহিন নাদিরা তার কাছেই বসেছিল। আগে হু'জনে এতখানি পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে নি। কিন্তু স্নেহময়ী নাদিরা এই ছুর্যোগের দিনগুলোতে আঁকড়ে ধরতে চাইছিল কাউকে। কঠিন মাটিতে মানুষ হওয়া রাণাদিল মনের মধ্যে জোর আনার চেষ্টা করেও শাহজাদা দারাশিকোর জন্য একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল বৈকি। সেই আকর্ষণেই যেন হুজনে হুজনকে কাছে পেতে চায় সবসময়, অপ্রকাশ্য কোন সান্ত্বনার জন্যও বুঝিবা।

সেদিন রাজা রাজরূপের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই দারা এসেছিলেন তাদের কাছে। বলেছিলেন, 'জান, আজ রাজা রাজরূপ নিজেই এসেছিলেন। আর আমাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন।'

'সে ত খুব ভাল কথা শাহজাদা।' রাণাদিল খুশীর রেশ টেনে বলেছিল।

'হ্যাঁ, রাজরূপের সাহায্য আমার অনেক উপকারে লাগবে।

তাছাড়া তিনি আমার পক্ষে যোগদান করায় আমার শক্তিও কিছুটা বাড়ল বলতে পার।' দারা আপন মনে যেন বলে যেতে লাগলেন, 'এই রকম ভাবে যদি শক্তি বাড়িয়ে যেতে পারি, তা'হলে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে মোকাবিলায় আমার জয় সুনিশ্চিত।'

নাদিরা এতক্ষণ শুনছিল সব কথা। কি ভেবে বলে উঠল, 'যদি রাজা রাজরূপকে কোন বাঁধনে বেঁধে ফেলা যায়, যেটা কেটে আর বেরিয়ে যেতে পারবেন না তিনি।'

দারা নাদিরার দিকে ফিরে হেসে বললেন, 'সে কথা আমি আগেই ভেবেছি নাদিরা। আমি সেইজন্য তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চাই। আর তাই তাঁকে কাল আবার ডেকেছি কিছু উপহার দেব বলে।'

'না, না, তার থেকেও আরও শক্ত কিছু।' মাথা ঝাঁকিয়ে নাদিরা বলল।

'তার থেকেও আরও শক্ত কিছু! সেটা কি?' দারা কিছুই বুঝতে পারেন না।

রাণাদিলও অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকে নাদিরার দিকে। সেও ভাববার চেষ্টা করে—কিসের কথা নাদিরা বলছে?

দারার প্রশ্নের উত্তরে নাদিরা দীপ্ত চোখে তাঁর দিকে চেয়ে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আমি ভেবে নিয়েছি কি করব। তাহলে আপনার স্বার্থে রাজা রাজরূপকে আসতেই হবে, আর সে বাঁধন কেটে রাজা কিছুতেই বেরুতে পারবেন না।'

'বেশ ত বহিন, তাহলে ত শাহজাদার খুবই ভালো হয়।' রাণাদিল মৃদু হেসে বলল, 'এখন বল ত, কি করতে চাও?'

'আমি রাজা রাজরূপকে আমার বুকের দুধ পাঠাব।' দৃপ্তভাবে নাদিরা বলল।

দারা বিস্ময়ে হতবাক হলেন, 'সে কি!'

'হ্যাঁ শাহাজাদা। একবার তিনি এ দুধ মুখে দিলে তিনি আমার সন্তান হলেন। আর সন্তান কি কখনও তার আব্বাজানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারে?' নাদিরা হেসে কথাগুলো বললে।

নাদিরার কথায় দারা হাসল। বললে, 'তোমার যুক্তিটা মন্দ নয়। আচ্ছা, তাই হবে বেগম সাহেবা।'

পরদিন রাজা রাজরূপকে আমন্ত্রণ জানালেন দারা।

রাজরূপ আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। দারা এক পাত্র দুধ এনে রাজরূপের হাতে দিলেন। বললেন, 'রাজা, আমার ভালবাসার চিহ্ন গ্রহণ করুন।'

'কিন্তু এ তো দেখছি দুধ!' রাজা রাজরূপ বিস্ময়ে দারার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন।

'হ্যাঁ, দুধই।' দারা হেসে বলেছিলেন।

রাজরূপ এই দুধের উপস্থিতির কারণটা কিছুই বুঝতে পারেন নি। অবাক হ'য়ে তাকিয়ে ছিলেন দারার দিকে।

দারা আবার হেসে বলেছিলেন, 'এ দুধ আমার নাদিরা বেগমের। সে আপনার জন্য পাঠিয়েছে।'

'কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না শাহজাদা!'

'বুঝতে পারছেন না?' দারা বলেছিলেন, কিছুটা যেন লাজুক হাসি তাঁর মুখে, 'আপনি নাদিরার দুধে মুখ দিলে, আপনি তার কে হ'বেন?'

রাজরূপ কিছুক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করল রহস্যটা। কিছুক্ষণ বাদে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠল প্রথমে। পরে হাসি থামিয়ে বললেন, 'আমি ভুলেই গেছিলাম শাহজাদা। আমি

দুধটুকু মুখে দিলেই তিনি আমার আম্মা হ'বেন, আর আমি তাঁর বেটা।'

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন রাজা।' দারা বললেন।

'বেশ, বেশ, তাই হোক। দুধটা দিন।' হাতে পাত্রটা নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে এক চুমুক দিয়ে পাত্রটা নামিয়ে রাখল রাজরূপ। তারপর বললে, 'বলবেন, কোন দরকার হ'লেই যেন আমাকে জানান।'

'বেশ বলব।' খুশীভরা গলায় দারা বললেন, 'এবার আমার কিছু দেওয়ার আছে।'

'আপনার দান আমি সানন্দে গ্রহণ করব আব্বাজান।' রাজরূপ আবার হো হো করে হেসে ওঠে।

দারাও সে কৌতুকে সাড়া দিয়ে হেসে ওঠেন। রাজরূপ দারার দেওয়া লাখ কয়েক টাকা নিয়ে নিজের করণীয় বিষয় এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, ডেরায় চলে গেল।

নাদিরা সুখী। রাণাদিল খুশী। দারা আনন্দিত। কিন্তু দারা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সুলতানপুরে দাউদের সাহায্যের জন্য। দাউদ হয় ত বিয়াসের ধারে বসে অধীর হয়ে উঠেছে। তিনি কিছু সংখ্যক ফৌজ আর রসদ সহ সিপিরকে পাঠাবেন বলে স্থির করলেন। কিন্তু কথাটা শুনে নাদিরা কেঁদে ফেলল। সে এবার সিপিরকে লড়ায়ের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না। সুলেমান সেই গেছে, এখনও ফেরে নি। সিপিরও যদি লড়ায়ের ঢেউয়ে ভেসে যায়।

দারা নাদিরাকে বোঝায়, 'তুমি বুঝছো না নাদিরা, দাউদ অপেক্ষা করছে ফৌজ আর রসদের জন্য। সিপির গিয়ে না পৌঁছলে ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর কাছে আমরা হেরে যাব।'

নাদিরা বললে, 'অন্য কাউকে পাঠান।'

দারা বললেন, 'কাকে পাঠাব বল?'

নাদিরা বললে, 'সুলেমান গেছে, সে এখনও ফিরল না। সিপির যুদ্ধের বোঝে কি? ওকে আমি ছেড়ে দেব না।'

দারা হতাশ হলেন। কিন্তু ভাগ্যের গতি ঘোরাবে কে? অনেক আকুতির পর সিপির যখন রওনা হল যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে, তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

দাউদ খাঁ খবর পাঠিয়েছে, অত্যন্ত দুর্বল বাহিনী নিয়ে সে ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর উপর আঘাত হানতে পারে নি। সে এখন সমস্ত ফৌজ সরিয়ে এনে অপেক্ষা করছে বিয়াসের অপর পারে গোবিন্দ্‌ওয়ালে।

খবর শুনে দারা মুসড়ে পড়লেন।

সিপির দাউদের সঙ্গে মিলিত হল তার দলবল নিয়ে গোবিন্দ্‌-ওয়ালে, ক'দিন কেটে যাবার পর।

জ্যোতিষিরা ঔরঙ্গজেবের মসনদ আরোহণের উপযুক্ত দিন ধার্য করলেন ১৬৫৮ সালের ২১শে জুলাই। দিল্লী শহরের বাইরে শার্লোমারবাগে বিনা সমারোহে নিজের অভিষেক নিজেই সমাপ্ত করে ঔরঙ্গজেব হিন্দুস্থানের মসনদে বসলেন। নাম নিলেন আলমগীর বাদশাহ গাজী।

সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল তামাম হিন্দুস্থানে—ঔরঙ্গজেবই এখন হিন্দুস্থানের একমাত্র মালেক।

এরই দু'দিন পর ঔরঙ্গজেব দারার সন্ধানে লাহোরের পথে ফৌজ সমেত যাত্রা করলেন। বাহাদুর খাঁ, দিলীর খাঁ, কলিলউল্লা খাঁ—এরা সবাই এগিয়ে গেছে অনেক আগেই। পথেই খবর এল,

জম্মুর জমিদার রাজা রাজরূপ আর ফৌজদার খঞ্জর খাঁ দারার পক্ষে যোগ দিয়েছে।

ঔরঙ্গজেব একটু মুসড়ে পড়লেন। কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। তাঁর মুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল।

ঔরঙ্গজেব জানতেন, মানুষের চরিত্রের চরমতম দুর্বলতার মুহূর্ত। তিনি জানতেন, প্রতিটি মনুষই স্বার্থপর, লোভী। লোভের বশবর্তী হলে তখন তাদের না থাকে বিবেক, না থাকে সম্যক চেতনা, না থাকে বিশ্বাসের প্রশ্ন, ব্যক্তিত্ব। তিনি এতদিন নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যতটা না লড়াই করেছেন, তার চেয়ে বেশী সুযোগ নিয়েছেন লোভীদের লোভ পূরণ করে।

রাজরূপ আর খঞ্জর খাঁকে সেই লোভই দেখালেন তিনি। সবকিছু ভুলে তারা গোপনে আত্মসমর্পণ করল। ক'দিন আগে কলিলউল্লা যুদ্ধক্ষেত্রে যা করেছিল, এরাও আজ সেই পথই অনুসরণ করল। এ যেন ঘরের ইঁদুর দিয়ে অন্যের বেড়া কাটান!

পরিতৃপ্ত বাদশাহ তাঁবুতে বসে নিজের মনেই হাসলেন দারার বিরূপ ভাগ্যের জন্য। হতভাগ্য দারা! বাদশা হবার কত না আশা, আকাঙ্খা। এ ক'দিনেই তা ধূলিসাত হয়ে গেছে একথা যখন সে জানতে পারবে....

না। ঔরঙ্গজেব নিজেকে সংযত করলেন। এ আত্মপ্রসাদের সময় এখন নয়। এখন কাজ। রাজরূপ গেছে, খঞ্জর খাঁ গেছে। এবার দাউদ খাঁ—দারার বিশ্বস্ত অনুচরদের একজন। যদি একে হাত করা যেত, দারার পাশ থেকে একেও সরান যেত? কিন্তু কি করে তা সম্ভব? সে যে অসম্ভব চতুর আর বিশ্বাসী ও সৎ মনের মনুষ। লোভ দেখিয়ে তাকে ত বশ করা যাবে না। ঔরঙ্গজেব ভ্রূকুঞ্চিত করে ভাবতে লাগলেন।

ভাবতে লাগলেন, পথের কাঁটা মুরাদকে তিনি সরিয়েছেন। সেদিক থেকে তিনি নিশ্চিন্ত। কতই না স্বপ্ন ছিল তার হিন্দুস্থানের মসনদকে ঘিরে। কিন্তু সব স্বপ্নই তার মিলিয়ে গেছে। নির্বোধ মুরাদ এখন পাথরের কয়েদঘরে বসে দেওয়ালে মাথা ঠুকছে হয় ত। তাকে শেষ করা যাবে দেওয়ান আলিনকির কথা তুলে—যাকে সে হত্যা করেছে কয়েক বছর আগে। তাই এখন শুধু এক চিন্তা —দারা। দাউদহীন দারা!

ঔরঙ্গজেব মুচকি হাসলেন। হঠাৎ মাথাটা তাঁর নড়ে ওঠে। বিচ্ছেদের উপায় পাওয়া গেছে। সামনের আসনটায় বসে কলমদানটা টেনে নিয়ে লিখতে বসলেন ঃ

দাউদ খাঁ,

তোমার যে পত্র পেয়েছি তা থেকে জানতে পারলাম, তুমি আমায় বিশেষভাবে কামনা কর। আমি তোমার কাজের প্রশংসা করছি। তোমার অনুরোধ মত আমি তাড়াতাড়ি সেইদিকে এগোচ্ছি। খোদার মর্জি হলে তুমি সম্মানিত হবে তোমার সেবার জন্য। তোমার মত সেবকের এ ব্যাপারে প্রকৃত কার্যপ্রণালী হবে, তুমি যেভাবে লিখেছ সেইভাবে কাজ করা। যাতে এ ব্যাপারে আমার মন নিশ্চিন্ত থাকে। ইতি—

ঔরঙ্গজেব

নীচে নামটা লিখে মোহড়ের ছাপ অঙ্কিত করে পত্রখানা একবার পড়লেন। হাসির সূক্ষ্ম রেখা খেলে গেল ঠোঁটের কোণে। আশা করা যায়, এই তীরেই কাজ হাসিল হবে। দারাকে তিনি চেনেন। অভিমানী দারা পত্রখানি পড়েই মর্মাহত হবে। তারপর····

ঔরঙ্গজেব পত্রবাহকের হাত দিয়ে চিঠিখানা সোজা পাঠিয়ে দিলেন দারার শিবিরে।

'তাহলে, তাহলে দাউদ খাঁ, তুমিও বিশ্বাসঘাতক, বেইমান!' দারা চীৎকার করে উঠলেন। দাউদ খাঁকে তিনি তাঁর অন্যতম বিশ্বাসী সহযোগী বলেই জানতেন। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য যে দাউদ খাঁও বিশ্বাসঘাতকতা করল। দারা বিষণ্ণ মনে চিঠিখানা হাতে ধরে মাথা নীচু করে ভাবছিলেন। মনে হতাশার গ্লানি। স্তব্ধতা যেন চিন্তার মণি-কুঠুরীতে—অনুভবে বিষাদের বিস্বাদ।

'শাহজাদা।' দুনীচাঁদ নিস্তব্ধ দারাকে ডাকল।

'উঁ।' দারা চমকে উঠে তাঁর করুণ চোখ দুটি মেলে ধরলেন দুনিচাঁদের দিকে।

'এ চিঠির বাহককে কি ছেড়ে দেওয়া হবে?' দুনীচাঁদ জানতে চাইল।

'হ্যাঁ, ছেড়ে দাও ওকে। ও যখন চিঠি সম্বন্ধে কিছুই উত্তর দিতে পারছে না, তখন ওকে ধরে রেখে লাভ কি?'

রাজরূপ বলল, 'আমি নিজেও ওকে অনেক জেরা করেছি শাহজাদা।'

'বললাম ত ওকে ছেড়ে দাও। ও পত্রের বাহক মাত্র। ওকে ধরে রেখে কোন লাভ নেই।' দারা বিমর্ষ মনে কথাগুলো বললেন। তারপর কি ভেবে আবার বলতে লাগলেন, 'আপনারা সবাই এখানে আছেন। আমায় কথা দিন, চিঠিখানার কথা বিশ্বাসঘাতক দাউদ খাঁকে জানাবেন না। কই, আপনারা প্রতীজ্ঞা করুন....'

দুনীচাঁদ বিস্মিত চোখে দারার দিকে তাকাল, 'শাহজাদা, দাউদ খাঁকে ডেকে চিঠির সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞেস করলে হয় না?'

দারা চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'না, না, তা হয় না চুনীচাঁদ। বেইমানদের সঙ্গে কথা বলতেও আমি ঘৃণা বোধ করি।'

চুনীচাঁদ আবার বলল, 'কিন্তু দাউদ সম্বন্ধে যতটুকু জানি...'

দারা তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমারও তার সম্বন্ধে উঁচু ধারণাই ছিল। কিন্তু এখন তাসের ঘরের রাজা আমি। আর দাউদ তারই বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি।'

চুনীচাঁদ নীরবে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'বেশ, আমরা কথা দিচ্ছি, দাউদ খাঁকে এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলব না।'

দারা বললেন, 'আশা করি, প্রতীজ্ঞা সম্বন্ধে আপনারা দু'জনেই সংযমী হবেন। রাজা রাজরূপ, আপনি লোকটাকে ছেড়ে দিন।'

রাজরূপ বেরিয়ে গেল।

দারা চুনীচাঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে রইলেন। তারপর বললেন, 'চুনীচাঁদ, এবার এখান থেকে পাত্‌তারি গোটাবা'র বন্দোবস্ত কর।'

চুনীচাঁদ কুর্নিশ করে আদেশ পালনের জন্য ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

১৮ই আগষ্ট, পরিবার-পরিজন নিয়ে দারা মুলতানের পথে পা বাড়ালেন। সঙ্গে নিলেন এক কোটি টাকা। ৫ই সেপ্টেম্বর মুলতান পৌঁছে সেখানকার খাজাঞ্চিখানা থেকে বাইশ লাখ টাকা আর ধনরত্ন একত্র করে বজরায় চাপিয়ে ভক্করের দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে চলল, সেনাধ্যক্ষ ফিরুজ মিয়াতি আর খোজা বসন্ত।

ঔরঙ্গজেবের বাহিনী নিয়ে কলিলউল্লা খাঁ। দারার সন্ধানে মুলতানে

এসে পৌঁছল ২১শে সেপ্টেম্বর—দারার মুলতান ত্যাগের আট দিন পর। দারা কোন্ পথে গেছে প্রথমটা বোঝা গেল না। কিন্তু শেষে পথের হদিশ দিল জমিদার হাজী খাঁন। জানা গেল দারার গন্তব্যস্থলের ঠিকানা।

ভক্করের কেল্লা। বহুদিন পর রাণাদিল দারার সঙ্গ একটু পেয়েছে। ভাগ্যের এই বিরূপতা তাকেও ভারাক্রান্ত করে তুলে ছিল। বিবর্ণ, নিরানন্দেভরা দিনগুলো কেটে যাচ্ছে কি ভাবে রাণাদিল তা জানে। তবু দারার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টাই করে সে।

'একদিন দেখবেন, এভাবে আর পালিয়ে বেড়াতে হবে না।' রাণাদিল দারাকে ভাবাবেগে জড়িয়ে ধরল।

দারা নিজেকে রাণাদিলের বাহু বেষ্টনির মধ্যে রেখে বললেন, 'তোমাদের আমি শুধু দুঃখই দিচ্ছি রাণাদিল। কিন্তু কি করব, সবই ভাগ্য।'

অনেকদিন পর রাণাদিল আজ যেন উচ্ছলা নদী। দারার ঠোঁটে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে মৃদু হেসে বললে, 'কে বললে আমরা দুঃখী? আপনাকে কাছে পেলে আমরা সব দুঃখ যে ভুলে যাই শাহজাদা।'

দারা বললেন, 'সত্যি রাণাদিল?'

রাণাদিল দারার মুখের উপর একটু ঝুঁকে পড়ে বললে, 'হ্যাঁ শাহজাদা।'

দারা রাণাদিলকে নিজের বাহুর মধ্যে টেনে নিল। রাণাদিল হাসতে হাসতে বললে, 'আজ পর্যন্ত আপনার সঙ্গে আমার একদিনও ঝগড়া হয় নি। ভাবছি হলে কেমন হত?'

দারা আবেগে রাণাদিলকে একটা চুম্বন করে বললেন, 'কিন্তু কি নিয়ে ঝগড়া করবে?'

'কত কি নিয়ে করা যায়।' রাণাদিল হাসতে হাসতে বলল।

'বেশ, তবে শুরু কর।' দারা হেসে জবাব দিলেন।

রাণাদিল দারাকে নিবিড় আবেশে জড়িয়ে ধরে। অনেকদিন পর কত সুখ, কত শান্তি—মিলে মিশে এক হতে চায় যেন।

'শাহজাদা।' বাইরের দরজায় ধাক্কা দেয় গুলমহম্মদ।

দারা তাড়াতাড়ি রাণাদিলকে ছেড়ে উঠে পড়ে। বাইরে এসে বললেন, 'কি ব্যাপার গুলমহম্মদ?'

গুলমহম্মদ বলল, 'শেখ মীর আর শিকান খানের বাহিনী আমাদের দিকে ছুটে আসছে।'

দারা একটু চিন্তিত হলেন। বিষাদের সুরে বললেন, 'তাহলে এখানকারও ঘর ভেঙে আবার ছোটার পালা শুরু হবে?'

গুলমহম্মদ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দাঁড়িয়ে রইলেন সৈদ আব্দুর রেজ্জাক আর মানুচ্চি সাহেবও। দারা বলে চললেন, 'এই কেল্লায় কিছু সম্পত্তি আর হারেমের কয়েকজনকে রেখে যাব। আব্দুর রেজ্জাক আর মানুচ্চি সাহেব, আপনাদের ওপর কেল্লার ভার রইল। দেখবেন, কেল্লা যেন ওরা দখল করতে না পারে।'

ওরা দু'জনেই সম্মতি জানাল।

একে একে সবাই বিদায় নিল। শুধু দাঁড়িয়ে রইল দাউদ খাঁ। আজ ক'দিন শাহজাদার ব্যবহারে সে সত্যিই বিস্মিত। দাউদ খাঁ দাঁড়িয়েছিল। সে আজ সোজা প্রশ্ন করবে শাহজাদাকে, তার প্রতি এ রকম ব্যবহারের অর্থ কি?

'শাহজাদা।'

'উঁ।' দারা চিন্তান্বিত মুখে সারা দিলেন।

'আমার কাজে কি কোন গাফিলতি হয়েছে?'

'গাফিলতি! কই, না ত!

'তবে আমায় কোন কাজ করতে দিচ্ছেন না কেন?' দাউদ খাঁ প্রশ্ন করল।

দারা নীরব রইলেন।

দাউদ খাঁ বলল, 'আমাকে কি বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

দাউদের কথাগুলো দারার কাছে মুখোস পরা শয়তানের মত শোনাল। তিনি বললেন, 'না, না, তা নয়। তবে তোমাকে ছুটি দেব ভেবেছি।'

'ছুটি দেবেন কেন শাহজাদা?' দাউদ খাঁ একটু থতমত খেয়ে বলল।

দারা বললেন, 'আমার দুর্ভাগ্য দাউদ যে তোমাকে ছুটি দিতে হচ্ছে। তুমি তোমার পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরে যাও।'

দাউদ খাঁ বলল, 'কিন্তু ফিরে যাবার জন্যে ত আসি নি শাহজাদা। আপনি হয় ত ভাবছেন আমার পিছটান আছে। কিন্তু যে নিমক আমি খেয়েছি, তার যোগ্য মর্যাদা আমি দিতে চাই শাহজাদা। আমি আপনার সঙ্গ কিছুতেই ছাড়ব না।'

'তা হয় না দাউদ, তুমি ফিরে যাও।' দারা দৃঢ়স্বরে বললেন।

'আমাকে এভাবে তাড়িয়ে দিচ্ছেন কেন শাহজাদা?' দাউদ খাঁ আর্তস্বরে বলে উঠলেন।

দারা নীরব রইলেন।

'শাহজাদা, আমার অন্যায় হলে আমায় সাজা দিন। কিন্তু এভাবে বিদায় দেবেন না।' দাউদ খাঁ কম্পিত কণ্ঠে বলল।

দারা দৃঢ় হয়ে বসে রইলেন। দাউদ খাঁ মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কিছু একটা ঘটেছে এটা সে বুঝেছে কিন্তু ধরতে পারছে না। তার চোখের কোলটা ভিজে উঠল।

শাহজাদাকে এভাবে ছেড়ে যেতে মন তার চায় না। ভাঙা স্বরে সে বলল, 'শাহজাদা, সত্যিই আপনি আমাকে চান না?'

দারা নীরব।

দাউদ খাঁ সেলাম জানিয়ে বলল, 'আপনার ইচ্ছামতই কাজ হবে শাহজাদা। তবে আমার দোষটা আমাকে বললেই পারতেন। জেনে শুনে বেইমানি আমি কোনদিন করি নি, করবও না। আল্লা আপনাকে রক্ষা করুন।' আবার একটা কুর্ণিশ করে দাউদ খাঁ চলে গেল।

দারা নীরবে চেয়ে চেয়ে দেখলেন।

১৮ই অক্টোবর। দারা ভক্কর ছেড়ে চললেন দক্ষিণের দিকে। ক্ষীয়মান তিন হাজারের মত একটা দল নিয়ে সিন্ধু নদের একটা জঙ্গল ভেঙে দক্ষিণে রওনা হলেন তিনি।

শুরু হল পথ চলার নিদারুণ কষ্ট। তাছাড়া জলকষ্ট ত আছেই। উপায়হীন দারা কচ্ছের রাণ অঞ্চলে ঢুকলেন ২৭শে নভেম্বর। উদ্দেশ্য গুজরাট।

কচ্ছের রাও দারার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে সিপিরের সাথে তার মেয়ের শাদি পাকা করে ফেললেন। সাহায্য করলেন প্রচুর। এবার সেখান থেকে কাথিওয়ার।

সময় নেই কোথাও কালক্ষেপের। এবার ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন। কাথিওয়ারের নবাব তাঁকে সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

৯ই জানুয়ারী ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। গুজরাটের নবাব শানাওয়াজ খাঁন—মুরাদ আর ঔরঙ্গজেবের শ্বশুর—আমেদাবাদ থেকে চার মাইল দূরে সরগঞ্জে দারাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

আশাতিরিক্ত অভ্যর্থনায় দারা অভিভূত হলেন। কিন্তু এর

কারণটা প্রথমে বুঝতে পারেন নি, পরে বুঝলেন। মুরাদের প্রতি ঔরঙ্গজেবের ব্যবহার তাকে অসন্তুষ্ট করে তুলেছিল।

একদিন শানাওয়াজ খাঁন তার আসনটা দেখিয়ে দারাকে বললেন, 'এই আসনেই আপনি এখন থেকে বসবেন। আর ঐ খাজাঞ্চিখানা আপনার জন্যে খুলে দেওয়া হল। ও সবই আপনার।'

দারা বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন, না, না, এতটা আমি চাইনি।'

'কেন নয় শাহজাদা? আপনিই ত হিন্দুস্থানের আসল মালেক।' শানাওয়াজ খাঁন জানতে চাইলেন।

দারা দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন, 'না, হিন্দুস্থানের মালেক আব্বাজান। তিনি এখনও জীবিত আছেন।'

'তা ঠিক।'

দারা বললেন, 'আপনার আসনের নীচের জায়গাটুকু পেলেই আমি খুশী হব। দেখবেন, তাতেই আমি কাজ চালিয়ে যেতে পারব।'

এরপর শুরু হল কাজ। দারবারে বসলেন দারা। কিন্তু নীচু আসনে—আব্বাজানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে।

কিছুদিনের মধ্যেই গুলমহম্মদ সুরাটের দখল নিল। সেখানকার শাহী খাজনার টাকা আটক করল। তার সঙ্গে চল্লিশটার মত কামান সংগ্রহ করল। কয়েক দিনের মধ্যে দারার সৈন্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল বাইশ হাজারে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। আজমীরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন দারা। আর আমেদাবাদের সুবেদার করে রেখে গেলেন সৈদ আমীর ভকরিকে। তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে রইলেন মুরাদের পরিবারবর্গও।

কিন্তু কিছুদূর গিয়েই তাঁর আশা ভঙ্গ হল। খবর এসেছে, খাজোয়াতে ঔরঙ্গজেবের বাহিনীর কাছে সুজা হেরে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়েছে। দারা মর্মাহত হলেন সুজার এই পরাজয়ে।

১২ই মার্চ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। দারার বাহিনী ঔরঙ্গজেবের সামনা সামনি এসে দাঁড়াল, আর ১৫ই মার্চ এ যুদ্ধের শেষ হল।

ঔরঙ্গজেবের বাহিনী বিজয়োল্লাসে এগিয়ে গেল। কিন্তু দারা আর তার পরিবারবর্গ তখন তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।

কয়েকদিন পর ফরাসী হাকিম বার্ণিয়ে সাহেব খুঁজতে খুঁজতে দারার সন্ধান পেলেন। দারা প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর মুখে মলিন হাসি টেনে বললেন, 'আমায় খুঁজে বার করলেন কি করে সাহেব?'

'ঐ জিনিষপত্র আর জীবজন্তুগুলো দেখেই আন্দাজ করে ছিলাম শাহজাদা।' বার্ণিয়ে সাহেব বললেন।

দারা হাসি থামিয়ে বললেন, 'আমার দুর্ভাগ্যের চিহ্ন ওগুলো। তাই আপনি খুঁজে পেলেন। নইলে···'

বার্ণিয়ে সাহেব একটু ইতস্ততঃ করে বললেন, 'না, না, মানুষ দুঃখের পরই সুখের মুখ দেখে। এ কথা আপনার দেশেই শুনেছি।'

'আমার সুখ কোথায় লুকিয়ে আছে জানি না। তবে মরীচিকা দেখছি। বারে বারে ভুল করছি। আর এটা সেই ভুলেরই মাশুল।' দারা বললেন।

'ভেঙে পড়লে ত চলবে না শাহজাদা।'

'ভাঙি নি। তাই ত এখনও দাঁড়িয়ে আছি। হতাশ হয়েছি, তাই হা-হুতাশ করছি। আচ্ছা সাহেব, আপনি ত হাকিমি জানেন? আমার বেগমদের যদি একটু দেখেন।' দারা বললেন।

'এত অনুনয় করবেন না শাহজাদা। আপনার যদি কোন উপকারে লাগি তবে নিজেকে ধন্য মনে করব।' বার্ণিয়ে সাহেব বললেন।

'বেশ, তবে আসুন আমার সঙ্গে।' দারা উঠে দাঁড়ালেন।

পরীক্ষা শেষে বার্ণিয়ে সাহেব বললেন, 'এদের উভয়েরই চিকিৎসার প্রয়োজন। তাছাড়া বিশ্রামেরও দরকার।'

দারা দুঃখের সঙ্গে বললেন, 'বিশ্রাম আর পাবে কি করে বলুন। আমাকে ছেড়ে ওরা থাকবে না, তাই বিশ্রামও পাবে না। তবে আমেদাবাদে গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব।'

কিন্তু আল্লা বিরূপ। খবর এল, আমেদাবাদ ঔরঙ্গজেব দখল করেছেন। আর দারার নিয়োজিত সৈদ আমীর ভকরীকে কয়েদ করেছেন।

নাদিরা আর রাণাদিল ডুকরে কেঁদে উঠল। দারা সেদিকে চেয়ে ডাকলেন, 'নাদিরা, রাণাদিল।'

রাণাদিলের পা সারে নি। মাঝে মাঝে ব্যথা হয়। কি হয়েছে কে জানে? নাদিরাও দিন দিন কাহিল হয়ে পড়ছে। সেই সাহেব হাকিম আসতে পারেন নি যান-বাহনের অভাবে।

কিন্তু আর ত অপেক্ষা করা যায় না। এগুতে হবে। পালাতে হবে ঔরঙ্গজেবের কবল থেকে। উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণের পথ বন্ধ। শুধু খোলা আছে পশ্চিমের কচ্ছের পথ। পথে গুলমহম্মদ সুরাট থেকে এসে যোগ দিল দারার সাথে। সঙ্গে পঞ্চাশটি মাত্র সওয়ারী সিপাই। আর দুশো পদাতিক বন্দুকধারী।

ভুজের পথে রাণাদিল দারার দিকে আর চাইতে পারে না। বাদশাহের আদরের দুলালের আজ কি দুর্দশা? গায়ে পাতলা

শণের কাপড়। পায়ে আট আনা দামের জুতা। বিষণ্ণ বিষাদ ভরা ফ্যাকাশে মুখে সন্ত্রস্ত চাউনি।

দারা কয়েকদিনের জন্য ভুঞ্জের রাজার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করলেন। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। রাও বললেন, 'শাহজাদা, বর্তমান বাদশার সঙ্গে আমি বিরোধে লিপ্ত হতে চাই না। রাজা জয় সিং বাদশার পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, আপনার সাক্ষাৎ পেলে যেন কয়েদ করা হয়।'

'বুঝেছি রাও। সত্যই ত, আমার জন্য কেন আপনি বিপদে পড়বেন।' দারা বললেন।

রাও জানালেন, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না শাহজাদা।'

'না, না, তা কেন বুঝব ? সবই আমার ভাগ্য।' দারা বললেন।

'তাছাড়া বাদশাহের ফৌজ ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। দু'দিন থাকুন, তারপর আপনাকে আমার রাজ্যের উত্তর সীমান্তে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব।'

'তাই যথেষ্ট রাও, তাই যথেষ্ট।' দারা তার হাত দুটি ধরে বললেন।

কচ্ছের উত্তর সীমান্তে বৃহত্তম রাণঅঞ্চল পেড়িয়ে দারা মে মাসের প্রথম দিকে সিন্ধু প্রদেশে এসে পৌছলেন। সম্মুখে তখনও একটি মাত্র পথ খোলা আছে। উত্তর পশ্চিম দিক। সেই পথ ধরে দারা মনে করেছিলেন, কান্দাহারের পথে পারস্য যাবেন। কিন্তু রাণাদিল বেঁকে বসল। বলল, 'না শাহজাদা, হিন্দুস্থান ছেড়ে যাওয়া হবে না।'

'কেন রাণাদিল, পারস্যে গেলে আমাদের লাভ ছাড়া ত ক্ষতি নেই ?' দারা বললেন।

'কিন্তু তবু এই বালুচিস্তানের লোকদের বিশ্বাস নেই। তাছাড়া বহিনের শরীরও দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। সে অত ধকল সহ্য করতে পারবে কেন?' রাণাদিল বলল।

সত্যি নাদিরার উদরাময় রোগটা এবার ভীষণ আকার ধারণ করেছে। অযত্ন, পথশ্রম, মনকষ্ট—সব মিলে নাদিরাকে আরও কাহিল করে তুলেছে। পথশ্রম আর তার সহ্য হবে কিনা কে জানে? দারা স্বপ্নালু চোখে বললেন, 'তবে চল নাদিরা, দাদারের জমিদার মালিক জীওন, তার কাছে গিয়ে আমরা আশ্রয় নেব।'

সিপির এবার প্রশ্ন করল, 'মালিক জীওনের কাছে আব্বাজান?'

দারা বললেন, 'হ্যাঁ, বাদশার আদেশে একদিন ওর প্রাণদণ্ড হয়েছিল। আমিই সেদিন ওকে বাঁচিয়ে ছিলাম। এখন সে আমাকে নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবে।'

রাণাদিল কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে, 'অনেকেই ত আপনার উপকার ভুলে গেছে শাহজাদা।'

'হ্যাঁ, তা গেছে। তবে সবাই কি যায়? যাই হোক, মালিক জীওনকে খবরটা পাঠিয়ে দেই।' দারা বললেন।

১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন।

দাদারের পথে নাদিরার মৃত্যু হল। দারাশিকোর সামনে একটা আশার আলো নিভে গেল। অন্ধকার, চারিদিকে অন্ধকার। নাদিরা—করিমউন্নিসা আর নেই। ভাবতেও পারেন না দারা। বার্ণিয়ে সাহেবের সাবধান বাণীর সঙ্গে উচ্চারিত উদরাময় রোগেই নাদিরা বেগম পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। দুঃখ শুধু, সে না পেল বিশ্রাম, না মিলল দাওয়াই। না দিল সেবা-শুশ্রূষার সুযোগ। সব হারিয়ে গেল।

'শাহজাদা।' ভারাক্রান্ত গলায় ডাকল রাণাদিল।

'উঁ।'

'উঠুন শাহজাদা। ক'দিনে কি চেহারা হয়েছে দেখেছেন কি?'

দারা বিহবল চোখে চেয়ে থাকেন রাণাদিলের পানে।

'এবার যেতে হবে। পালাতে হবে এখান থেকে। নইলে....'

দারা কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'নাদিরা নেই। আমার যে কিছুই ভাল লাগছে না রাণাদিল। আমি কি শেষে পাগল হয়ে যাব?'

রাণাদিলের চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। বললে, 'ও কথা বলবেন না শাহজাদা। আপনি এ রকম করলে আমাদের কি হবে?' রাণাদিল কেঁদে ফেলল।

দারা রাণাদিলকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলেন। তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললেন, 'ছিঃ, কাঁদে না রাণাদিল। কি করব, নাদিরার জন্যে মনটা বড় অশান্ত হয়ে পড়েছে।'

রাণাদিল দারার বাহুপাশে আবদ্ধ অবস্থায় থেকেই বললে, 'কিন্তু শোক করার সময় ত এটা নয়। আপনাকে এখন বাঁচতে হবে যে।'

দারা রাণাদিলের মুখে একটি চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। চল, এবার এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই। নইলে শত্রুপক্ষ এসে পড়বে।'

রাণাদিল উঠে বসল।

দারা তাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'সবাইকে বলে দাও, নাদিরার জন্য তিনদিন যেন শোক পালন করে ওরা।'

রাণাদিল ঘাড় নেড়ে উত্তর দিল, 'আচ্ছা শাহজাদা।'

কেল্লা থেকে দু'মাইল দূরে দাদারের জমিদার মালিক জীওন এসে অভ্যর্থনা জানাল দারাকে।

সিপির প্রথমে জীওনের আতিথ্য গ্রহণে গররাজি ছিল। কিন্তু পিতার অনুরোধে তাকে মত পরিবর্তন করতে হয়েছে। তার ইচ্ছা, সময় নষ্ট না করে এখনি পারস্যের পথে পাড়ি দেওয়া। হিন্দুস্থানের আশেপাশে থাকতেও সে সাচ্ছন্দ বোধ করছিল না। কিন্তু পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ ত হতে পারে না।

শোকাভিভূত, জীর্ণ বেশধারী, হতভাগ্য দারা জীওনের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। ভিতর ও বাইরের সবকিছু মিলিয়ে এ দারা যেন মুঘলের ধ্বংসাবশেষের প্রথম প্রতিমূর্তি।

ছায়ার মত অনুসরণকারী গুলমহম্মদ আর খোজা মুকুল নাদিরার শবদেহ নিয়ে রওনা হয়ে গেছে হিন্দুস্থানের মাটিতে কবর দেবার জন্য। নাদিরার শেষ ইচ্ছা, দারার আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক সেই মহান দরবেশ মিয়া মীরের পাশে যেন তাকে কবর দেওয়া হয়।

রাণাদিল প্রথমে আপত্তি করেছিল গুলমহম্মদকে প্রেরণের জন্য। বলেছিল, 'ভুল আর করবেন না, শাহজাদা। গুলমহম্মদ নাই বা গেল। অন্য কাউকে পাঠান।'

দারা হেসে বলেছিলেন, 'জীবনে বহু ভুলই করেছি রাণাদিল। আর একবার না হয় করলাম। জীবনের শেষ অবলম্বন গুলমহম্মদকেও না হয় হারালাম। ক্ষতি কি? মৃত্যুর চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারবে না ত।'

ক'দিন পরই স্বল্প কয়েকজন অনুচর নিয়ে দারা বেরিয়ে পড়লেন বোলান গিরিপথের দিকে—উদ্দেশ্য কান্দাহারের কেল্লা।

সামান্য পথ অতিক্রম করার পর হঠাৎ জীওনের ছোট্ট বাহিনী ঘিরে ফেলল ওদের। সিপির তরবারি খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কয়েকজন খোজা নিয়ে সে কি করতে পারে?

দারা প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরই ক্রমশঃ ঘটনাটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বেইমান, জীওনও বেইমান! দারা কিছুক্ষণের জন্য মুহ্যমান হয়ে পড়লেন।

দারা দলবল সহ বন্দী হলেন।

জীওন দারার পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসে বলল, 'শাহজাদা, আমি বাদশাহের বান্দা। তাঁর আদেশে আপনাকে ফিরিয়ে আনতে হ'ল।'

দারা ঘৃণায় জীওনের কথার উত্তর দিলেন না।

প্রীত বাদশা হুকুম দিলেন, 'দারাকে দিল্লী শহরের পথে শোভাযাত্রা করে ঘোরাও। সবাই দেখুক, শাজাহানের প্রিয়পুত্র কাফের দারার আজ কি অবস্থা।'

দারা ঔরঙ্গজেবের কাছে আবেদন করলেন :

ভাই বাদশা,

মসনদের মোহ আমার মনে নেই। মসনদ তোমার বা তোমার বংশধরদের প্রাপ্য হোক। আমাকে শেষ করার যে ইচ্ছা তুমি মনে ঠিক করে রেখেছ, সেটা মানবোচিত নয়। তাই বলছি, আমায় এই রাজ্যে ছোট্ট একখানি বাড়ি আর একজন বাঁদী যদি দাও ত জীবনের শেষ দিনগুলো তোমার শুভকামনা করেই কাটিয়ে দেব। ইতি—

দারা

বাঁচার সাধ! ঔরঙ্গজেব হাসলেন। সারা ঘরখানা অট্টহাসিতে ভরে গেল। তা হয় না দারাশিকো। শুভকামনা? এতদিন এ সব

শুভ বুদ্ধি ছিল কোথায় তোমার ? তুমি আমার শুভকামনা করবে ত প্রথমেই জানাও নি কেন ? তুমি কাফের। হিন্দুদের মত তোমার মনে এক কথা, মুখে আর এক। ঔরঙ্গজেব মনে মনে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আর একজন খুশী হল। সে রোশেনারা বেগম। দারার-ই ছোট বোন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কয়েদে সে অত্যন্ত সুখী।

পরনে পথের সেই মলিন পরিচ্ছদ, মাথায় নোংরা উষ্ণীষ, অলঙ্কার বিহীন দেহ—হাত মুক্ত, পা শৃঙ্খলিত অবস্থায় চাঁদোয়া বিহীন হাওদায় সেই প্রখর রোদে ছোট্ট এক কর্দমাক্ত হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়ে দারাকে দিল্লীর জন চক্ষের সম্মুখে নিয়ে আসা হল। চতুর্দিকে তীরন্দাজ আর সওয়ারী ফৌজ। শোভাযাত্রা লাহোর ফটক দিয়ে ঢুকে শাজাহানাবাদের পুরোটা পথ ঘুরে চাঁদনী চকে এসে থামল।

জনারণ্যে ভরে উঠল স্থানটা। সবার চোখে জল। প্রতিবাদের ঢেউ উঠল গুমরে। কেউবা চেঁচিয়ে উঠল দুঃখ জানিয়ে। অশ্রু সজল প্রতিটি লোকের চোখ। রাজার দুলাল চলে যায় তাদের আঙিনা দিয়ে, কিন্তু ইনিই কি তাদের সেই শাহজাদা দারাশিকো ? দাতা, জ্ঞানী, আরও কত কি ? গুমরে কেঁদে উঠল দিল্লীবাসীরা দারার এ হেন দুর্দশায়।

দারা মাথা নীচু করে বসেছিলেন, পিছনে মুক্ত তরবারি হাতে নজর বেগ। পাশে চলছিল বাহাদুর খাঁ আর গর্বিত চালে মালিক জীওন—যার 'হাজারী' খেতাব কেউ রুখতে পারবে না। আর 'বক্তিয়ার খান' নামটা পুরস্কার হিসেবে সে ত আগেই পেয়েছে।

সজল করুণ চোখে দিল্লীবাসী চেয়ে চেয়ে দেখে। কিবা করার

আছে তাদের ? চারিদিকে তীরন্দাজ বাহিনী আর ঘোড় সোওয়ার। একটি আঙুলও উঠল না দারাশিকোর হয়ে। হায় দারাশিকো!

শুধু একজনের চোখে অন্য কথা। সে হাইবাত। বাইমান জীওনকে সে লক্ষ্য করছে। কিন্তু...

ঔরঙ্গজেবের কানেও এসেছে দিল্লীবাসীর মনের খবর। তারা কাঁদছে। তারা শাহজাদা দারাশিকোকে ভালবাসে। কিন্তু ঔরঙ্গজেব ত এটা চান না।

সদ্যপ্রাপ্ত নাম বক্তিয়ার খাঁন। 'হাজারী' খেতাবে বুকটা একটু ফুলে উঠেছিল বৈকি! আজ দরবার বসবে। চোখে সুর্মা, বেশবাসে সজ্জিত হয়ে শাহী দরবারে কয়েকজন অনুচর নিয়ে চলেছিল মালিক জীওন।

'সেলাম খাঁন সাহেব।' হাইবাত এগিয়ে এল। পিছনে ভিখারী শ্রেণীর কয়েকজন লোক।

'সালাম।' জীওন এগিয়ে গেল।

পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল ওরা। 'ভিখ দাও খাঁন সাহেব।'

'নেহি, হট্ যা।' বক্তিয়ার খান চোখ পাকিয়ে বলে উঠল।

ওদের একজন পথের ধুলো ময়লা নিয়ে জীওনের গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল। জীওন চীৎকার করে উঠল, 'চোপরাও কুত্তার বাচ্ছা।'

এবার হাইবাত এগিয়ে গেল, বললে, 'থাম বেইমানের বাচ্ছা।' প্রচণ্ড এক চড় কষে দেয় সে মালিক জীওনের গালে।

ব্যস। শুরু হয়ে গেল উভয় পক্ষে ধ্বস্তাধ্বস্তি। বাড়ির মেয়েরা উপর থেকে ছাই ঢেলে দেয় নয়া বক্তিয়ার খাঁনের ওপর।

অবশেষে রক্ষা করল নগর কোতোয়াল। সে কিছু রক্ষী নিয়ে

খাঁন সাহেবকে তাদের ঢালের আড়ালে রেখে সেই বিপদ থেকে ওকে বাঁচাল।

শাহজাদা দারাশিকোর ভাগ্য ঠিক হয়ে গেল সেই রাতেই দেওয়ানী খাসের এক বৈঠকে। নয়া খাঁন সাহেবের নিগ্রহের সংবাদে একটু বিচলিত বোধ করলেন ঔরঙ্গজেব। শায়েস্তা খাঁন, বাহাদুর খাঁন, আমিন খাঁন সবাই এক বাক্যে বললেন দারার প্রাণদণ্ডের কথা। কোন তর্ক হ'ল না। বিচারের বন্দোবস্তও হল না।

দানিশমন্দ শুধু বললেন, 'জাহাঁপনা, প্রাণ নেওয়াটা কি ঠিক হবে? একটু ভেবে দেখুন।'

ঔরঙ্গজেব জবাবে বললেন, 'আমি ভেবেছি।'

'আপনি বাদশা। আপনি এক অসহায় মানুষের জীবন নিলে লোকে কি বলবে? তাকে বাঁচতে দিলে আপনার মহত্ব প্রকাশ পাবে।' দানিশমন্দ বিনীতভাবেই কথাগুলো বললেন।

'দানিশমন্দ সাহেব, দারাকে কি জন্য প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে আপনি তা জানেন না নিশ্চয়ই।'

নারী কণ্ঠস্বরে চমকে উঠে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন তিনি। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'শাহজাদী, আপনি!'

'হ্যাঁ আমি।' রোশেনারা বললেন, 'আমাকে বেরিয়ে আসতে হল, এক কাফেরকে আপনি বাঁচাতে চাচ্ছেন দেখে।'

'মাফ্ করবেন শাহজাদী। আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।' দানিশমন্দ একটু ক্ষুব্ধ হলেন।

'হ্যাঁ দানিশমন্দ।' ঔরঙ্গজেব বললেন, 'দারার জন্য ইসলাম বিপন্ন হতে চলেছে। সে হিন্দু ব্রাহ্মণ, যোগী আর সন্ন্যাসীদের সঙ্গ ছাড়তে পারবে না। মুসলমান হয়েও সে তাদেরই আধ্যাত্মিক

কাণ্ডারী বলে মনে করছে। হিন্দুদের বেদ তার কাছে পবিত্র। সে কাফেরদের ধর্মগ্রন্থ 'উপনিষদ' অনুবাদ করেছে। তাই....'

দানিশমন্দ বাধা দিয়ে বললেন, 'দারাশিকো জ্ঞানপিপাসু। তিনি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করে ইসলাম ধর্মে আঘাত করেন নি বাদশা।'

'ব্যস।' ঔরঙ্গজেব দানিশমন্দকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'বিধর্মীয় আচরণ জ্ঞানপিপাসুর লক্ষণ নয়। এতে ইসলামেরই ক্ষতি হয়েছে।'

'তাছাড়া আপনি জানেন কি দানিশমন্দ সাহেব, দারার আংটিতে কি লেখা আছে? 'প্রভু'! প্রমাণ চান, এখনি দেখাতে পারি।' রোশেনারা উত্তেজিত ভাবে বললেন।

'কিন্তু শাহজাদী, তার এ কার্যকলাপ বন্ধ করে দিলেই হবে। অযথা তাকে প্রাণদণ্ড দিয়ে লাভ কি?' দানিশমন্দ নম্রস্বরে বললেন।

'তা হয় না দানিশমন্দ খাঁ। ইসলামের ধর্মীয় অনেক অনুশাসনই সে মানে না। সে রমজানের উপবাস পর্যন্ত করে না, নমাজও পড়ে না। অথচ সে ভাবে, খোদার সম্বন্ধে তারই একমাত্র সম্যক জ্ঞান আছে। জীবন্ত এ উদাহরণ থাকলে ইসলামের অপূরণীয় ক্ষতি হবে।' ঔরঙ্গজেব অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠলেন।

'জানি না এসব কথা। তবে দারাকে যতদূর জানি, ইসলামের ক্ষতিকারক সে নয়। তাছাড়া সে ত আপনার হাতের মধ্যেই রইল। তার এ ক্ষতিকারক কর্যকলাপ বন্ধ করে দিন।' দানিশমন্দ বললেন।

ঔরঙ্গজেব তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ক্রূর হাসি মুখে টেনে এনে বললেন, 'দানিশমন্দ খাঁ, আপনার মনোভাব সত্যিই প্রশংসনীয়। দারা আমার বড় ভাই। আমি কি তাকে মেরে ফেলতে চাই। কিন্তু যেখানে ইসলাম বিপন্ন, সেখানে একটু কঠোর হতে হবে বৈকি।

আমার মন জানে, অন্তরে আমার কি ঝড় বইছে দারার প্রাণদণ্ডের কথা ভেবে, কিন্তু কি করব, উপায় নেই! সুতরাং আল্লার কাছে আপনি দোষী হবেন না। জানবেন, এটা তাঁরই নির্দেশ। আল্লার মর্জি মতই আমরা কাজ করে যাচ্ছি শুধু।'

দানিশমন্দ খাঁ নীরব হলেন।

ঔরঙ্গজেব আবার বললেন, 'তাহলে যখন দারার প্রাণদণ্ড আপনারা ঠিক করলেন, তখন সম্রাট হয়েও আমার কিছুই বলার নেই। উলেমারা এবার তাঁদের মতামত জানালেই কাজ সম্পন্ন হতে পারবে।'

সভায় উপস্থিত সকলে সমস্বরে চীৎকার করে উঠল, 'বাদশার আদেশমতই কাজ হোক।'

উলেমারা দারার আমলে বড়ই ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন। তারা এবার সুযোগমত প্রতিশোধ নিলেন, ফতোয়া জারী করলেন প্রাণদণ্ডের।

রেভারেণ্ড বুজী এসেছিলেন দারার কাছে।

দারা ম্লান হেসে বললেন, 'ভালই হল সাহেব। আর বোধহয় দেখা হত না।'

'অতখানি নিরাশ মন নিয়ে আসি নি শাহজাদা।'

দারা মৃদু হাসলেন। বললেন, 'আমাকে পৃথিবী ছেড়ে যেতেই হবে সাহেব। শুধু দুঃখ, কোন কাজই করতে পারলাম না। আমার স্বপ্ন হিন্দু মুসলমানের মিলন—দুই মহাসমুদ্রের একত্রকরণ কিন্তু তা আর সম্ভব হল না।'

বুজী বললেন, 'আপনার দৃষ্টি নিয়ে যদি সবাই দেখে ভারতবর্ষকে, তাহলে একদিন আপনার স্বপ্ন নিশ্চয়ই সফল হবে শাহজাদা।'

দারা হাসলেন, 'জানি সাহেব, কিন্তু সে ত অনেক পেছিয়ে গেল।'

সৈফ খাঁ এসে ঘরে ঢুকল। পিছনে নজর বেগ। হাতে উন্মুক্ত কৃপাণ। তাদের দেখে দারা থেমে গেলেন। বললেন, 'আপনি এবার আসুন রেভারেণ্ড।'

বুজী সাহেব উঠে পড়লেন, 'ভগবান যীশু আপনাকে শান্তি দিন।' বুজী বিদায় নিলেন।

দারা বললেন, 'সৈফ খাঁ, এবার বল।'

সৈফ খাঁ পড়ল বাদশার আদেশ ঃ

বাদশা পবিত্র ইসলামকে রক্ষার্থে, সাম্রাজ্যের জনগণের শান্তি বিঘ্নকারী দারাকে বাঁচিয়ে রাখা বে-আইনী বলে ঘোষণা করছেন।

বাদশার ঘোষণা। ঔরঙ্গজেব, এখনও তোমার এ মুখোস কেন? এখন ত আমি তোমার বন্দী। পালাবার কোন পথই ত নেই। তবু এ মুখোস পরবার দরকার কি? না, না, হয় ত আছে। হিন্দুস্থানের জনসাধারণকে বিপথে চালিত করার এ তোমার আর এক চাল বটে।

'শাহজাদা, আমাকে মাপ করবেন। আমি হুকুমের বান্দা মাত্র।' সৈফ খাঁ বলল।

দারা হেসে বললেন, 'সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন সৈফ খাঁ। তোমার দোষ কি? যা করণীয় আছে করে ফেল।'

সৈফ খাঁ বলল, 'বাদশার হুকুম শাহজাদা। কিন্তু দুঃখ, আমায় সেটা তামিল করতে হবে।'

দারা অট্ট হেসে বললেন, 'সাবাস ঔরঙ্গজেব! শয়তান অনেক দেখেছি, তোমাকেও দেখলাম। সুজা, মুরাদ আর আমি—প্রত্যেকেই নানা অপরাধে অপরাধী। এমন কি আব্বাজানও। তিনিও

আজ তোমার বন্দী। কেবল তুমিই নির্দোষী। ইসলামের একমাত্র প্রতিভূ শুধু তুমিই। বাঃ, বেশ। শাহান শা আকবর একদিন যে মুঘলকে গৌরবের মুকুট পরিয়ে ছিলেন, আজ তুমি সেই মুঘলকে ধুলায় বসালে।

'শাহজাদা।' সৈফ খাঁ ইতস্ততঃ করে বলল।

ঘরের এক কোণে সিপির বসেছিল। দারা তাকে লক্ষ্য করে ডাকলেন, 'সিপির, এদিকে এস।'

সিপির কাছে এল। সে কাঁদছে। সে বুঝতে পেরেছে, এবার আব্বাজানকে ওরা হত্যা করবে।

'আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না আব্বাজান।'

সিপির ডুকরে কেঁদে উঠল।

'ছিঃ সিপির, কথা শোন।' দারা সিপিরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

'না, না।' সিপির কান্নায় ভেঙে পড়ে দারাকে আঁকরে ধরল।

'সৈফ খাঁ, ওকে বাইরে নিয়ে যাও।' দারা বললেন।

সৈফ খাঁর নির্দেশে চারজন বান্দা সিপিরকে বাইরে নিয়ে গেল।

সিপিরের সেই আর্ত চীৎকার পাশের ঘর থেকেও ভেসে আসে। দারা ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়িয়ে তড়িতে তাঁর বালিশটা ছিঁড়ে একখানি ছুরি বার করলেন। তারপর বান্দাটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বক্ষে আমূল বসিয়ে দেন। আর্তনাদে কেঁপে উঠল ঘরখানা। চেষ্টা করলেন দারা আর একজনকে ছোবল মারবার। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না।

নজর বেগ ততক্ষণে দেহ থেকে তাঁর শির আলাদা করে দিয়েছে।

শাজাহানের প্রিয়পুত্র দারা! প্রেমিক দারা! কবি দারা! মানবদরদী দারা! হতভাগ্য দারা! অজানা পৃথিবী থেকে বুঝি তাঁর স্বপ্ন বুকে নিয়ে চলে গেলেন।

ঔরঙ্গজেবের সামনে দারার সেই ছিন্ন শির নিয়ে আসা হল। ঔরঙ্গজেব মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, তাকালেন না। মনে ভয় ছিল কি? হয় ত ছিল।

পরদিন দারার মৃতদেহ একটি হস্তীপৃষ্ঠে চাপিয়ে সারা শহর ঘোরানো হল। উদ্দেশ্য, দিল্লীবাসী তথা তামাম হিন্দুস্থানের লোকেরা জানুক, ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে শাস্তির বীভৎসতা? তারপর সম্রাটের হুকুম মত হুমায়ুনের কবরের কুঠুরীতে বিনা আড়ম্বরে দারাকে কবর দেওয়া হল। পাশেই শায়িত রয়েছেন আকবরের দুই বেটী।

হায় রে মসনদ! হায় দারা! তুমি নেই, কিন্তু ইতিহাসের পাতা তোমাকে বুকে ধরে রাখবে।

শেষ

গ্রন্থপঞ্জী

1. Dara Shuko—Kalikaranjan Qanungo.
2. Aurangjeb—Sir J. *N.* Sircar.
3. Travels in India—Travernier.
4. Ttavels in Mughal Empire—Berner.
5. History of the Mughal Dynasty in India —N. Manucci.
6. Medieval India—Lanepoole.
7. An Advanced History of India—Dr. R. Majumder. Dr. Hem Ch. Roy Chowdhury and Dr. K.K. Dutta.
8. The Life of Mogul Princess Jahanara Begam—Andrea Biitenscuoen.

ত্রুটি স্বীকার

পৃঃ ১৭০ আব্দুর বসিদ দাইলেমী আছে, হবে আব্দুর বসিদ দাইলেমী

" ১৭৪ মির-উল-আকবর .... সির-ই-আকবর

" ১৯৬ রুস্তম খাঁন দাঘানী আছে, হবে রুস্তম খাঁন দাখানী

" ১৯৮,১৯৯ সযভ শকান খান " " সৈফ শিকান খাঁন

আমি সিরাজের বেগম'-এর জেবুন্নেসা পর্ব প্রকাশিত হয়েছে

হারেম থেকে বলছি

কৌটিল্য সেন

'আমি সিরাজের বেগম' পড়েছেন তো ?

সে ছিল আমারই সতীন নাম-না-জানা মেয়ে জারিয়া নবাব সিরাজদ্দৌল্লার আদরের বেগম লুৎফার কাহিনী। কিন্তু তাঁর অবহেলিত প্রধানা বেগম জেবুন্নেসা আমি। নবাবী হারেমে কিভাবে একা একা আমার নিঃসঙ্গ জীবন কেটেছে, নবাবজাদা কিভাবে দিন দিন আমাকে উপেক্ষা করেছেন. তিনি আর তাঁর প্রিয় বেগম লুৎফার মুচকি হাসি দিন দিন কিভাবে আমায় হৃদয়-হীন করে তুলেছিল—এ কাহিনী সেই জেবুন্নেসার অনবদ্য কাহিনী। আমার মন আছে, প্রাণ আছে, যৌবন আছে। আর আছে সুন্দর স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ স্বামী। আমার সুঠাম কামাতুর দেহ আর পিনোন্নত বক্ষ নিয়ে বেগম মহলের এক নির্জন কক্ষে সারাক্ষণ গুমরে মরি। নীলোৎপল আঁখি চেয়ে থাকে নবাবজাদার প্রতীক্ষায়। আট টাকা॥

জঙ্গী ভিয়েৎনাম

ঝরেন বস্থ

'আমরা ভিয়েৎনামের জন্য লড়াই করছি এবং করব হাজার বছর ধরে'... বলেছেন ভিয়েৎনামের লৌহমানব সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রেসিডেণ্ট হো চি মিন। এ গ্রন্থ তাঁরই জীবনী আলেখ্য এবং দেড় হাজার বছর আগেকার জঙ্গী ভিয়েৎনামীদের দৃঢ় মনোবল, বিভিন্ন জাতি তথা—ফরাসী, জাপানী,এবং ইঙ্গ-মার্কিন জোটের বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ধরে প্রতিরোধ আন্দোলন এবং লড়াই করার ইতিহাস। ছয় টাকা

রাজপথ তীর্থপথ : উত্তরভারত পর্ব

ভ্রমণবিলাসী ঐতিহাসিক নিগূরানন্দ তাঁর নিপুণ তুলিতে অঞ্জনার যে চরিত্র এ গ্রন্থে এঁকেছেন তা অতুলনীয়। বাকপটু অঞ্জনা ও মিনু, সঙ্গে বজ্রগম্ভীর বীরেনদা আর সেকেলে সরলা বুড়ী রাঙামাসীমার চরিত্র আজকের বাঙলা সাহিত্যে বিরল। কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি স্থানের নিখুঁত ছবি এবং সেখানকার ঐতিহাসিক পীঠস্থানগুলোর ঐতিহাসিক বর্ণনা লেখকের এক অনবদ্য সৃষ্টি। বারো টাকা

নটী ॥ দিলদার

শহর কলকাতার রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে, স্টেশনে যে সব বিচিত্র চরিত্রের মেয়েরা ঘুরে বেড়ায়, এ গ্রন্থ তাদেরই নিয়ে লেখা এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। এরা কেউবা পেটের তাগিদে, কেউবা জৈবিক তাড়নায়, কেউবা পেশাদার হয়ে এ পথ বেছে নিয়েছে। সুসাহিত্যিক দিলদার তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন এ গ্রন্থখানিতে। পাঁচ টাকা